গৃহ-শিক্ষা

গৃহ-শিক্ষা

শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত

দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রকাশক,

আশুতোষ লাইব্রেরী — ৫০।১ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পাটুয়াটুলী — ঢাকা।

আন্দরকিল্লা — চট্টগ্রাম।

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

Printed by K. B. Bose,
at the Minto Press,
CHITTAGONG.
1918.

উৎসর্গ।

গৃহ-শিক্ষা লিখিত হইল। তুমি এই রকমেরই একখানা বই চাহিয়াছিলে। এই বই পড়িয়া যদি শিশু-শিক্ষা বিষয়ে, একটী পরিবারেরও মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, যথা সময়ে উচিত শিক্ষা পাইয়া, যদি একটী ছেলেও মানুষ হইয়া উঠে, তবে তোমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে এবং আমার পরিশ্রম ও সার্থক হইবে, মনে করিও। বইখানি তোমার অনুরোধেই লিখিত হইয়াছে, তাই আজ তোমার জীবনের বিশেষ দিনে আমি তোমার হাতেই বইখানি উৎসর্গ করিলাম। ইতি ২১শে আষাঢ়, সন ১৩১২ বঙ্গাব্দ।

নন্দন কানন

চট্টগ্রাম।

সূচী।

প্রথম প্রস্তাব।

স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিষয়ক সাধারণ কথা :—

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক কথা :—

রক্তের লাল ও সাদা জীবাণু ও তাহাদের কার্য্যভাগ। খাদ্য বিচার, তাহার আবশ্যকতা ও খাদ্যের পরিমাণ। আমিষ ও নিরামিষ ভোজন। শ্রমের আবশ্যকতা — কাজ ও খেলা। খেলার উদ্দেশ্য, সময় ও উপকারিতা। অভ্যাস-গঠন ও তাহার উপায়। ছেলেমেয়েদের আব্‌হাওয়া, ইংলণ্ড, আমেরিকা ও জাপানের দৃষ্টান্ত। খেলার বিভিন্ন উপকরণ। কাজের পরিবর্ত্তন ও নূতনত্ব বিধানের প্রয়োজনীয়তা। বিশ্রাম, অবসর সময় ও তাহার ব্যবহার। জল ও জলের ব্যবহার। স্নানের সময় ও উপকারিতা। তিব্বত দেশের দৃষ্টান্ত। বায়ু ও তাহার উপাদান। দেহ নির্ম্মাণ ও দেহ রক্ষায় বায়ুর কাজ। পোষাকের আবশ্যকতা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও 'বাবুগিরি।' মিতাচার। স্বাস্থ্যরক্ষায় চিত্তশুদ্ধি ও চিত্তের প্রফুল্লতার আবশ্যকতা। সময়-নিষ্ঠা, তাহার অভাব ও ফল। বিদেশীয়দের অনুকরণ-প্রিয়তা ও বর্ত্তমান অনুকরণ-প্রণালী। বিদেশের উন্নতভাব শিক্ষা ও গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা। জাপানের দৃষ্টান্ত।

২--৮৯ পৃষ্ঠা।

তৃতীয় প্রস্তাব।

নীতি-শিক্ষা বিষয়ক কথা ঃ—

নীতি-শিক্ষার আবশ্যকতা। স্বাস্থ্যের সঙ্গে নীতির সম্পর্ক। মহৎ জীবনের মহত্ত্ব ও মাতার প্রভাব। শিশু-শিক্ষার [illegible] বাধ্যতাগুণ — ইহার সংজ্ঞা ও ধারা। বিজ্ঞান ইহার উৎপত্তি ও উদ্দেশ্য। বিজ্ঞান ও সাধারণ বুদ্ধি। ইচ্ছাশক্তি ও তাহার ক্রম বিকাশ। অবাধ্যতা শিক্ষা — তাহার কারণ ও প্রতিকার। বাধ্যতা ও স্বাধীনতা-বৃত্তি। বাধ্যতা শিক্ষার কাল, উপায় ও ফল—দৃষ্টান্ত বিদ্যাসাগর ও ক্যাসাবিয়েঙ্কা। সত্যবাদিতা শিক্ষা। ছেলেদের সত্য-মিথ্যা জ্ঞান, মিথ্যা কথা বলিবার কারণ — রামতনু লাহিড়ীর দৃষ্টান্ত। ছেলেদের প্রতি অকারণ সন্দেহ ও

চতুর্থ প্রস্তাব।

জ্ঞান-শিক্ষা বিষয়ক কথা :—

পঞ্চম প্রস্তাব।

ধর্ম্ম-শিক্ষা বিষয়ক কথা :—

চিত্র সূচী

* শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত বি এ, বি টি, মহাশয়ের সৌজন্যে।

গৃহ-শিক্ষা

প্রথম প্রস্তাব

স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিষয়ক সাধারণ কথা

মা ও মেয়ের কথোপকথন

সরোজিনী। মা, পরিবারে গৃহিণীর কর্ত্তব্য বিষয়ে কাল সন্ধ্যা বেলা তুমি যে সব কথা বলেছ,* তাতে আমাদের বেশ উপকার হয়েছে। লীলা ও আমি কাল অনেকক্ষণ ঐ বিষয়ে চিন্তা করেছি। সত্যি মা, সংসারের সুখ অনেকটা মেয়েদের উপর নির্ভর করে, মেয়েদের দায়িত্ব বড়ই গুরুতর বলে মনে হয়। মেয়েরা যদি সংসারে সামান্য কিছুতেই কাতর হয়ে পড়ে তবে পরিবারে সুখ কি শান্তি কিছুই থাকে না।

লীলা। হাঁ মা, তোমার কাল্‌কার কথাগুলো আমাদের কাছে বেশ লেগেছে। আজ ছেলেমেয়েদের শিক্ষা বিষয়ে আমাদের কিছু বল্‌বে বলেছিলে এখন তা বল না।

* গ্রন্থকারের 'গৃহ-সুখ' নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

সরোজ। মা, তোমার মুখে নূতন নূতন কথা শুন্‌তে আমাদের বড়ই ভাল লাগে। এ সব কথা আমরা কোথাও শুন্‌তে পাই না। স্কুল কালেজে এখন কত রকমের বই পড়ান হয়, কত কি শেখান হয়, কিন্তু এ সব বিষয়ে কোন কথা স্কুলে শুন্‌তে পাওয়া যায় না, অথচ এ সব বিষয়ে শিক্ষা পেলে আমাদের জীবনের কত উপকার হয়!

লীলা। সত্যি মা, তুমি ভাল ভাল কথা এমন সুন্দর করে বল যে আমাদের সর্ব্বদাই শুনতে ইচ্ছা হয়। জান দিদি, আমাদের স্কুলে একজন শিক্ষয়িত্রী ছিলেন, তিনিও অবসর সময়ে এ সব বিষয়ে স্কুলের মেয়েদের সঙ্গে আলাপ কর্‌তেন। কোন দিন বা ইংরেজী বই হতে ইংলণ্ডের ও আমেরিকার নারীদের দৃষ্টান্ত পড়ে শুনাতেন। সকল মেয়েরা খুব আগ্রহের সহিত তাঁর কথা শুনত।

মা। সরোজ ও লীলা, তোমাদের আগ্রহ দেখে আমার আজ খুবই আহ্লাদ হচ্ছে। আমার কাল্‌কার কথাগুলো তোমরা ভেবে দেখেছ শুনে বেশ সুখী হয়েছি। সত্যি, সরোজ, মেয়েদের হাতে সংসারের সুখ দুঃখ অনেকটা নির্ভর করে। মেয়েরা যদি ইচ্ছা করে, তবে আদর্শ সংসার কর্‌তে পারে, আদর্শ মানুষ গড়ে তুল্‌তে পারে। পরিবার পরিজনের মঙ্গল, ছেলেপিলের মঙ্গল, দেশের মঙ্গল, সবই মেয়েদের হাতে। তোমরা এ সব বিষয়ে যতই চিন্তা কর্‌বে, ততই বুঝবে, তোমাদের জীবনের দায়িত্ব কত, সংসারে কত কাজ কর্‌বার ভার

ঈশ্বর তোমাদের হাতে দিয়েছেন। তোমরা যদি এক মনে তোমাদের কর্ত্তব্য পালন কর, দেখ্‌বে, তোমাদের সংসার স্বর্গের মত হবে, তোমাদের আত্মীয় স্বজনের ও তোমাদের দেশের অশেষ মঙ্গল হবে। জাতীয় উন্নতি তোমাদের হাতে, তোমরা যে সব ছেলেপিলে তৈরি করে দেবে, তারাই জাতি গঠন করবে, তারাইত দেশের কাজ কর্ম্ম করবে — দেশের উন্নতি করবে। এখনকার সভ্য জাতির উন্নতির কারণ যদি তোমরা অনুসন্ধান কর, দেখ্‌তে পাবে, মেয়েরাই জাতীয় উন্নতির মূলে রয়েছে, এবং মহতী শক্তি রূপে মেয়েরাই জাতিকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এ সব বিষয়ে তোমরা যতই চিন্তা করবে, ততই তোমরা বেশ আমোদ পাবে ও ততই [illegible] জান্‌তে ইচ্ছা করবে। তোমাদের কিছু শিক্ষা [illegible] উপকার হবে মনে করে আমি এ সব বিষয়ে তোমাদের সঙ্গে আলাপ কর্‌তে ইচ্ছা করেছিলুম, তা তোমাদের আগ্রহ দেখে আমার বেশ মনে হচ্ছে, এ রকম আলাপে নিশ্চয়ই তোমাদের বিশেষ উপকার হবে।

সরোজ। মা, ছেলেমেয়েদের কি করে মানুষ কর্‌তে হয় ?

মা। হাঁ এখন আমি সেই বিষয়েই বল্‌ছি। বালক-বালিকাদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিষয়ে আমাদের খুব ভাল জ্ঞান থাকা দরকার। তাদের জীবনের উন্নতি ও অবনতি আমাদের উপর নির্ভর করে। ছেলেকে মানুষ করতে হলে অনেক বিষয় তোমাদের জান্‌তে হয়, আমি ক্রমে অল্প অল্প করে

সে সব কথা তোমাদের নিকট খুলে বল্‌ছি। আমি আশা করি, তোমরা আমার কথাগুলো শুধু শুনে যাবে না, যাতে জীবনে পালন কর্‌তে পার, তারই চেষ্টা কর্‌বে।

সরোজ। হাঁ মা, ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিষয়ে ভাল জ্ঞান কিরূপে লাভ করা যায়?

মা। দেখ সরোজ, বিষয়টী বড়ই গুরুতর। আমার মনে হয়, তোমাদের এই জ্ঞানের উপরই ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে, পরিবারের সুখ শান্তি নির্ভর করে। তোমরা জান, পশু পক্ষীরা নিজ বুদ্ধিবলে ধীরে ধীরে বড় হয়, তাদের জন্য কাকেও বড় একটা ভাব্‌তে হয় না।

লীলা। তবে মানুষের ছেলেও কি সেই ভাবে বড় হতে পারে না? তাদের জন্য আবার এত ভাব্‌তে হয় কেন?

মা। পারে বই কি লীলা, এখনও বহু অসভ্য জাতির মধ্যে প্রকৃতির কোলে ছেলেরা পালিত হচ্চে না? কিন্তু তা যদি হয়, তাদের আর মানুষ হতে হয় না। জান, একটা পশু কি পক্ষীকে গৃহে রাখ্‌তে হলে, অনেকটা কর্‌তে হয়, বিশেষ সাবধানে তাদের দেখ্‌তে হয়, নতুবা তাদের বুনো স্বভাব যায় না — সহজে পোষ মানে না। সেইরূপ একটা শিশুকে মানুষ কর্‌তে হলে অনেকটা ভাব্‌তে হয়, অনেকটা খাট্‌তে হয়। ছেলেদের মানুষ করা কাজটাও একটা শিল্প বিশেষ, সে বিষয়ে ভাল জ্ঞান না থাক্‌লে ছেলেদের মানুষ করা যায় না।

সরোজ। শিল্প বলছ কেন?

মা। হাঁ সরোজ ঠিকই ত। মানুষ নানাবিধ প্রবৃত্তি নিয়ে সংসারে আসে, মানুষ যতই বয়সে বড় হতে থাকে, প্রবৃত্তিগুলোও এক একটা করে ফুট্‌তে থাকে। এ অবস্থায় মা বাপের কর্ত্তব্য কোনটাকে উত্তেজিত করা, কোনটাকে সংযত করা। প্রকৃতির কোলে মানুষকে ফেলে রাখলে সে গায়ে গতরে বেশ মোটা সোটা হয়ে উঠ্‌তে পারে, কিন্তু সে প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠ্‌তে পারে না, অথবা সভ্য বলে পরিচিত হতে পার্‌বে না। তাই ছেলেবেলা হতে ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য ও প্রকৃতির দিকে আমাদের দৃষ্টি রাখা উচিত। কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা, আমাদের দেশে শিশুশিক্ষা একটা জিনিষ নাই বল্‌লেও হয়। ছেলেদের স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়েও আমরা বড়ই উদাসীন।

সরোজ। উদাসীন! সে কি কথা মা? ছেলেমেয়েদের অসুখ বিসুখে কি আমরা তাদের সেবা শুশ্রূষা করি না, বা রীতিমত ডাক্তার কবিরাজ ডেকে চিকিৎসা করাই না?

মা। না সরোজ, তা নয়। অসুখ বিসুখে তোমরা ছেলেপিলেদের ঔষধ দাও না, কিম্বা তাদের তুচ্ছ কর, সে কথা আমি বল্‌ছি না। ছেলেমেয়েদের অসুখ হলে পর তোমরা অস্থির হয়ে ওঠ এবং সাধ্যমত তাদের সেবা করে থাক, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? তবে এও ঠিক, অসুখের সময়ে তোমরা যেমন চিন্তিত হয়ে পড়, সুস্থ সময়ে যদি তেমনি একটু সাবধান

থাক, তবে তোমাদের এত আর ভুগ্‌তে হয় না, ছেলেরাও বিলক্ষণ সুস্থ থাক্‌তে পারে। আমি বল্‌ছিলুম কি করে স্বাস্থ্য রাখ্‌তে হয়, তা তোমরা জান না, জান্‌লেও বা সে দিকে অনেক সময়ে দৃষ্টি রাখ না। ঠিক কথা নয় কি?

সরোজ। তা ঠিক, মা। আমরা ছেলেমেয়েদের অসুখের সময় যেমন অস্থির হয়ে পড়ি, সুস্থ অবস্থায় যদি একটু সাবধান থাকি, তবে অনেক চিন্তা, অনেক কষ্ট এড়াতে পারি, আমাদের অনেক খাট্‌নি কমে যায়।

লীলা। সত্যি দিদি, মা আমাদের দোষটা ঠিক ধরে ফেলেছেন। এই দেখ্‌লে না, সে দিন জ্ঞানবাবুর স্ত্রী খেল্‌তে খেল্‌তে আমাদের সকলের সাম্‌নে তাঁ'র একটুখানি ছেলেকে আদর করে কাঁচা আম খাইয়ে ছেলেটীর কিনা অসুখ করে ফেল্লেন! এখন ছেলের জন্য মা বাপের চোখে ঘুম নেই, ডাক্তার কবিরাজ টাকা শুষে নিচ্ছে।

মা। ছেলেরা যখন সুস্থ থাকে, বেশ হেসে খেলে ছুটোছুটী করে, তখন আমরা তাদের দিকে নজর রাখি না, তাদের খাওয়া দাওয়া, চলা ফেরা প্রভৃতি কোন বিষয়েই বিশেষ মনোযোগ দেই না। দুবেলা দুপেট খাইয়ে দিই তারা আপন মনে যেখানে সেখানে ছুটে যায় এবং যা তা করে। খাওয়া দাওয়া বিষয়ে আমি অনেক সময়ে অনেক মাকে বল্‌তে শুনেছি — 'আহা! ছেলে মানুষ খেতে চাচ্ছে, একটু খাবে না, কি হবে, খাক্‌। ছেলে মানুষের সব হজম

হয়', এ রকম করে অনেক সময়ে ছেলেদের যা তা খেতে দেওয়া হয়। শুধু যে খাওয়াতে অত্যাচার কর তা নয়, প্রায় সব বিষয়েই তোমরা এভাবে চলে থাক, সুস্থ সময়ে কোন বিষয়ে বড় একটা খেয়াল কর না, কি করে বরাবর সুস্থ থাক্‌বে, তার জন্য একটুও ভাব না অথচ অসুখ হয়ে পড়লে তোমাদের ভাবনা চিন্তার আর কূল কিনারা থাকে না। তাও আবার অসুখের আরম্ভে নয়, একটু ব্যারাম দেখা দিলে পর অনেককেই বল্‌তে প্রায়ই শুনা যায়, 'কি, একটু সর্দ্দি কাশী, সামান্য পেটের অসুখ, ও সব ত ছেলেদের নিত্য রোগ, ও সব রোগ ছেলেদের হয়েই থাকে।' এ ভাবে প্রথম অবস্থায় উপেক্ষা করে শেষে যখন ব্যারাম শক্ত হয়ে দাঁড়ায়, তখন তোমরা রাত দিন অবিশ্রাম তাদের সেবা করতে থাক, ডাক্তার ডাক, কবিরাজ ডাক, এবং বোতলে বোতলে, শিশিতে শিশিতে ঔষধ দিতে থাক। একি সত্য ঘটনা নয়, সরোজ?

সরোজ। হাঁ মা সত্যিইত। ছেলেমেয়েরা যখন সুস্থ থাকে, তখন তাদের দিকে আমরা অনেক সময় মনোযোগ দেই না। ব্যারাম হলে পর তখনই ডাক্তার ডাকা যেন আমাদের দেশের একটা রীতিই নয়। আমি অনেককে বল্‌তে শুনেছি, রোগ যখন দেখা দেয় তখনি সেটা ঔষধ দিয়ে তাড়াতাড়ি বন্ধ কর্‌লে তার বীজ শরীরে থেকে যায়, পরে আবার সে ব্যারাম হয়ে থাকে।

শিক্ষা লাভ কর্‌বার জন্য আমরা স্কুলে কালেজে ছেলেদের পাঠিয়ে থাকি। স্কুল-শিক্ষা আমাদের জীবিকানির্ব্বাহের একটা উপায় স্বরূপ। কিন্তু স্কুল-শিক্ষার সফলতাও গৃহ-শিক্ষার উপর নির্ভর করে। দুটো দুমুখো হ'লে পর স্কুল-শিক্ষার কোন ফল ফলে না।

সরোজ। সে কি কথা বল্লে, মা, শুধু অর্থকরী বিদ্যার জন্য কি আমরা ছেলেমেয়েদের স্কুল কালেজে পাঠিয়ে থাকি, তা হবে কেন? দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি কঠিন কঠিন বিষয়ে স্কুল কলেজ ছাড়া কোথাও কি, ভাল চর্চ্চা হ'তে পারে, না পরিষ্কার জ্ঞান জন্মিতে পারে? আমার মনে হয় স্কুল-শিক্ষাটাকে তুমি নেহাত ছোট করে দেখ্‌ছ। আমাদের ছেলেরা উচ্চ শিক্ষা পেয়ে কঠিন কঠিন বিষয়ে যে জ্ঞান লাভ করে, এবং যে রকম ভাবে চিন্তা কর্‌তে শিখে, তেমনটা পরিবারে তারা কখনও শিখ্‌তে পারে না, বস্তুতঃ পরিবারে শিখ্‌বার সুবিধাও নাই। এ কথা ঠিক নয় কি, মা?

লীলা। সে কি রকম মা, স্কুলে আমরা যাহা শিখি, তাও কি আবার বাড়ীতে শিখ্‌তে হয়?

মা। শিখ্‌তে হয় বই কি, লীলা! প্রকৃত শিক্ষা তুমি কী মনে কর? তুমি কি মনে কর, দু চারখানা বই মুখস্থ কর্‌লে, কি দুচারটা পরীক্ষা পাশ দিলেই শিক্ষার শেষ হ'ল? তা নয়, কিন্তু যখন দেখ্‌বে, যাহা ভাল বুঝেছ

জীবনেও তাহা পালন কর্‌তে পার্‌ছ, তখন মনে করবে তোমার প্রকৃত শিক্ষা হচ্ছে। শুধু দুই চারিটী ভাল কথা জান্‌লে, কি দুই চারিখানা ভাল বই পড়্‌লে যথার্থ শিক্ষা লাভ হ'ল না। এই মনে কর, লীলা, স্কুলে প'ড়ে এলে 'সত্য কথা বলা উচিত' কিন্তু বাড়ীতে পা দিতে না দিতেই গণ্ডা পাঁচ সাত মিছে কথা ব'লে ফেল্লে, বল দেখি এখানে তোমার প্রকৃত শিক্ষা হ'ল কিসে? তাই বল্‌ছিলুম যে গৃহ-শিক্ষার অভাব অনেক সময়ে স্কুল-শিক্ষার অন্তরায় হ'য়ে উঠে। আমরা স্কুলে যাহা শিখি, গৃহ-শিক্ষার অভাবে তদনুরূপ কাজ কর্‌তে পারি না। যে ছেলে বাড়ীতে কোন দিন নম্রতা শেখে নাই, তুমি কি মনে কর স্কুলে দুই চার পাত বই প'ড়ে, কি দু চারটা উপদেশ শুনে বিনয় তার অভ্যস্ত হ'য়ে যাবে এবং সকলের সঙ্গে সে নম্র ব্যবহার করবে? হাঁ, দু চার জন লেখাপড়া শিখে নিজের চেষ্টায় চরিত্র বদ্‌লাতে পারে বটে, কিন্তু অনেকেই পারে না।

লীলা। মা, তুমি যে গৃহ-শিক্ষার কথা বল্‌ছ, সে শিক্ষা কখন থেকে দিতে হয়?

সরোজ। লীলা একটু থাম্। আমি একটা কথা পরিষ্কার ক'রে বুঝে নেই। মা তুমি যে দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রকৃত শিক্ষা বুঝিয়ে দিলে তা আমি ঠিক ধরতে পারলুম না। এরূপ শিক্ষা ও জ্ঞান নাই কি যাহা ব্যক্তিগত জীবনে কদাচ কাজে আসে এবং ব্যক্তিগত অভ্যাসের

কদাচ অনুকূল বা প্রতিকূল হ'য়ে দাঁড়ায়, যেমন বৈজ্ঞানিক শিক্ষা, দার্শনিক গবেষণা? তুমি এ সব উচ্চ অঙ্গের শিক্ষার প্রতি মনোযোগ দিচ্ছ ব'লে মনে হয় না! নাইবা থাকুক ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে তা'দের কোন নিকট সম্পর্ক, কিন্তু এ সব শিক্ষা কি অগ্রাহ্য কর্‌বার জিনিষ?

মা। লীলা, মার দুধের সঙ্গেই শিশুদের শিক্ষার আরম্ভ হয়। ছেলেরা যেমন একটু একটু ক'রে বয়সে বাড়ে, তেমন একটু একটু ক'রে তাদের শিখিয়ে নিতে হয়।

না সরোজ, আমি স্কুল-শিক্ষাটাকে ছোট ক'রে দেখি নাই অথবা শিক্ষার উদ্দেশ্যকে নিতান্ত সঙ্কীর্ণ ক'রে তোমাদের নিকট বলা আমার ইচ্ছা নয়, তুমি যে সব গুরুতর প্রশ্ন করেছ, সে সব প্রশ্ন আমারও মনে উঠেছে, তবে আরম্ভেই এ সব জটিল বিষয় উত্থাপন কর্‌লে তোমরা ঠিক ধর্‌তে পার্‌বে না মনে ক'রে প্রত্যেক বিষয়ের সহজ দিকটা ধ'রে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা কর্‌ছিলুম। কি বল সরোজ, উচ্চ শিক্ষা অগ্রাহ্যের জিনিষ! বৈজ্ঞানিক অনুশীলন, দার্শনিক তত্ত্ব-নির্ণয় প্রভৃতি শক্তি এ পৃথিবীতে অতি মূল্যবান জিনিষ, তদ্দ্বারা জগতের জ্ঞানবৃদ্ধির কত সাহায্য হয়! সে সব উচ্চ অঙ্গের জ্ঞান আমাদের ছেলেমেয়েদের স্পৃহনীয় জিনিষ নয় একথা কে বল্‌তে পারে? কিন্তু সরোজ, এ উচ্চ শিক্ষালাভে গৃহ-শিক্ষার যথেষ্ট প্রভাব নাই, গৃহে এ সব বিষয়ের যথেষ্ট চর্চ্চা হ'তে পারে না তোমার এ ধারণা ভুল। আমাদের দেশে এমন

ব্যক্তি আছেন যাঁ'রা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পান নাই অথচ ধর্ম্মতত্ত্ব, রাজনীতি, সাহিত্য, দর্শন, কি বিজ্ঞান বিষয়ে বেশ সুপণ্ডিত। তাঁ'রা কি এ সব উচ্চ অঙ্গের জ্ঞান গৃহেই লাভ করেন নাই? তবে কেন বল্‌ছ গৃহ জ্ঞান লাভের স্থান হ'তে পারে না?

লীলা। এত অল্প বয়স হ'তে ছেলেদের শিক্ষা দিতে হয়! এ যে মা, আমাদের দেশে নূতন কথা। আমাদের দেশে ছোট ছেলেদের শাসন কি শিক্ষা। কথা বল্লেইত লোকে হেসে উড়িয়ে দেয়। বলে 'ও [illegible] একটু খানি ছেলে, এ আবার শিক্ষার কিইবা বুঝে! ওকে আবার শাসন কর্‌তে হয়!' আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকের ধারণা, ছেলেরা যখন একটু বেশ বড় হ'বে, [illegible] তখন তা'দের শিক্ষা দিতে হয়, স্কুলে পা'ঠাতে হয় এবং তখন তা'দের শাসন কর্‌তে হয়।

মা। ঠিক কথা, লীলা। আমাদের মধ্যে অনেকেরই সেই রকম ধারণা। তা'র কারণ আমাদের অনেকেই মনে ক'রে থাকেন ছোট ছেলেমেয়েরা ভাল মন্দ বিচার করতে পারে না, তা'রা নীতিজ্ঞান শূন্য। আমার মনে হয়, এ রকম ধারণা বহুকাল হ'তে আমাদের মধ্যে চ'লে আস্‌ছে। ছোট কালে ছেলেরা যে রকম অন্যায় আদর আবদার পেয়ে থাকে, তা'তে তা'দের যে চরিত্র দাঁড়িয়ে যায়, তুমি কি মনে কর, ছোট কাল থেকে যদি সে চরিত্রের সংশোধন

করা না হয়, বড় হ'লে পর স্কুলে কি বাড়ীতে উপদেশ শুনে তা'র কোন পরিবর্ত্তন হ'তে পারে? আমার মনে হয়, আদর, শাসন ও শিক্ষা, এ তিনটার মধ্যে কোনটা কোনটার বিরোধী নহে। আদর ক'রে ছেলেদের শিক্ষাও দেওয়া যায়, শাসনও করা যায়। কিছুদিন ছেলেদের দিকে মোটেই চেয়ে দেখ্‌বে না, শুধু আহ্লাদ দেবে, আর কিছুদিন শুধু বক্‌বে অথবা খালি উপদেশ দেবে, এ উপায় ছেলেদের পক্ষে বড় মঙ্গলজনক মনে হয় না।

লীলা। আচ্ছা মা, আদর দিয়ে কি ক'রে ছেলেদের শাসন কর্‌তে হয়? তুমি কী রকম কথা বল্‌ছ?

মা। দেখ লীলা, আমরা ছেলেদের আদর কর্‌তে জানি না, শিক্ষা দিতে জানি না, শাসনে রাখ্‌তে জানি না বলেই তুমি এ রকম প্রশ্ন করছ। আমাদের দেশে শাসন মানে, ছেলে কাঁদ্‌ছে বা অন্য প্রকারে মাকে বিরক্ত ক'রে তুল্‌ছে, মা ছেলেকে শান্ত কর্‌বার জন্য দু চার ঘা লাগিয়ে দিলেন, একটীবার চিন্তা ক'রে দেখ্‌লেন না কেন ছেলে কাঁদ্‌ছে। মা হয়ত কোন কাজে বিশেষ ব্যস্ত আছেন, ছেলে কি মেয়েকে একটা কাজের জন্য হুকুম কর্‌লেন, ছেলে এক মনে তার কাজ কর্‌ছিল, মা'র হুকুম পাল্‌তে একটু দেরি হ'য়ে গেল, মা এসে তাকে কতক্ষণ বেশ ব'কে গেলেন। এইত আমাদের দেশের শাসন প্রণালী।

আদর দিয়ে শাসন করা কিছু শক্ত নয়, এ বিষয় বিস্তৃত

ভাবে আমি তোমাদের পরে বুঝিয়ে বল্‌ব। ছেলেদের যেমন ধীরে ধীরে শরীর শক্ত হয়, তেমনি ধীরে ধীরে তা'দের এক একটা অভ্যাস দাঁড়িয়ে যায়। ঠিক সময়ে সেটার দিকে নজর না রাখ্‌লে পরে তাহা সংশোধন করা বড় শক্ত হ'য়ে উঠে।

লীলা। হাঁ মা আমি জানি, শ্যামবাবুর একমাত্র ছেলে এক বৎসর হ'তে বড় আবদার পেত। একমাত্র ছেলে যখন যাহা চাইত, সকলে আদর ক'রে তখনি তা তাকে দিত। এখন ছেলেটীর চার বৎসর বয়স, আদর পেয়ে তা'র এমনি বিশ্রী স্বভাব দাঁড়িয়েছে যে যখন যা চাইবে, তা'কে তা না দিলে রক্ষা নাই। না দিলে সকলকে মেরে, চীৎকার ক'রে সমস্ত বাড়ী তোলপাড় ক'রে তোলে। কত মার খায়, কত বকুনি শোনে, কিছুতেই কিছু হয় না। বাড়ীতে কোন সুন্দর জিনিষ এনে সাজিয়ে রাখ্‌বে, সাধ্য নাই। শ্যামবাবুর স্ত্রী ছেলেটাকে নিয়ে একেবারে নাকাল হ'য়ে গ্যাছেন। কারো বাড়ীতে যে ছেলেকে নিয়ে যাবেন তা'র যো নাই। যেখানে যা দেখ্‌বে, চাইলেই তা তা'কে দিতে হবে, তা না দিলে কি আর রক্ষা আছে?

মা। লীলা, তুমি ঠিক দৃষ্টান্তই দিয়েছ।

শ্যামবাবুর স্ত্রী যদি এক বৎসর হ'তে ছেলেকে শাসনে রাখ্‌তেন, অন্যায় আবদার না দিতেন তবে বোধ হয় ছেলেটা এমন দুর্দ্দান্ত হ'য়ে উঠতে পার্‌ত না। এখন বোধ হয়, তোমরা বেশ সুন্দররূপেই বুঝেছ, গৃহ-শিক্ষা কি জিনিষ

এবং ইহার আবশ্যকতা কি। বাস্তবিকই সরোজ, আমাদের দেশে ছেলেমেয়ে কতই আদরের জিনিষ। ছেলেমেয়ে না থাক্‌লে মা বাপ নিজকে বড়ই হতভাগ্য মনে ক'রে থাকেন। ছেলে জন্মিলে পরিবারে কত আনন্দ হয়, মা বাপের প্রাণটা সুখে নেচে উঠে, তাঁ'রা নিজকে কত সুখী, কত ভাগ্যবান্ মনে করেন। কিন্তু শিক্ষা ও শাসন অভাবে যদি সেই ছেলে দুশ্চরিত্র হয়, তখন মা বাপের দুঃখের অন্ত থাকে না। ঘৃণায় ও দুঃখে অনেক পিতা মাতা দুর্নীতিপরায়ণ ছেলের মৃত্যু কামনাও ক'রে থাকেন। যা'দের পেয়ে মা বাপের মনে আনন্দ ধরে না, মা বাপকে যদি তা'দের মৃত্যু কামনা করতে হয়, কতই দুঃখের কথা! অথচ যদি মা বাপ ছেলেবেলা থেকে ছেলেদের সাবধানে পালন করেন, তবে বোধ হয় তাঁদের শেষকালে এত লাঞ্ছনা ভুগ্‌তে হয় না। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা গৃহের অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য, সুখের উপাদান, পবিত্রতার নিদর্শন, সুশিক্ষিত হ'লে তা'রা পরিবারের গৌরব, দেশের গৌরব, দুর্নীতিপরায়ণ হ'লে পরিবারের কলঙ্ক, দেশের জঞ্জাল।

সরোজ। মা, তুমি কি বল শুধু মা বাপের দোষেই ছেলেরা নষ্ট হয়? এমন মা বাপও আছেন কি যাঁ'রা ছেলেদের মঙ্গল কামনা করেন না, ছেলেদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন না? অথচ ভাল ছেলে হয় আর কয়টি?

লীলা। টাকা পয়সার অভাবে প'ড়েও অনেকেই

ছেলেদের মানুষ করতে পারেন না বলে দুঃখ করে থাকেন; ইচ্ছা থাক্‌লেও অনেক মা বাপ টাকা পয়সার জন্য পারেন না।

মা। হাঁ, সরোজ, আমার মনে হয়, অধিকাংশ ছেলে-মেয়ে মা বাপের দোষে নষ্ট হয়ে থাকে। শরীরটা ভেঙ্গে গেলে যেমন আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষার দিকে দৃষ্টি পড়ে, সে রকম ছেলেটী নষ্ট হয়ে গেলে ছেলের জন্য আমাদের ভাবনা হয়। কি রকমে ছেলে ভাল করা যেতে পারে, উচিত সময়ে তার বন্দোবস্ত করা, অথবা গোড়াতেই কোন বিষয়ে মনোযোগী হওয়া আমাদের দেশের রীতি নয়। মা বাপেরা যদি ছেলেবেলা হতে ছেলেদের সাবধানে পালন করেন, ছেলেরা নষ্ট হতে পারে না, অন্ততঃ পক্ষে তাদের নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম, আমার বিশ্বাস। মা বাপেরা যে ইচ্ছা করে আপন আপন ছেলেমেয়েকে নষ্ট করেন, সে কথা আমি বল্‌ছি না, তবে অনেক সময়ে তাঁদের অজ্ঞতার দোষে ছেলেমেয়েরা যথাসময়ে উপযুক্ত শিক্ষা ও শাসন পায় না; যদি মা বাপ মনোযোগী হয়ে ঠিক সময়ে সুশিক্ষা ও সুশাসনের মধ্যে ছেলেদের রাখতে পারেন, তবে মা বাপ যেমন ইচ্ছা করেন, ছেলেরা প্রায়ই তেমনি হয়ে থাকে। টাকার কথা কি বল্‌ছ, লীলা? গৃহ-শিক্ষার সঙ্গে টাকার সঙ্গে কোন সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না। এই যে এখন শ্যামবাবুর ছেলের কথা বল্লে, ও ছেলেকে বাধ্যতা শেখাতে তাঁদের কত টাকার দরকার হত? তুমি জেন চরিত্রের

উপর মানুষ দাঁড়ায়, গৃহ-শিক্ষা দ্বারা চরিত্র গঠিত হয়ে থাকে। চরিত্র গঠন করতে টাকার কোন দরকার হয় না। টাকার অভাবে তুমি তোমার ছেলেকে উচ্চ শিক্ষা দিতে না পারতে পার, বড় বড় সহরে রেখে বড় বড় কালেজে পড়াতে না পারতে পার, কিন্তু সৎসাহস, সত্যবাদিতা প্রভৃতি যে সব গুণ মানব চরিত্রের অলঙ্কার, সে সব কেন দিতে পারবে না? আমাদের দেশের বড় লোক প্রায়ই গরীবের ঘরের ছেলে, আমাদের দেশের কেন, সব দেশের প্রায় বড় লোক গরীবের ঘরে পালিত। তাঁদের মনুষ্যত্ব ও চরিত্রের মহত্ত্ব গৃহ-শিক্ষার উপর নির্ভর করে। একবার যদি ছেলেকে চরিত্রগুণে সাজাতে পার, সংসারে মানুষ করে দাঁড় করে দিতে পার, তার কালেজে পড়া না হলেও চলবে, বিলাত কি আমেরিকা না গেলেও তার উন্নতিতে কেউ বাঁধা দিয়ে রাখতে পারবে না। প্রকৃত মনুষ্যত্ব একবার যার ভিতর ঢুকেছে, প্রহ্লাদের মত সে আগুণে পুড়বে না, জলে ডুববে না। আপন প্রভাব ও মহত্ত্ব বিস্তার করে পাহাড়ের মত সকলকে অতিক্রম করে উঠে যাবে। আমাদের বিদ্যাসাগরের কথা একবার চিন্তা করে দেখ দেখি, টাকা পয়সার অভাব কি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কোন কালে দমিয়ে রাখতে পেরেছিল?

সরোজ। মা, তোমার কথার কোন প্রতিবাদ করতে সাহস হয় না। ছেলে মেয়েদের শরীর ও চরিত্র গঠন বিষয়ে তুমি

যে ভাবে আমাদের দায়িত্বের কথা বল্‌ছ, তা শুনে বাস্তবিকই বড় ভয় হয়। আমাদের দোষ ত্রুটিতেই আমাদের ছেলেরা নষ্ট হয়, তা এখন অনেকটা সত্য বলে স্বীকার করতে হচ্ছে। আচ্ছা মা, আমরা কি রকম করে তার প্রতিকার কর্‌তে পারি?

মা। সরোজ, তোমরা মা হয়েছ, আর একবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, মনে রেখ — তোমরা শুধু নিজ নিজ সন্তানের মাতা নও, সমস্ত জাতির মাতা, দেশের জননী, এ জাতটাকে গড়ে তুলা তোমাদের হাতে, দেশটাকে উন্নত ও গৌরবান্বিত করা তোমাদের হাতে। ঈশ্বর তোমাদের হাতে যে কঠিন দায়িত্ব-ভার দিয়েছেন, তা' শুনে ভয় করলে চলবে কেন? সংসার তোমাদের কর্ম্মক্ষেত্র, ঈশ্বরের নাম নিয়ে, সাহস করে নেমে পড়, অসাধ্য, অসম্ভব কিছুই নয়, ধৈর্য্য ধরে, একমনে কাজে লেগে যাও, দেখবে তোমাদের সংসারে সুখ শান্তির ফোয়ারা ছুট্‌বে, দেশের মুখ উজ্জ্বল হবে, হিমাদ্রিশিখর মাথা উঁচু করে পৃথিবীর কাছে সগর্ব্বে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের মত * তোমাদের ও মহত্ত্ব ঘোষণা করবে। ভয় কিসের?

* It is a proud pleasure to me to be able to credit to my wife and mother whatever good qualities my fellow countrymen ascribe to me. To wife and mother mankind is indebted for their high moral qualities — gentleness, truth and virtues, so indispensable to good character, good citizenship and a noble life : our whole political fabric rests upon the sanctity of American home where the true wife and mother preside. They teach the boys and girls purity of life and thought and point the way to usefulness and distinction. The world owes them more than it can ever repay. — President M' Kinley.

দ্বিতীয় প্রস্তাব

স্বাস্থ্য-রক্ষা বিষয়ক কথা

মা। সরোজ, কি উপায়ে ছেলেদের সুস্থ রাখ্‌তে হয়, সে বিষয়ে তোমরা জান্‌তে চেয়েছিলে, আজ সেই বিষয়েই কয়েকটী কথা বল্‌ছি শোন। সর্ব্বাগ্রে পিতা মাতার প্রত্যেক ছেলে মেয়েদের স্বাস্থ্য রক্ষার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার। যে ছেলে নিত্যি রোগ ভুগে, দুদিনও সুস্থ থাকে না, সে সংসারে কী বা কাজ কর্‌তে পারে, নিজের জন্যই হোক বা দেশের জন্যই হোক?

সরোজ। তা মা ছেলে যদি নিত্যি রোগ ভুগে, রোগ সারান্ ত আর আমাদের হাতে নয়, ডাক্তার কবিরাজ যদি রোগ ভাল কর্‌তে না পারে, আমরা আর কি কর্‌তে পারি?

মা। দেখ সরোজ, আমার উদ্দেশ্য নয় ছেলেদের অসুখ বিসুখে ডাক্তার না ডেকে তাদের চিকিৎসার ভার তোমাদের হাতে নাও এবং নিজে বই দেখে তাদের ঔষধ দাও। তাতে উপকারের চেয়ে বরং অনেক সময়ে অপকারের সম্ভাবনাই বেশী। আমার ইচ্ছা, তোমরা স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাদি জেনে, ছেলেমেয়েদের অত্যাচার হতে রক্ষা কর, যেন তারা সহজে পীড়িত না হ'তে পারে। এটা বোধ হয় আমরা সকলেই কর্‌তে পারি। বিশেষ কারণ ব্যতীত

প্রায় সকল ছেলে মেয়ে বেশ সুস্থ হয়ে জন্মে থাকে। প্রাকৃতিক নিয়মে যদি আমরা তাদের রাখ্‌তে চেষ্টা করি, তাদের অসুখ বিসুখ না হওয়ারই কথা। পশু পক্ষীদের ব্যারাম খুব কমই হয়ে থাকে।

লীলা। আচ্ছা মা তা কেন? মানুষেরাই ত পৃথিবীতে প্রাণীর মধ্যে সব দিকে শ্রেষ্ঠ। পশু পক্ষীরা যদি আপন বুদ্ধি বলে রোগের হাত হতে মুক্ত থাকৃতে পারে, মান্‌ষেরা পারে না কেন? মান্‌ষের কি সে বুদ্ধি নাই?

মা। পশু পক্ষীদের ব্যারাম যে হয়না তা নয়, কিন্তু লীলা, তুমি অতি সুন্দর প্রশ্ন করেছ, তার কারণ তোমাকে বুঝিয়ে বলছি শোন। পশুতে আর মান্‌ষেতে তফাৎ এই যে পশুরা স্বভাব-বুদ্ধি দ্বারা চালিত হয়, মানুষেরা সাধারণতঃ বিচারবুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়ে থাকে। প্রকৃতি পশু পক্ষীদের চালক, মানুষ নিজেরাই নিজেদের চালক। তোমরা জান, মানুষের স্বাধীনতা আছে, অর্থাৎ কোন কাজ করা, কি না করা, মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তোমার ক্ষিদে পেয়েছে, খাওয়া না খাওয়া তোমার ইচ্ছাধীন, তোমার ইচ্ছাহলে খেতেও পার, না হলে ক্ষিদে সহ্য করে উপোস করে থাকৃতে পার। কিন্তু পশুদের এই স্বাধীনতা নাই, তারা প্রাকৃতিক নিয়মের সম্পূর্ণ অধীন, এবং প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসরণ করে চলে থাকে। ক্ষিদের সময় যে তারা নিজের খাদ্যটা পরের জন্য রেখে ক্ষিদে সহ্য

করে থাক্‌বে, সে স্বাধীনতা তাদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় না। যেখানে স্বাধীনতা আছে, সেখানে অত্যাচার হয়ে থাকে, যেখানে অত্যাচার হয়, সেখানে শাস্তির বিধান আছে। ব্যারাম ত আর কিছুই না — প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করার দরুণ আমাদের শাস্তি বিশেষ। ক্ষিদের সময় পশু পক্ষীরা যতটুকু আবশ্যক ততটুকু খাদ্য খেয়ে থাকে, স্বভাববুদ্ধি তাদের বেশী কি কম খেতে দেয় না। তুমি হয়ত দেখেছ পশু পক্ষীরা যখন খেতে থাকে, কিছুক্ষণ খেয়ে মাথা উপর করে রাখে. কোন কোন পশু পা দিয়া খাদ্যপাত্র উল্‌টিয়ে ফেলে, জোর করে যদি তুমি তাদের বেশী খাইতে চেষ্টা কর জিব দিয়ে তারা খাদ্য মুখ থেকে বের করে ফেলে। শরীর রক্ষার জন্য যে পরিমাণ খাওয়ার আবশ্যক, তার বেশী কি কম খাওয়ার ইচ্ছাই তাদের হয় না। যখন তখন খাওয়ার জন্য যে একটা লোভ, তাও তাদের মধ্যে দেখা যায় না। আমাদের কিন্তু তা নয়, অতিরিক্ত পরিমাণে খাওয়ার জন্য আমাদের লোভ হয়, আবার কোন কোন কারণে ক্ষিদে সহ্য করে উপোস করার ইচ্ছাও হয়ে থাকে। মানুষের স্বাধীনতা থাকাতে মানুষ নানা গুণের অধিকারী, অনেক মহত্ত্ব আমরা আমাদের মধ্যে দেখ্‌তে পাই। কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা আছে বলে যে আমরা প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন নহি, তা নয় প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন কর্‌লে আমাদেরও যথোচিত ভুগ্‌তে হয়। প্রাণী মাত্রেই যে সব

সাধারণ নিয়মের অধীন, মানুষও সে সব সাধারণ নিয়মের অধীন। যে মানুষ স্বাধীন ভাবে প্রাকৃতিক নিয়ম পালন করে চল্‌তে পারে, সেই সুস্থ, সবল ও দীর্ঘজীবী হয়ে থাকে। স্বাস্থ্য ত অন্য আর কিছু নয়, শরীরের নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও যন্ত্রাদির সুস্থতা রক্ষা করা মাত্র, অর্থাৎ তারা যদি সমান ভাবে এক যোগে স্বাভাবিক নিয়মে কাজ কর্‌তে থাকে তবেই স্বাস্থ্য রক্ষা হয়। তোমাদের বলেছি ছেলেরা, স্বভাবতঃ ও সাধারণতঃ বেশ সুস্থ শরীরে জন্ম গ্রহণ করে থাকে। পশু পক্ষীদের স্বাস্থ্য প্রাকৃতিক নিয়মেই রক্ষিত হয়ে থাকে, আমাদের ছেলে পিলেদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও অপরাপর শারীরিক যন্ত্রাদির সুস্থতা রক্ষা করা আমাদের উপর নির্ভর করে।

লীলা। প্রাকৃতিক নিয়ম কি মা? প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন হয়ে থাকা কি রকম ঠিক বুঝ্‌তে পারলুম না।

মা। শরীর সুস্থ রাখ্‌তে হলে আমরা দেখতে পাই, আমাদের কয়েকটা নিয়মের অধীন হয়ে চলতে হয়। যদি না চলি, তবেই অসুখ করে। আহার, নিদ্রা, শ্রম প্রভৃতি কয়েকটী আমাদের শরীর রক্ষার উপকরণ, এর মধ্যে কোন একটা বাদ দিলে কোন প্রাণী বেঁচে থাকতে পারে না। এক এক সময়ে শরীর এক একটা জিনিষ চায়, ইহাই শরীরের প্রকৃতি বা ধর্ম্ম। যখন শরীরের পক্ষে যেটা দরকার হয়, তখন যদি সেটা দেওয়া না হয়, তবেই ব্যারাম হয়ে থাকে। ক্ষিদের সময় খাবে, কাজের সময়

কাজ কর্‌বে, শ্রান্ত হলে বিশ্রাম কর্‌বে, ইহাই সাধারণ বা প্রাকৃতিক নিয়ম।

সরোজ। আহার, নিদ্রা, শ্রম, জল ও বায়ু এই পাঁচটী আমাদের শরীর রক্ষার উপকরণ। কোন্ বিষয়ে কি রকম সাবধান থাক্‌লে পর, আমরা ছেলে মেয়েদের সুস্থ রাখতে পারি, সেটা বিশেষ ভাবে জানা দরকার বলে মনে হয়।

মা। হাঁ সরোজ, আমি এক একটা করে সব বল্‌ছি শোন। খাওয়ার দোষেই ছেলে পিলেদের নানারকম অসুখ করে থাকে, তাই খাওয়ার কথাটা আমি আগেই বল্‌ছি। প্রথমেই একটা বিষয়ে তোমাদের বেশ মনোযোগী হতে হবে, ছেলেদের যখন তখন যা তা খেতে দেবে না। একটা নিয়ম করে দিনে তিন চার বার যা হয় ছেলেদের খেতে দেবে। খাওয়া বিষয়ে একটা বাঁধাবাধি নিয়ম থাকা বড়ই দরকার।

লীলা। অনেকেই, মা, সে বিষয়ে বড় গা করে না, তাতে কেউ যদি কিছু বলে, অনেক পিতা মাতাই বলে থাকেন — 'ছেলেদের কি এত নিয়মে রাখা যায়?'

মা। সত্যি লীলা, অনেকেই যখন তখন যা তা খাওয়ার প্রশ্রয় দিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁরা বুঝেন না এ রকম খাওয়াতে কি অনিষ্ট হতে পারে। বুঝলে বোধ হয় অনেকটা সাবধান হতেন।

সরোজ। বিশেষ অনিষ্ট কি আর হতে পারে মা?

মা। তাতে খুবই অনিষ্ট হয়ে থাকে। খাওয়ার অত্যাচারে অনেক রকমের ব্যারাম হতে পারে, হজম শক্তি

একেবারে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। খাওয়ার অত্যাচারে অজীর্ণ, উদরাময় প্রভৃতি যে সব রোগ জন্মে তাহা সহজে ভাল হয় না, সারাজীবন কষ্ট দিয়ে থাকে। আমাদের পাকস্থলীতে কি ভাবে খাদ্য হজম হয়, তা যদি জান তবে যখন তখন বারে বারে খাওয়ার অপকারিতা সহজে ধরতে পারবে।

লীলা। হাঁ মা, আমাদের খাদ্য কি ভাবে পাকস্থলীতে হজম হয়, তা বড় জান্‌তে ইচ্ছা করে। সে বিষয়ে আমাদের কিছু বল না।

মা। বল্‌ছি শোন। আমাদের পাকস্থলীটা অনেকটা ভিস্তিদের জল দেওয়ার চামড়ার থলি বা মস্তুকের মত। তার দুদিকে দুটা নলি আছে। একটা দিয়া আমরা যা খাই তা পাকস্থলীতে যায়, অপরটা দিয়ে উহা অন্য দিকে চলে যায়। পাকস্থলীতে লালার মত এক রকম তরল রস জন্মে। খাদ্যদ্রব্য পাকস্থলীতে ঐ রসের সঙ্গে মিশে থাকে। ঐ রসই হজম কার্য্যের বিশেষ সাহায্য করে। তোমাদের

১। পাকস্থলী ও নাড়ীভুঁড়ি।

মনে রাখবার সুবিধার জন্য ঐ জিনিষটাকে জীর্ণরস বলেই বল্‌ব। জলে চাল মিশিয়ে উননের উপর চাপিয়ে দিলে যেমন টক বক করে চাল সিদ্ধ হয়ে জলের সঙ্গে মিশে যায়, পাকস্থলীর কাজও অনেকটা সেই রকম। পাকস্থলীতে খাদ্য দ্রব্য পড়লে ঐ ভাবে পাকস্থলীর জীর্ণরসের সঙ্গে উহা মিশে যায়। আধসিদ্ধ চালের মধ্যে কতকটা কাঁচা চাল ফেলে দিয়ে খানিকক্ষণ পরে নামিয়ে রাখলে পর যেমন ভাত ভাল হয় না, ঠিক তেমনি একটা জিনিষ খাওয়ার পর, সেটা বেশ হজম হয়ে না গেলে, পাকস্থলীতে যদি নূতন আর একটা কিছু ফেলে দাও, তবে কোনটাই ভাল জীর্ণ হতে পারে না। পাকস্থলীর স্বাভাবিক কাজের বিশৃঙ্খলা জন্মে, এবং অজীর্ণ, উদরাময় প্রভৃতি রোগ জন্মে যায়।

লীলা। মা, উননের উপর একটু বেশীক্ষণ রাখ্‌লে পর ভাত ভাল সিদ্ধ হয়ে যায়; ঘন ঘন খেলে পর অসুখ করবার কি আছে, না হয় হজম হতে একটু বেশী সময়ের দরকার হবে? কথাটা ভাল করে বুঝতে পারলুম না।

মা। হাঁ, হজম হতে বেশী সময়ের দরকার হয়ে থাকে বই কি। আমরা কি প্রায়ই দেখ্‌তে পাই না, কোন কোন সময় নিমন্ত্রণে গিয়ে অতিরিক্ত পরিমাণে খেয়ে, কোন দিন বা খাবার পর বাজে রকমের খাবার খেয়ে, বিকালে ক্ষিদে হয় নি, উপোস করে থাকি? এখানে আমরা কী দেখতে পাই, তিন চার ঘণ্টার মধ্যে পাকস্থলীর যে কাজটা

শেষ হয়ে যেতে পারত, সে কাজটা শেষ হতে দশ বার ঘণ্টার দরকার হচ্ছে। কিন্তু আরও একটী কথা আছে, উননে আমরা যত সহজে আগুন রাখতে পারি, পাকস্থলীর আগুন তত সহজে ইচ্ছামত রাখা যায় না। পাকস্থলীর কার্য্য প্রণালীর কথা তোমাদের কাছে অতি সংক্ষেপে বলেছি, তাই তোমাদের বুঝতে একটু গোল হচ্ছে। বিষয়টা আমি আরও একটু পরিষ্কার করে বলছি শোন।

লীলা। হজম করতে কি খালি পাকস্থলীরই দরকার হয়ে থাকে? অন্য কোন যন্ত্রের দরকার হয় না কি? পাকস্থলীতে খাদ্য জীর্ণরসের সঙ্গে বেশ মিশে গেলেই কি খাদ্য হজম হয়েছে বলতে পারি?

মা। না, লীলা, হজম হওয়া মানে পাকস্থলীর জীর্ণরসের সঙ্গে খাদ্য মিশে যাওয়া নয়। খাদ্য হজম করতে আরও কয়েকটী যন্ত্রের দরকার হয়ে থাকে বই কি, সে বিষয়েই বলছি মন দিয়া শোন। তোমরা দেখেছ আমাদের পাকস্থলীটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্নায়ুমণ্ডলী দ্বারা গঠিত একটী থলি। তোমরা জান, আমাদের বুকের মধ্যে ফুসফুস বা বায়ুকোষ এবং হৃদপিণ্ড বা রক্তাধার আছে। পাকস্থলী এ দুটার খুব কাছাকাছি। খাদ্য দ্রব্য হজম করতে প্রথম দাঁত, দ্বিতীয় জিহ্বা, তৃতীয় গলার নালী, চতুর্থ পাকস্থলী, পঞ্চম অন্ত্র বা নাড়ীভুঁড়ি প্রভৃতি কতিপয় আভ্যন্তরিক যন্ত্র ও পাঁচ রকমের তরল রস—

১। লালা, ২। জীর্ণরস, ৩। পিত্তরস, ৪। ক্লোমরস, ৫। পাকরস — দরকার হয়ে থাকে। হজমশক্তি সতেজ রাখতে হলে যাতে এ যন্ত্রগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় কাজ করতে পারে, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। খাদ্য-দ্রব্য সর্ব্বশেষ ক্ষুদ্রান্ত্রে পাক-রসের সাহায্যে সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ হয়ে অন্য এক রকম রসে পরিণত হয়, তাকে আমরা জীব-রস বলতে পারি। ঐ রসের দ্বারাই জীবনীশক্তি রক্ষা হয়, এবং ঐ রস শরীরের পুষ্টতা সাধন করে। অন্ত্রব্যাপী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাড়ী এ রস হতে রক্ত গ্রহণ ক'রে ধমনীর দ্বারা হৃদপিণ্ডে নিয়ে যায়। খাদ্যদ্রব্য যদি জীব-রসে পরিণত হয়, আমরা বলি খাদ্য বেশ হজম হয়েছে।
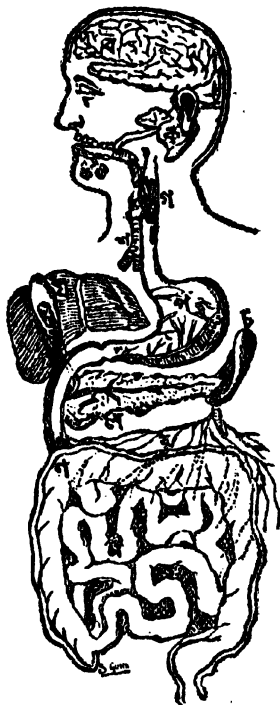
২। নরদেহে খাদ্যের গতি ও পরিণতি।

ব-মস্তিষ্ক। ক-লালাগ্রন্থি। গ-অন্ননালী। শ-শ্বাসনালী। চ-প্লীহা। প-জীর্ণ রসগ্রন্থি সম্বলিত পাকস্থলী। য-পিত্তরসগ্রন্থি সম্বলিত যকৃৎ। ল-ক্লোমরসগ্রন্থি সম্বলিত ক্লোম। র-রক্তগ্রাহী নাড়ী। ণ-বৃহদন্ত্র। ন-পাকরস স্রাবী ক্ষুদ্রান্ত্র।

দাঁতের দ্বারা আমরা শক্ত খাদ্য দ্রব্য গুলো চিবিয়ে গুঁড়া করতে পারি, যে দ্রব্য

যত বেশী গুঁড়া কর্‌তে পারি সে দ্রব্য তত সহজে হজম হয়ে থাকে। তাই ডাক্তারেরা বলে থাকেন, খাবার সময় খুব আস্তে আস্তে বেশ ভাল করে চিবিয়ে খাবে। অনেক সময় যখন তাড়াতাড়িতে আমরা আস্ত আস্ত জিনিষ গুলো না চিবিয়ে গিলে ফেলি. তখন দেখ্‌তে পাই ভাল হজম হয় না, পেট ফেঁপে উঠে। তাই যত দিন ছেলেরা ভাল করে চিবিয়ে খেতে না শিখ্‌বে, ততদিন তাদের শক্ত কোন দ্রব্য খেতে দেওয়া উচিত নয়। নিয়ম মত পরিষ্কার না করলে, অথবা কোন জিনিষ দাঁতের গোড়াতে লেগে থাকলে দাঁতের অনিষ্ট হয়, দাঁত শীঘ্র হাল্‌কা হয়ে যায়, পোকায় ধরে, কোন কোন সময়ে পড়ে যায়। তাই ছেলেরা যাতে নিয়ম মত দাঁত পরিষ্কার করে এবং খাওয়ার পর বেশ ভাল করে মুখ ধুয়ে ফেলে, সে অভ্যাস মা ছেলেকে দিয়ে করাবেন। দাঁতে খাদ্য দ্রব্য গুঁড়া করে দিলে পর, জিহ্বা মুখের লালার সঙ্গে গুঁড়া গুলো মিশিয়ে ফেলে, বেশীক্ষণ চিবিয়ে খেতে গেলে মুখে যথেষ্ট লালা জন্মিতে পারে। মুখে লালাস্রাবকারী কতগুলি গ্রন্থি আছে এগুলি হতে এ লালা নির্গত হয়। যত বেশী লালা খাদ্যের সঙ্গে মিশতে পারে হজম তত সহজে হয়. মুখে জলীয় জিনিষ বেশী থাকলে মুখে লালা বেশী আসে না, তাই ডাক্তারেরা খাবার সময় বার বার জল বা অন্য জলীয় খাদ্য খাওয়ার বড় পক্ষপাতী নহেন। লালার সঙ্গে মিশলে পর গলার নলির ভিতর দিয়ে ঐ গুঁড়া গুলি পাকস্থলীতে যায়। পাকস্থলীতে খাদ্য

দ্রব্য পড়লে পাকস্থলীর স্নায়ুমণ্ডলী উত্তেজিত হয়, এবং পাকস্থলীতে রক্ত সঞ্চালিত হতে থাকে। তখন পাকস্থলী হতে জীর্ণ-রস এসে খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে মিশতে থাকে। বস্তুতঃ ইহাই পাকস্থলীতে আগুণের কাজ করে, ইহার জন্যই পাকস্থলীতে খাদ্যদ্রব্য পঁচতে পারে না। এই তরল রস একটু একটু করে পাকস্থলীর স্নায়ুমণ্ডলীতে জমতে থাকে, যখন তখন পাকস্থলীতে থাকে না। সুস্থ শরীরে দিন প্রায় ২৪০ আউন্স রস পাকস্থলীতে জমে থাকে। তাই নির্দ্দিষ্ট সময়ে খেলে পর, জীর্ণ-রস পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জমতে পারে এবং উচিত সময়ে খাদ্য দ্রব্যের সঙ্গে মিশে খাদ্যদ্রব্য জীর্ণ করতে পারে। ইহার আবার এমনি তেজ, যদি ঠিক সময়ে পাকস্থলীতে খাদ্য দ্রব্য না পায় তবে পাকস্থলীর স্নায়ুমণ্ডলীর উপর ইহা কাজ করতে থাকে, তখন আমরা এক রকম যন্ত্রণা অনুভব করি। খুব ক্ষিদের সময়ে আমরা সাধারণতঃ কষ্ট অনুভব করে থাকি। সময় সময় দেখা যায়, অনেক দিন ক্ষিদে সহ্য করে থাকলে পাকস্থলীর আঁতের উপর ঘা হয়ে যায়। খাদ্য পাকস্থলী হতে বৃহদন্ত্রে এবং সেখান হতে ক্ষুদ্রান্ত্রে ঢুকে, ইহার জীর্ণ প্রয়োজনীয় অংশ শরীরের নানাদিকে চলে যায়, অপ্রয়োজনীয় অংশ শরীর হতে মলাকারে বের হয়ে আসে। এখন বোধ হয় তোমরা বেশ বুঝতে পারলে, বারে বারে খেলে পর বিশেষ অনিষ্ট হয়। ছেলেদের বেশ একটা বাঁধাবাঁধি নিয়মে খেতে দেবে, কিন্তু দেখবে, বাঁধাবাঁধি একটা নিয়ম করতে গিয়ে তাদের যেন বেশীক্ষণ ক্ষিদে সহ্য করে থাকতে হয় না।

লীলা। হাঁ মা, এখন বুঝেছি, বারে বারে খেলে পর স্বাস্থ্যের কি অনিষ্ট হতে পারে। আচ্ছা এক সঙ্গে বেশী খেলে পর বোধ হয় তেমন কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই।

মা। তা আছে বই কি। বেশী পরিমাণ খাদ্য হজম করতে হলে বেশী পরিমাণ জীর্ণ রসের দরকার, কিন্তু সে রস আসে কোথা হতে? কাজেই বেশী খেলে পর ছেলেদের যেটুক হজম করবার শক্তি আছে, সেটুকু খাদ্য হজম হয়ে বাকিটা কোন কোন সময় বমির সঙ্গে বা আস্থ মলের সঙ্গে বিকৃত আকারে বের হয়ে আসে, কোন কোন সময় বা উদরাময় প্রভৃতি রোগ জন্মায়। তা ছাড়া আরও একটা অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা এই যে, পাকস্থলীতে খাদ্য দ্রব্য পড়লে পাকস্থলী মস্তকের মত ফুলে উঠে। পাকস্থলী বেশী ফুলে উঠলে ফুসফুসে লাগে। ফুসফুসের উপর চাপ পড়লে নিশ্বাস প্রশ্বাসে আমাদের ভারি কষ্ট হয়ে থাকে। খুব বেশী আহারের পর কোন কোন সময় নিশ্বাস প্রশ্বাসে আমরা কষ্ট অনুভব করে থাকি। আহারের পর কোন কাজ কর্ম্ম করা যায় না। এ সব কারণে ছেলেদের বেশী না খাইয়ে বরং একটু কম খাওয়ানই ভাল। একটু কম খেলে বরং উপকারই হয়ে থাকে। আমাদের দেশে কথায় বলে ঃ—

“উনা ভাতে দুনা বল
অতি ভাতে রসাতল।”

সরোজ। মা, আমরা প্রায়ই দেখতে পাই, ছেলেরা

সর্ব্বদা খেতে চায়, যখন যেখানে যে দ্রব্য দেখে, সেটা খাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে, তাই অনেক সময়ে তাদের খেতে দিতে হয়। ফলতঃ যা তা খেয়ে তারা হজমও করে ফেলে। অনেকেই বলে, ছেলে পিলেদের হজম শক্তি খুব বেশী।

লীলা। তা যেন অনেকটা ঠিক, দিদি।

মা। না তা নয়, ওটাও আমাদের আর একটা ভুল ধারণা। ছেলেদের খাওয়ার ইচ্ছা হওয়াটা নিতান্ত স্বাভাবিক, কিন্তু তা বলে অত্যাচার করতে দেওয়া উচিত না। এই দেখ না, নূতন দাঁত বের হলে পর ছেলেরা কেমন যাকে তাকে এবং যেটা সেটা কামড়াতে চায়, তাই বলে কি আমরা তাদের কাম্‌ড়াতে দেই? নূতন দাঁতের ব্যবহার শিখবার জন্য যেটা সেটা কামড়াতে প্রকৃতি তাদের বলে দিচ্ছে, খাওয়া বিষয়েও সে রকম। সকল সময়ে যে ক্ষিদের জন্য খেতে চায় তা মনে করো না। ছেলে একটু বয়স্ক হলে পর, অনেক সময় লোভে পড়েও খেতে চায়। স্বাভাবিক অবস্থায় হজম শক্তি যেমন তীক্ষ্ণ থাকা উচিত, ছেলেদের শক্তি তেমন সতেজ ও তীক্ষ্ণ; তাই আমাদের উচিত তাদের নিয়মে রেখে তাদের হজম শক্তির পুষ্টি সাধন করা এবং অত্যাচারে যাতে এ শক্তি নষ্ট না হতে পারে তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা। কি বল সরোজ, ছেলেরা যা খায় তা হজম করে? আচ্ছা বল দেখি, মাসের মধ্যে আমাদের

ছেলে মেয়েদের অসুখ কতবার করে হয়ে থাকে। আমরা মনে করি, বিছানায় দুচার দিন পড়ে না থাক্‌লে ছেলেরা বেশ সুস্থ আছে। তাতেই আমাদের অনেক সময় মনে হয়, ছেলেরা যা খায় তা হজম করে থাকে। আমাদের ছেলেমেয়েদের চেহারাখানি একবার দেখলে, কখনও মনে হয় না যে, তাদের হজম করবার শক্তি আছে। যারা যা তা খেয়ে হজম করতে পারে, তারা কেমন বলিষ্ঠ মোটা সোটা। বল দেখি, পাড়ার ছেলেদের মধ্যে শতকরা কয়টী ছেলে হৃষ্ট পুষ্ট, মোটা সোটা পাওয়া যায়?

সরোজ। লীলা, বুঝলি এখন, এক হজম শক্তির উপর কত কি নির্ভর করে?

লীলা। মা, তুমি যদিও বলছ, ছেলেদের হজমশক্তি বেশী নয়, কিন্তু আমি একটী কাগজে পড়েছি যে এবিষয়ে আমেরিকায় অনেক তদন্ত ও আলোচনার ফলে সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, 'উঠন্ত বয়সের ছেলেমেয়েরা, জোয়ান লোকের চেয়ে, সওয়াগুণ বেশী খাদ্য হজম করতে পারে, সে কারণে তাদের ঘড়ি ঘড়ি ক্ষুধা পায় এবং টাটকা খাদ্য খুব ঘন ঘন তাদের খেতে দেওয়া দরকার।'

মা। লীলা, তবে তোমার কথাই ঠিক হবে। এখন খাদ্য বিষয়ে সংক্ষেপে দু' চারটা কথা বলছি, শোন। এমন খাদ্য বেছে নেবে যাহা বাস্তবিকই পুষ্টিকর।

লীলা। মা, আমরা কি এমন জিনিষও খাই যাহা আমাদের

কোন উপকারে আসে না ? খেলেইত শরীর রক্ষা হয়, খেয়েইত আমরা বেঁচে আছি, তবে আবার এটা খাবে না, ওটা খাবে, এতসব বিচার কেন ? মানুষের মধ্যেই যত বাড়াবাড়ি দেখতে পাচ্ছি। পশু পক্ষীরা কেমন সচ্ছন্দ চিত্তে, যেখান সেখান হতে, লতাপাতা, বীজ, বীজাণু, কীট ও পতঙ্গাদি খেয়ে দিব্বি আরামে ও সুস্থ দেহে ছুটে বেড়ায়, আর আমরা কিনা এটা, ওটা, বিচার করতে করতে আমাদের শরীর পাত করি। মানুষের মধ্যে বুদ্ধি বিবেচনাটা আরও একটু কম থাকলে, যেন ভাল ছিল, এত আর ঝঞ্ঝাটে পড়তে হত না, কি বল দিদি ?

সরোজ। হাঁ, বুদ্ধি বিবেচনার ভাগটা, তুই যেমনটা চাচ্ছিস, ঈশ্বর তোর মধ্যে তেমনটাই দিয়েছেন। তোর সারা গায়ে বুদ্ধি দেখতে পাচ্ছি, না হলে কীট পতঙ্গ লতাপাতা খেয়ে থাকবার সাধ যাবে কেন।

লীলা। কেন দিদি, দেখনা কত ঝঞ্ঝাট, প্রত্যেক কাজে এত হিসাব করেও কি চলা যায় ? মা, দেখ দেখি।

মা। সরোজ, তুমি দেখছি, লীলার কথাগুলো নিতান্ত উপেক্ষার ভাবে গ্রহণ করছ। কিন্তু তার কথাগুলোর মধ্যে একটী গূঢ়তত্ত্ব লুকায়িত রয়েছে, আমাদের সকলের সে তত্ত্ব জানবার নিতান্ত দরকার, না জানলে পর, লীলার মত আমাদের সকলকে গোলে পড়তে হবে।

সরোজ। সে কি মা ?

লীলা। এখন দিদি —

সরোজ। চুপ কর্।

মা। দেহ পুষ্টির হিসাবে খাদ্য নির্ব্বাচনের আবশ্যকতা বিষয়ে আলোচনা করবার পূর্ব্বে, দেহতত্ত্ব বিষয়ে আমাদের কিছু জানা দরকার। খাদ্যটা শুধু পাকস্থলীর জন্য নয়, কিন্তু সমস্ত শরীরের জন্য। আমাদের শরীরটা কি দিয়ে গড়া হয়েছে, শরীরের কোন উপকরণের জিনিষ আমরা কোথায় পাই, তা কি তোমাদের জানতে ইচ্ছা করে না? লীলার কথাগুলোর মধ্যে এসব প্রশ্ন রয়েছে।

লীলা। হাঁ, মা, আমি সে সব কথাই জানতে চেয়েছিলুম, দিদি আমাকে বকে চুপ করিয়ে দিলে।

সরোজ। বটে! তবে এত ঘুরিয়ে কথা বলবার কি দরকার ছিল? সোজা ভাবে জিজ্ঞাস করলে কি দোষ হত? থাক, এখন একটু চুপ কর, ভাই।

মা। মানুষের দেহটা তিনটী উপাদানে নির্ম্মিত — অস্থি, মাংসপেশী ও স্নায়ুমণ্ডলী। স্রষ্টার সুনিপুণ, অপূর্ব্ব শিল্প কৌশলে, নর-কঙ্কালের উপর, মাংসপেশী, সূক্ষ্ম সূতার ন্যায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নাড়ীও স্নায়ুমণ্ডলীর দ্বারা, এমন চতুরতার সহিত বুনা হয়েছে যে, একটা অপরটা হতে আলাদা হবার যো নাই। এভাবে সমস্ত শরীরটা বুনে তার উপর চর্ব্বির প্রলেপ দেওয়া হয়েছে, পরে সুচিক্কন সচ্ছিদ্র চামড়া দিয়ে সমস্ত শরীরটা দিব্বি সুন্দর করে ঢেকে দেওয়া হয়েছে, তাতেই মনুষ্য দেহটা এত মনোহর। খোলা নর-কঙ্কাল অতি ভীষণ আকৃতি।

শরীরের পূর্ব্বোক্ত তিনটী উপাদানের মধ্যে কোন একটা শিথিল হলে পর, মানুষ দুর্ব্বল ও খর্ব্ব হয়ে যায়। রক্ত এ তিনটার মধ্যে সূতার কাজ করে। প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ রক্ত, যদি সকল নাড়ী দিয়ে, সঞ্চালিত হতে না পারে, তবে স্নায়ুমণ্ডলী ও মাংসপেশী হালকা হয়ে যায়, এবং মানুষ নিতান্ত দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। শরীর নির্ম্মাণ ও রক্ষা কার্য্যে, এ জিনিষটা বড় দরকারী। বস্তুতঃ রক্তকেই মানুষের প্রাণ বলা যেতে পারে।

আমাদের ইন্দ্রিয়াদির ব্যবহার অর্থাৎ বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির পোষণ ও পরিচালন করা, মস্তিষ্কের কাজ। শিমুলের গোটার মত শক্ত মাথার খুলির মধ্যে মস্তিষ্ক অতি সুকৌশলে সুরক্ষিত হয়েছে; ইহা অনেকটা মৌমাছির চাকের মত। ইহার কোষগুলো, অনেকটা পাকা শিমুল তুলার মত অতি কোমল, সাদা ও ধূসর রঙ্গে মিশ্রিত পদার্থের দ্বারা আঁকাবাঁকা ভাবে পরিপূর্ণ। মস্তকের পেছন দিক হ'তে, মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে, একটী মোটা স্নায়ু ইহার শেষপ্রান্ত পর্য্যন্ত নেমে এসেছে। এই মোটা স্নায়ু হতে অসংখ্য সূক্ষ্ম স্নায়ুমণ্ডলী, জালের মত, শরীরের সমস্ত অংশে বিস্তারিত হয়ে আছে। এই স্নায়ুগুলো অনেকটা টেলিফোণের তারের কাজ করে থাকে— শরীরের যেখানে যখন যেটার অভাব হয়, ইহারা তৎক্ষণাৎ মস্তিষ্ককে খবর দিয়ে আসে। মস্তিষ্ক, স্নায়ুমণ্ডলীর দ্বারা, নানাভাবে আবশ্যক মত, অভাব দূর করে। মস্তিষ্ক

জ্ঞান ও বুদ্ধির ভাণ্ড। ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় সম্পর্কে, মস্তিষ্কের কোষ সমূহের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ আছে, যদি কোন কারণে, ইহার কোষ সমূহের বা ইহার কোন অংশের, যথা সময়ে, যথোচিত বিকাশ না হয়, তবে তদসম্পর্কীয় ইন্দ্রিয় দুর্ব্বল বা নষ্ট হয়ে যায়। আমরা যেমন ইচ্ছা করে শরীরের কোন অঙ্গকে দুর্ব্বল বা সবল করতে পারি, তেমনি উচিত ব্যবহার বা অপব্যবহারে আমরা মস্তিষ্কের কোষগুলো পুষ্ট বা নষ্ট করতে পারি। তোমরা জান, মস্তিষ্কের প্রভাবেই পৃথিবীর অনেক গুরুতর তত্ত্ব ও কাজ নির্দ্ধারণ ও সংঘটন করা হয়। মাথা হতে পা পর্য্যন্ত, শরীরের যেখানে যেটা দরকার, মস্তিষ্ক সেটা ঠিক জানতে পারে এবং সেটা সেখানে যোগায়ে থাকে। নরশক্তির উপকরণ ও প্রণালী বিষয়ে চিন্তা করলে, আশ্চর্য্য হতে হয়। বস্তুতঃ মানুষের শরীরটা এক বিচিত্র কারখানা, মস্তিষ্কই ইহার কর্ম্মকর্ত্তা বা পরিচালক।

সরোজ। রক্তই মানুষের প্রাণ বলে বলছ; তবে রক্ত বিষয়ে, প্রাণী মাত্রেরই খুব সাবধান থাকা নিতান্ত দরকার। শরীরে রক্ত কি ভাবে জন্মে এবং কি ভাবে কাজ করে, বলনা, মা।

মা। হাঁ, সত্যই, এক অর্থে, রক্তই মানুষের প্রাণ। তোমরা জান, খাদ্য দ্রব্য হজম হয়ে জীব-রসে পরিণত হয়; সে রস রক্তাকারে ধমনীর ভিতর দিয়ে হৃৎপিণ্ডে আসে। বেশ সুস্থ সবল দেহ হতে যদি ক্রমাগত রক্তস্রাব হতে

থাকে, তবে অতি শীঘ্র, সে দেহ হতে প্রাণ চলে যায়। তাই শরীরের কোন স্থান হঠাৎ ক্ষত হয়ে রক্তস্রাব হতে আরম্ভ হলে, তখনি তাহা বন্ধ করার চেষ্টা করা হয়। রক্ত কি করে প্রাণ রক্ষা করে, বলছি, শোন এখন। এক ফোঁটা রক্ত যদি যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখ, দেখতে পাবে, রক্ত জিনিষটা সাধারণ জলের মতনই, কিন্তু ইহাতে অসংখ্য টুক টুকে লাল চক্রাকার ও সাদা চক্রাকার, অনেকগুলো অতিক্ষুদ্র বেঙাচির মত জীবাণু, অনুক্ষণ ঐ জলীয় অংশে, ছুটাছুটি করে। পরীক্ষা করে ঠিক করা হয়েছে যে, এক ফোঁটা রক্তে ৫০ লক্ষ জীবাণু বর্ত্তমান আছে, তাতেই রক্তটা দেখতে টুকটুকে লাল। শেলাইয়ের কলের ছুঁচ যেমন সূতা মাথায় করে, কাপড়ের ভিতর চোখের নিমেষে ডুবে আর উঠে, কিন্তু যে সূতা নিয়ে ডুবে, সে সূতা নিয়ে উঠে না, প্রতি মুহূর্ত্তে, উপরের রিল হতে নূতন সূতা মুখে করে নিয়ে যায়, তেমনি রক্ত, ধমনী ও শিরার ভিতর দিয়ে, অবিরাম মাথার তালু হতে পায়ের গোড়ালি পর্য্যন্ত, সমস্ত শরীরে যাওয়া আসা করে, শরীরের ক্ষত অংশ, ক্রমাগত বুনে যাচ্ছে। প্রত্যেক গতিতে, ছুঁচের সূতার মত, রক্তের অসংখ্য লাল জীবাণু নষ্ট হয়ে যায়। আবার অসংখ্য লাল জীবাণু, ধমনী, হৃদপিণ্ড হতে, সূতার মত, টেনে নিয়ে আসে। এই নষ্ট জীবাণু শিরার ভিতর দিয়ে পুনরায় হৃদ্‌পিণ্ডে ফিরে যায়।

আমাদের হৃদ্‌পিণ্ডটা অনেকটা হরতনের টেক্কার মত। আকারে হাতের তালু হতে বড় নয়। ইহার দুইটী ভাগ আছে, প্রত্যেক ভাগের উপর ও নীচে দুইটী কোটর আছে। বাম ভাগের নীচের কোটর হতে একটী মোটা লাল নাড়ী বের হয়ে শরীরের প্রধান প্রধান স্থান দিয়ে, চলে গেছে। ডান দিক দিয়ে আর একটী কাল নাড়ী যকৃতের কাছ দিয়ে সমস্ত শরীর ঘু'রে ডান হৃদয়ের উপর কোটরে ঢুকেছে। হৃদপিণ্ড, ফুসফুসের মধ্যে অবস্থিত। ইহার দুই কোটর, ফুসফুসের সঙ্গে, স্বতন্ত্র নাড়ীর দ্বারা যুক্ত।
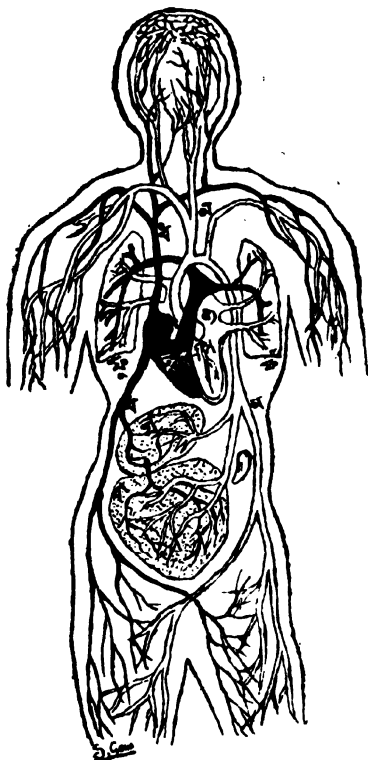
৩। নরদেহে রক্তপ্রবাহ।

ফু — ডানের ফুসফুস। ফ — বামদিগের ফুসফুস। ধ — স্পন্দনহীন কাল রক্তবহা শিরা। ন — লাল রক্তবহা ধমনী। য — যকৃৎ। প — পাকাশয়। হৃ — কাল রক্তের ডানদিগের হৃদয়। পি — লাল রক্তের বামদিগের হৃদয়।

বামদিগের হৃদয়ের টাটকা লালরক্ত, জলের কলের প্রধান নলের মত নীচেরকোটরের ধমনী দিয়ে, অতিবেগে ব'য়ে যাচ্ছে। এবং উক্ত ধমনী হতে নির্গত অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাড়ী, উক্ত লালরক্ত সমস্ত শরীরে নিয়ে যাচ্ছে। এ রক্ত জীবকোষ পুষ্ট করে ইহার লাল জীবাম্বু নষ্ট করে ফেলে, এবং কাল হয়ে শিরা দিয়ে হৃদপিণ্ডের ডান ভাগের উপর কোটরে ঢুকে। তাই আমরা ফরসা গায়ে, কাল রঙের নাড়ী বেশ দেখতে পাই। কাল রক্ত, সুস্থ দেহের হৃদপিণ্ডে বেশীক্ষণ থাকতে পারে না। ঢুকা মাত্রই, ডানদিগের হৃদপিণ্ডের নীচ কোটর দিয়ে. উভয় ফুসফুসে ঢুকে পড়ে।

ফুসফুস, অনেকটা, ধুনধুলের মাজা বা স্পঞ্জের মত। ইহা নিশ্বাসের সাহায্যে, বিস্তর বিশুদ্ধ বায়ু বাহির হতে গ্রহণ করে। বায়ুতে অম্লজান বাষ্প নামে এক জিনিষ আছে; তাহা রক্ত শোধনের কাজ করে। ফুসফুস কামারের ভাতির মত, উক্ত গৃহীত ও সঞ্চিত বাতাস ময়লা রক্তের ভিতর দিয়ে চালিয়ে দেয়। সোণারুর সোণা, যেমন আগুনে পুড়ে, বিশুদ্ধ হয়ে চকচক করে, এই কাল রক্ত, বায়ুর সংস্পর্শে, তেমনি পুনরায় টুকটুকে লাল হয়ে, বামদিগের হৃদপিণ্ডের উপর কোটরে আসে। ফুসফুসের বিশুদ্ধ বায়ু, ময়লা রক্তের ভিতর দিয়ে বয়ে নষ্ট হয়ে যায়। সে নষ্ট বায়ু, পুনরায় ফুসফুস, প্রশ্বাস দ্বারা, শরীর হতে বের করে দেয়। হৃদপিণ্ড ও ফুসফুসের মধ্যে, রক্ত ও বায়ুর অনুক্ষণ আদান

প্রদানের জন্যই, আমরা সর্ব্বদা বুকের মধ্যে একটা স্পন্দন অনুভব করি। এই স্পন্দনের প্রখরতার দ্বারা হৃদপিণ্ড কি ফুসফুসের সুস্থতা ডাক্তারেরা নির্দ্ধারণ করেন।

রক্তের লাল জীবাণু, এভাবে, দেহস্থ আভ্যন্তরিক জীব কোষ সমূহ পুষ্ট করে। এ জীবকোষ কোন কারণে বহির্জগতে দেখা দিলে, তাহারা তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়ে যায়। রক্তের সাদা জীবাণু, বহির্জগতের কীটানুর আক্রমন হতে জীবকোষ রক্ষা করে থাকে। যদি কোন কারণে, চামড়া কেটে শরীরের কোন স্থানের মাংস দেখা যায়, রক্তের সাদা জীবাণু, তৎক্ষণাৎ সে ক্ষত অংশ ঢেকে ফেলে সে অংশের জীবকোষ রক্ষা করে, তাই সাধারণতঃ, কাটা ঘায়ের উপর, আমরা একটা আবরণ পড়তে দেখতে পাই। রক্তের লাল জীবাণুর জোড় না থাকলে, কাটা ঘা শীঘ্র শুকাতে পারে না, তদ্দরুন আমরা দেখতে পাই, সাদা জীবাণু ক্ষত অংশে বরাবর জমতে থাকে এবং ঘা যত পুরাণ হয়, তত সাদা হয়ে যায় এবং ঘা হতে ক্রমাগত সাদা সাদা পুঁজ বের হয়। সাদা জীবাণুগুলো জীবকোষ রক্ষা করতে গিয়ে, এভাবে আত্মদান করে। রক্তের লাল কি সাদা জীবাণু, এ ভাবে, নষ্ট হলে, আমরা বলি রক্ত দূষিত হয়েছে। হৃদপিণ্ড ঘড়ির স্প্রিঙ্গের এর মত, শক্তির উৎস সঞ্চার করে, সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে সতেজ ও কর্ম্মঠ করে রাখে। পাকস্থলী অনেকটা হৃৎপিণ্ডে দম দেওয়ার কাজ করে থাকে।

লীলা। মাগো মা! আমাদের ভিতরটায় কি কাণ্ড কারখানাটা না হচ্ছে! ধন্য ঈশ্বরের সৃষ্টি কৌশল! যে প্রাণ রক্ষা করবার জন্য এত আয়োজন, এত কল কৌশল ঈশ্বর করে দিয়েছেন, না জানি তিনি প্রাণটাকে, আরও কত সুন্দর করে, সৃষ্টি করেছেন। মা, এতই যখন বল্লে, প্রাণটা কি রকম, একবার বল না।

সরোজ। প্রাণের আবার রকম কি? তোর যে মোটা বুদ্ধি, লীলা, যা মনে আসে, তাই বল্‌ছিস্, দেখতে পাচ্ছি।

লীলা। তা নয় কি, দিদি! তুমি কী রকম মানুষ! এত সব সৃষ্টি রহস্যের কথা শুনেও তোমার কি চুপ করে থাকতে ইচ্ছা করে? যে প্রাণ রক্ষার জন্য শরীরের ভিতর এত বড় একটা কারখানা খোলা হয়েছে, যে প্রাণ রক্ষার জন্য পৃথিবীতে কত কাণ্ড কারখানা হচ্ছে, সে জিনিষটা কি, তোমার জান্‌তেও ইচ্ছা করে না? হোক্ গে আমার মোটা বুদ্ধি, আমার ভাই, সে জিনিষটা কি রকম, জানতে বড়ই আগ্রহ হচ্ছে। জানত, দিদি, বল না।

মা। সরোজ! এবার তোমার বেশ শাস্তি হয়েছে, এখন লীলাকে বুঝিয়ে বল।

সরোজ। মা, আমি ওসব কিছু বুঝিনি না।

মা। তবে ও বেচারীকে বিদ্রূপ করছ কেন? সে ত সরল ভাবেই জিজ্ঞেস করছে।

না, লীলা, আমি তোমার ঐ প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি না।

সব কথাই যদি আমি বলে দিলুম, তবে তোমরা আর নিজেরা কিছু করবে না। তোমাকে কলেজে পাঠাচ্ছি তবে কিসের জন্য? এ তত্ত্ব, তোমরা নিজেরা খুঁজে বের কর, তোমরা কিছু কর্‌বে না, সবটা আমি বলে দেব, একথা ঠিক নয়। ছেলেদের মানুষ করা বিষয়ে কয়েকটা কথা আমি বলব ইচ্ছা করেছিলুম; কেননা, এ বিষয় না বল্লে হয় না! ছেলে গুলো গোল্লায় যাচ্ছে, তাতে দেশের ভারি দুর্নাম বের হচ্ছে। তোমরা পরিশ্রম করে এসব বিষয় সংগ্রহ করে শিখে নেবে, সে ভরসা আমি করি না। তা যদি দেখতুম, তোমরা লিখাপড়া শিখে, জাপান কি মার্কিণ অথবা অন্য সুসভ্য দেশের রমণীদের মত, দেশটাকে গড়ে তুলবার চেষ্টা কর্‌ছ, এ বিষয়েও আমি কিছুই বল্‌তুম না। যা বলেছি, তা'ও নিতান্ত সংক্ষেপে; শরীর তত্ব বিষয়ে বলবার ঢের বাকি আছে। আমি আশা করি, বাকিটুকু তোমরা নিজেরা চেষ্টা করে, জেনে নেবে। লীলা, এখন বুঝলে, আমাদের খাদ্যাখাদ্যের বিচার করা কেন দরকার, কেনইবা পুষ্টিকর খাদ্য আমাদের খাওয়া উচিত?

লীলা। মা, তুমিত, এখনও, সে বিষয়ে, কিছুই বল নাই।

মা। লীলা, তুমি নিতান্ত বোকা দেখতে পাচ্ছি। খাওয়াটাই শরীরের যন্ত্র গুলোর সুস্থতার জন্য। ক্রমাগত খেটে খেটে, ভিতরের যন্ত্রাদির ক্ষয় ও রক্তের জীবনী-শক্তি নষ্ট

হয়ে যায়। তাই এমন সব জিনিষ খাওয়া দরকার, যদ্বারা শরীরের অস্থিপঞ্জর, মাংসপেশী, চর্ব্বি ও রক্ত প্রভৃতি পুষ্ট হতে পারে। সব জিনিষের ত সমান শক্তি নাই, কোনটা মাংস গঠন কাজে, কোনটা বা হাড় নির্ম্মাণ কাজে বিশেষ উপযোগী। যা তা খেলেই কি হয়? তাই আমাদের শরীরের যন্ত্রাদির হিসাবে, আমাদের খাদ্য নির্ব্বাচণ করা দরকার। ঈশ্বরের এমন স্থষ্টি কৌশল যে তিনি বিশেষ বিশেষ যন্ত্রাদির উপযোগী বিশেষ বিশেষ খাদ্য স্থষ্টি করে রেখেছেন, আমাদের শুধু একটু বেচে নিতে হয়। সে টুক করতেও কি লীলা তুমি রাজী নও?

লীলা। এখন বেশ বুঝলুম, খাদ্যাখাদ্যের বিচার কেন, বস্তু বিচারের এত আবশ্যকতা কিসে। আচ্ছা, শরীরের কোন্ কোন্ যন্ত্রের পক্ষে, কোন্ কোন্ খাদ্য বিশেষ দরকার? আমাদের যা তা খেলে চলবে না, দেখতে পাচ্ছি।

মা। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করতে হলে, অনেক কিছু বলতে হয়। আরও অনেক কিছু তোমাদের জানতে হয়। তবে সংক্ষেপে, দু চারটী কথা, আমি এখন তোমাদের বলব, মনে করেছি। শরীরের মাংসপেশী বৃদ্ধি করার পক্ষে রুটি, ভাত, গম, মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি, অস্থি বা হাড় গঠনে দুধ, ছানা, জল, চুন, লবণ, শাক সবজী, সুপক্ক ফল, মেদ বা চর্ব্বি বৃদ্ধির পক্ষে চিনি, ঘি, তৈল, পণির, মাখন, ডিমের কুসুম প্রভৃতি বিশেষ উপকারী। দাল, ভাতই

আমাদের দেশের প্রধান খাদ্য। পুরাণ চাল, দালের মধ্যে মসূর, কলাই, ছোলা ও মুগ, অন্যান্য দাল অপেক্ষা, অধিকতর বলকারক। দাল যত বেশী সিদ্ধ হয়, ততই পুষ্টিকর হয়। সুজি, শটী প্রভৃতি ছেলেদের পক্ষে বেশ পুষ্টিকর খাদ্য। মাংস বেশ সুখাদ্য বটে, কিন্তু মাংস কিনে খেতে হলে, বিশেষ সাবধান হয়ে বাজারে মাংস কিনা আবশ্যক। কোন রকম রুগ্ন পশু কি পক্ষীর মাংস, কিম্বা পাঁচা মাংস, একেবারে ব্যবহার করবে না। ছাগ মাংসই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। কসাই বাড়ীর মাংস ব্যবহার করা উচিত নয়, কেননা কসাই বাড়ীতে মাংস যে ভাবে রাখা হয়, তাহাতে মাংস সহজেই নষ্ট হয়ে যায়। এ স্থলে আর একটী কথা তোমাদের জেনে রাখা উচিত। খাদ্য বিচার যেমন দরকার, খাদ্যের পরিমাণ ঠিক করাও তেমনি দরকার। এক একটা যন্ত্রের পুষ্টির জন্য, যে খাদ্য যে পরিমাণে দরকার হয়, তদতিরিক্ত সে খাদ্য খেলে, শরীরের অনিষ্টই হয়ে থাকে। কোন কোন অভিজ্ঞ ডাক্তার আমাদের পূর্ণ বয়স্ক লোকের, এক এক বেলার খাদ্যের পরিমাণ এভাবে ঠিক করেছেন ঃ—

চাল	৫ ছটাক
দাল, মাছ কিম্বা মাংস	১॥ ছটাক
তরিতরকারি	২ ছটাক
ঘৃত বা তৈল	অর্দ্ধ কাঁচ্চা
লবণ	অর্দ্ধ কাঁচ্চা

মশলাদি	২ কাঁচ্চা
দুধ	আধ সের

মানুষের ক্রমোন্নতির সঙ্গে খাদ্যেরও ক্রম-বিকাশ হচ্ছে। আমাদের দেশে এককালে নিরামিষ আহারের বড় আদর ছিল। দেহপুষ্টির যথেষ্ট উপকরণ, নিরামিষ আহারে যে পাওয়া যায় না, তা নয়, তবে যাহাদের বেশী রকম পরিশ্রম করতে হয়, আমিষ আহার তাদের পক্ষে দরকার।

সরোজ। মা, শুধু পুষ্টিকর খাদ্য কি ছেলেদের স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট নয়? শরীর রক্ষার পক্ষে অন্য কিছুরও দরকার হয় কি?

মা। দরকার হয়ে থাকে বই কি? পূর্ব্বেইত বলেছি, আহার, শ্রম ও বিশ্রাম, তিনটাই শরীর রক্ষার পক্ষে বিশেষ দরকার। শুধু খাওয়াতে শরীর পুষ্ট হয় না। শরীরের সঞ্চালন চাই। প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যায়াম চাই। চালনা অভাবে যন্ত্রাদি শিথিল হয়ে যায়। তাই আমাদের দেখতে হবে, ছেলেরা কি ভাবে পরিশ্রম করে, শুধু নিয়ম মত খাইয়ে, চুপ করে বসে থাকলে, চলবে না।

সরোজ। সে কি মা, আমরা কি জোর করে তাদের দ্বারা পরিশ্রম করাতে পারি?

মা। আমাদের কিছু জোর করতে হয় না। ছেলেরা নিজেরাই বেশ পরিশ্রম করে থাকে। প্রকৃতিই তা তাদের দ্বারা করিয়ে নেয়। এই দেখ না, ছোট ছোট ছেলেরা

হাত পা নেড়েচেড়ে, কেমন আপন মনে, কাজ করতে থাকে? কোন রকমের একটা পরিশ্রম না করে মানুষ থাকতে পারে না। ছেলেরা ভূমিষ্ঠ হয়েই, শ্রম করতে শেখে, সমস্ত শরীর চালনা করতে শেখে। বড় হয়ে লাফালাফি ছুটোছুটি করে থাকে।

সরোজ। তা ত তারা নিজেরাই করে থাকে, তবে আমাদের আর সে দিকে দৃষ্টি রাখার দরকার কি, মা?

মা। দরকার একটু আছে। ছেলেরা পরিশ্রম করতে গিয়ে অনেক সময়, বড় অত্যাচার করে ফেলে। যখন ছেলেরা খুব ছোট থাকে, দুচার মাসের থাকে, আমরা দেখতে পাই, বিছানায় শুয়ে, শিশু একবার হাত নাড়ে, একবার পা নাড়ে, একবার এ পিঠ হয়, একবার ও পিঠ হয়, এ ভাবে প্রায় সমস্ত শরীরটা আবশ্যক মত বেশ নাড়া চাড়া করে লয়। কিন্তু তা'রা যখন ক্রমেই বড় হতে থাকে এবং ইচ্ছা মত কাজ কর্ম্ম করতে শেখে, তখন তারা কোন না কোন একটা বিষয়ে, লিপ্ত হয়ে পড়ে—কোন মেয়ে হয়ত, ধূলি খেলা নিয়ে আছে, কোন ছেলে, হয়ত একটা বল নিয়ে দৌড়দৌড়ি করছে, কেহ বা একটা প্রজাপতির দিকে ছুটে যাচ্ছে, কেহ হয়ত আহার, নিদ্রা ভুলে, খেলাতে ব্যস্ত হয়ে আছে। যখন ছেলেদের এ অবস্থা, তখন আমাদের দৃষ্টি তাদের উপর থাকা চাই। তাদের এমন ভাবে, একটা কিছু দিতে হবে, যাতে তাদের [illegible] আমোদ

হয়, অথচ সমস্ত শরীর চালিত হয়। আমাদের দেখা উচিত, যেন তারা অতিশয় ক্লান্ত হয়ে পড়ে না, বা খুব পরিশ্রম করে, মুহূর্ত্ত পরে এমন কোন কাজ করে না, যাতে শরীরের অনিষ্ট হতে পারে, অথবা খেলতে গিয়ে যেন তারা কোন কদর্য্য, নোঙরামি অভ্যাসে অভ্যস্ত হয় না, অথবা কুসঙ্গীর সঙ্গে জুটে, কোন কুকাজে যেন হাত দেয় না।

সরোজ। মা, এখানেও ত দেখতে পাচ্ছি, মা বাপের অধিকতর সাবধানতার আবশ্যক।

মা। সত্যি, সরোজ, ছেলে মেয়েরা যখন একটু বড় হয়, চলতে শেখে, বাড়ীর বাহির হতে পারে, অপর দুচার জন ছেলে মেয়ের সঙ্গে মিশতে পারে, তখন মা বাপের দায়িত্ব গুরুতর হয়ে উঠে। গোঁয়েন্দার মত তাঁদের বরাবর ছেলেদের পেছনে পেছনে থাকতে হয়। মা বাপের কর্ত্তব্য, আপন মনে ছেলেদের খেলতে দিবেন, কিন্তু যখন তারা অন্যায় কোন কাজে হাত দেয়, অমনি পেছন হতে তাদের টেনে নিবেন। খাওয়ার কোন অত্যাচার হলে, না হয় তারা দু চার দিন কষ্ট পাবে, কিন্তু খেলতে গিয়ে, যদি হাত পা ভেঙ্গে ফেলে, অথবা কোন নোঙরামি অভ্যাস শিখে, অথবা কুসঙ্গীর সঙ্গে একত্র হয়ে, কুকাজ করতে শিখে, তবে তাদের সে অভ্যাস সহজে শোধ্‌রান যায় না। তাই, আমাদের কর্ত্তব্য, যখন ছেলে মেয়েরা স্বাধীন ভাবে চলে, তখন তাদের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা।

লীলা। মা, ছেলেরা আপন মনে খেলবে, তাতেও আবার মা বাপের এত সাবধানতা, এত চিন্তা! মা বাপের যে কিছুতেই সোয়াস্তি নাই, দেখতে পাচ্ছি। ছেলে একটা হলে পর, সে কি ভাবে থাকে, কোথায় যায়, কি ভাবে খেলে, কি খায়, কি পরে, অহর্নিশি মা বাপের এই চিন্তা। মা বাপের যেন আর সংসারে কোন কাজ নাই।

মা। মা বাপের দায়িত্বটা এখন বোঝ। সংসারে ছেলে মানুষ করা কত কষ্ট সাধ্য, মা বাপের কত শ্রম, কত চিন্তার দরকার ভেবে দেখ।

সরোজ। আচ্ছা মা, ছেলেরা যখন খেলতে থাকে, আমরা কি ভাবে সাবধান হলে পর তাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হতে পারে না?

মা। সরোজ, ছেলেরা যখন পরিশ্রম করতে থাকে, অলক্ষিতে তাদের স্বাস্থ্য ও চরিত্র দু'টা নষ্ট হতে পারে, তার কথঞ্চিৎ আভাস, আমি পূর্ব্বে তোমাদের দিয়েছি, এখন সে কথাই, আরও একটু পরিষ্কার করে বলছি, শোন। আমরা শ্রমকে দু'ভাকে ভাগ করে নিতে পারি।

১। কাজ (কাজের জন্য শ্রম)

২। খেলা (খেলার জন্য শ্রম)

আমরা ছেলেদের বেশী কাজ করতে দিই না। লেখা পড়ার কাজ, আর ঘরের সামান্য দু' একটা কাজ তারা করে থাকে। সামান্য সামান্য কাজও যখন ছেলেরা করে, তখনও আমরা আদর

করেই, লক্ষ্মী সোনা ইত্যাদি বলে, তাদের দ্বারা, সে সব কাজ করিয়ে নেই। তাদের অধিকাংশ সময় খেলাতে কেটে যায়। বস্তুতঃ খেলাই তাদের প্রাণ। মাছের গায়ে একটুও হাত না দিয়ে, হাঁড়ির মাছ গুলোর জলটুকু, যদি আস্তে আস্তে সরাইয়া দেওয়া হয়, মাছগুলো যেমনি মরে যায়, তেমনি ছেলেদের খেলার যদি কোন রকম বাধা দেওয়া হয়, অথবা ছেলেদের উপর, ছেলে বয়স হতে, বেশী রকমের কাজের চাপ দেওয়া হয়, অথবা তাদের কড়া শাসনের মধ্যে, রাখবার চেষ্টা করা হয়, ছেলেদের জীবন নিতান্ত শুষ্ক ও নীরস হয়ে পড়ে, — তাদের শরীর বাড়ে না, প্রাণ খোলে না। খেলার মধ্য দিয়ে ছেলেদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কর্ম্মঠ হয়, মনেরও বুদ্ধির বিকাশ হয়। তাই সযত্নে, ছেলে মেয়েদের খেলার মধ্য দিয়ে চালিয়ে নেবে। তারা যখন লেখা পড়া করে, আমাদের দেখা উচিত, লেখা পড়া করবার সময় যে সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চালনার দরকার সে সব যেন উচিত মত চালিত হয়। পাকস্থলী যেমন খাদ্য চায়, চোক নাক কাণ মস্তিষ্ক তেমনি স্বীয় স্বীয় আবশ্যকীয় উপকরণ চায়; যদি মস্তিষ্ক ধারণা করবার জিনিষ না পায়, তবে মস্তিষ্কের শক্তি ফুটতে পারে না — যে ছেলে ছেলেবেলা কোন কিছু মনে রাখতে চেষ্টা করে নাই, সে ছেলের মুখস্থ করবার শক্তি ফুটবে না, যে ছেলে কোন দিন চিন্তা করতে শিখে নাই, সে ছেলে কোন দিন, যদি কোন বিষয়ে চিন্তা করতে বসে, তার ভারি কষ্ট হয়, তার মনই সেদিকে যায় না। যে ছেলে কোন

দিন ছেলেবেলা সুমিষ্ট সুরের দিকে কাণ দেয় নাই অথবা সুন্দর জিনিষের প্রতি চোখ দেয় নাই, তাকে, পরে, সুর তাল, কি সৌন্দর্য্য শিক্ষা দেওয়া সহজ নহে। তাই এ সব শক্তি যাতে খেলার মধ্য দিয়ে ছেলেবেলা হতে তাদের মধ্যে ফুটতে পারে, সে দিকে পিতা মাতার দৃষ্টি থাকা উচিত। লেখা পড়ার কাজে আমাদের চক্ষু, মস্তিষ্ক, শ্বাসনালী ও ফুসফুস প্রভৃতি যন্ত্রাদির দরকার হয়ে থাকে। এ সব যন্ত্রের সুস্থতা রক্ষা করা আমাদের অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। ছেলেরা যখন নিজে বা দু'চার জন মিলে খেলে বা পড়ে, তখন তাদের এক একটা অভ্যাস দাঁড়িয়ে যায়। এ অভ্যাস ভাল হলে পর জীবনের উন্নতির সাহায্য করে, খারাপ হলে কিন্তু জীবনের উন্নতির পথে বাধা দেয়। তাই প্রত্যেক মা বাপের দেখা উচিত, ছেলেবেলা হতেই যেন ছেলেদের মধ্যে ভাল অভ্যাস জন্মে যায়। বস্তুতঃ ছেলেদের ছেলে বেলার অভ্যাস গুলো দেখে ভবিষ্যতে তারা কি রকম প্রকৃতির লোক হবে, সহজে বলা যেতে পারে।

সরোজ। আচ্ছা মা, আমরা কি করে ছেলে মেয়েদের মধ্যে ভাল অভ্যাস জন্মাতে পারি? অভ্যাস গুলো আপনা আপনিই হয়ে থাকে। কেউ কি আর ইচ্ছা করে কোন একটা করাতে পারে?

মা। এক রকমের কাজ বার বার করলে পর, সে কাজটা করবার জন্ম যে একটা ইচ্ছা ও শক্তি হয়ে উঠে, সেটাকেই

অভ্যাস বলে। দেখ লীলা, নদীতে যখন নৌকা স্রোতে ভেসে যেতে থাকে, মাঝি হাল ধরে নৌকা কোন্ দিকে যাবে, শুধু সে দিক্‌টা ঠিক করে রাখে এবং নৌকা সে দিকেই ভেসে যায়। স্রোতেই নৌকাকে নিয়ে যায়, তেম্‌নি ছেলে মেয়েরা স্বভাবতঃই কোন না কোন একটা কাজে লিপ্ত থাকে, সারাদিন কিছু না কিছু — ভাল হ'ক্, আর মন্দ হ'ক, করতে থাকে। যদি প্রত্যেক পিতামাতা মাঝিদের মত ছেলেদের মনটা ভাল কাজের দিকে ফিরিয়ে রাখেন, তবে সহজেই তাদের মধ্যে ভাল অভ্যাস জন্মে যেতে পারে আমাদের আর কিছু করতে হয় না, শুধু মাঝিদের মত হালটা ধরে বসলেই হয় — একটু সাবধান, একটু সচেষ্ট হলেই ছেলেরা কু-অভ্যাসে অভ্যস্ত হতে পারে না। অভ্যাস জন্মাবার জন্য আমাদের কোন চেষ্টার দরকার হয় না ভাল হো'ক, মন্দ হো'ক অভ্যাস মানুষের মধ্যে জন্মেই থাকে, তবে অভ্যাস গুলো ভাল করা কি মন্দ করা মা বাপের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, মনে রেখো।

ছেলে মেয়েরা প্রথম প্রথম কি ভাবে কাজ করতে থাকে, প্রত্যেক মা বাপের সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। কোন কোন ছেলে পড়বার সময় বুকে বালিশ চাপা দেয়, অথবা টেবিলের উপর বুক রেখে পড়ে। কেউ বা চোখের অতি কাছে আলো রেখে পড়ে। ছেলেরা প্রথমেই যখন অভ্যাস করতে থাকে, মা বাপ যদি প্রথম অবস্থায় তাহা বারণ

করেন, তবে শরীরের অনিষ্টকর কোন অভ্যাস তাদের মধ্যে জন্মিতে পারে না। তোমরা জান, বুকের মধ্যে ফুসফুস ও হৃদ্‌পিণ্ড আছে, বুকের উপর বেশী রকমের চাপ দিলে, বায়ু ও রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া ভাল চলতে পারে না, তাহাতে নানা রকমের ব্যারাম হতে পারে। পড়বার সময়, যাতে ছেলেরা বেশ সোজা হয়ে বসে পড়ে, যাতে বক্ষঃস্থল বেশী সঙ্কুচিত বা প্রসারিত না হয়, অথবা যাতে শরীরের আভ্যন্তরিক অন্য যন্ত্রাদির কাজের বাধা না জন্মিতে পারে, সে বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। ছেলেদের কখনও অতি উজ্জ্বল কিম্বা অতি মৃদু আলোকে কাজ কর্ম্ম করতে দিও না। তাহাতে চোখের অনিষ্ট হয়—দৃষ্টি শক্তি কমে যেতে পারে। কাজ কর্ম্মের পর রোজ ঠাণ্ডা জলে চোখ দু' তিন বার ধুয়ে ফেলতে, ছেলেদের অভ্যাস করাবে। ছেলেদের খুব ভোর বেলা উঠাবার অভ্যাস করা ভাল। ভোরের হাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী, ভোরের দৃশ্যও বেশ মনোরম, সে দৃশ্যে, ছেলেদের কোমল প্রাণে অনেক নূতন ভাব জন্মিতে পারে। ভোর বেলা একমনে পাঠ ও চিন্তা করবার উত্তম সময়। ভোরে উঠে হাত মুখ ধুয়ে, ছেলেদের নিয়ে বাহিরের বাতাসে কিছুক্ষণ এদিক ওদিক হাঁটলে বেশ উপকার হয়।

সরোজ। আচ্ছা মা, আর একটী কথা জিজ্ঞাস করি। কাজ কর্ম্ম করবার সময় ছেলেরা ঘরে থাকে, প্রায়ই আমাদের কাছে বসে কাজ কর্ম্ম করে, আমরা না হয়

তাদের দেখ্‌তে পারি, তাদের মধ্যে কোন কু-অভ্যাস যাতে না জন্মিতে পারে, তার চেষ্টা করতে পারি। খেলার সময় ত আর তারা কাছে থাকে না, কার সঙ্গে মিশে, কোথায় ছুটাছুটি করে, তার কি ঠিক থাকে? তখন ত নানা কু-অভ্যাস তাদের মধ্যে জন্মিতে পারে। তখন আমাদের কি রকম সাবধান হওয়া সম্ভব? আমরা ত আর তাদের সঙ্গে সঙ্গে যেতে পারি না।

মা। কি রকম আব্‌হাওয়ার্ মধ্যে ছেলেদের রাখবে তা তোমাদের ঠিক করে নিতে হবে, সরোজ। বাগানের গোলাপ গাছটা যদি জঙ্গলে ঘিরে থাকে, গাছটা বাড়তে পারে না, ফুলটা কখনও সুন্দর হয়ে ফুটতে পারে না, ফুলটা নেহাত ছোট হয়ে ফুটে, পাপ্‌ড়িগুলো পোকায় কাটে; পঁচা শেওলাপূর্ণ একটা ডোবাতে রুই মাছের একটা পোনা ছেরে দাও, মাছটা প্রাণে বাঁচবে বটে, কিন্তু পরিষ্কার দিঘীর মাছের মত বড় হতে পারবে না, তেমনি ছেলেদের আব্‌হাওয়া অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক অবস্থা যদি অনুকূল না হয়, ছেলেরা কোন দিকে বাড়তে পারে না। স্বাস্থ্যের হিসাবেও এ বিষয়টার দিকে দৃষ্টি রাখা নিতান্ত দরকার। গৃহের শান্ত স্নিগ্ধ হওয়ার মধ্যে ছেলেরা বাড়ে। এ গৃহ তাদের পক্ষে নিতান্ত মনোরম ও আদর্শ স্থান করে তোলা তোমাদের কর্ত্তব্য। গৃহটাকে যদি তারা শান্তি ও আরামের ক্ষেত্র, সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতার আদর্শ স্থান রূপে না দেখে, তা'তে অহর্নিশি মা বাপের

খিট খিটে প্রকৃতি, উগ্র মেজাজ, অসংযত বকুনি, সারাক্ষণ চেচামিচি ও উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার দেখতে পায়, তাদের প্রকৃতিও তেমনি কদর্য্য হ'য়ে উঠে।/এ হ'ল ঘরের কথা, বাহিরেও এসবের সংস্পর্শে যাতে তারা যেতে না পারে তার চেষ্টা করতে হবে। কুসঙ্গীর সঙ্গে, কি কুস্থানে, কাজে হ'ক, কি খেলায় হ'ক, ছেলেদের কখনও যেতে দিওনা। জাপানীদের মতে সুন্দর, শুদ্ধ, পবিত্র আব্‌হাওয়াই ছেলে মেয়েদের দেহ ও মন সুন্দর করবার প্রধান সহায়। এ সংস্কার এককালে আমাদের মধ্যে যে ছিল না, তা নয়।

ছেলেদের কাজকর্ম্মে আমাদের কি রকম সাবধানতার দরকার হতে পারে, সে বিষয় আমি সংক্ষেপে তোমাদের বলেছি। এখন খেলা সম্পর্কে দু একটা কথা বলছি, শোন। আমি পূর্ব্বেই বলেছি, শিশু জীবন খেলার ভিতর দিয়ে গঠিত হয়ে থাকে। খেলার ভিতর দিয়ে সংযম, শুচি, সত্য মিথ্যা, পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি শিক্ষা হয়। খেলার দ্বারা যেমন এক দিকে শিশুদেহ পুষ্ট ও ইন্দ্রিয়াদির বিকাশ হয়, অপর দিকে ইহার দ্বারা শিশুদের চরিত্রও গঠন করা যেতে পারে।

লীলা। মা, তবে কি তুমি মা বাপকে ছেলেদের সঙ্গে খেল্‌তে বলছ ?

মা। বলি বই কি। আমাদের দেশে ছেলে-খেলা নিতান্ত উদ্দেশ্যহীন বাজে কাজ বলে উপেক্ষা করা হয় তদ্বিষয়ে মা বাপের মনোযোগ দেওয়া দরকারই মনে করে।

হয় না। কিন্তু তোমরা মনে রেখ, ছেলে-খেলাটা নিতান্ত উপেক্ষার ভাবে অগ্রাহ্য করবার জিনিষ নয়। পরন্তু ছেলেদের খেলার দিকে একটু বেশী রকম মনোযোগ দিয়ে, তাদের ইচ্ছামত খেলতে না দিয়ে, যদি তাদের জন্য শিক্ষা মূলক নূতন নূতন খেলার বন্দোবস্ত করে দিতে পার, তবে তদ্দারা এক দিকে যেমন তাদের শরীর পুষ্ট হয় অন্য দিকে তাদের মানসিক শক্তিরও বিকাশ হয়। খেলাটা নিতান্ত উদ্দেশ্যহীন অস্বাভাবিক মনুষ্য শিশুর এক চেটিয়া বাজে সম্পত্তি নহে। যদি প্রাণী জগতের দিকে তাকাও দেখতে পাবে, পশু পক্ষীদের শাবকেরাও বেশ স্ফূর্ত্তির সহিত খেলে থাকে। কিন্তু তাদের সব খেলা উদ্দেশ্য মূলক—বিড়াল ছানা কেমন লেজ নেড়ে, মার লেজ লক্ষ্য করে লাফালাফি করে খেলা করে, কুকুরের বাচ্চা কেমন মুখে কাঠকুটা নিয়ে ছুটাছুটী করে। উত্তর কালে যে রকম ভাবে খাদ্য সংগ্রহ করে বেচে থাকতে হবে, শাবকাবস্থায় খেলার ভিতর দিয়ে, তারা তাদের সে ভাবে তৈরী করে নেয়। ছেলেদের খেলা দেখে, তাদের ঝোঁক কোন দিকে, ঠিক ধরতে পারা যায়। ছেলেমেয়েকে ভাল করতে হলে মা বাপকেও তাদের সঙ্গে খেলতে হয়, সকল সময় তাদের সঙ্গে থাকতে হয়। ছেলেদের সঙ্গে বেশী রকমের মেশামিশি আমাদের দেশের লোকেরা বড় পছন্দ করেন না, তাঁহাদের অনেকেরই ধারণা, ছেলেদের সঙ্গে মেশামিশি করলে পর ছেলেরা মানে গণে না।

সরোজ। সে কি মিছে কথা, মা? অনেক ছেলেইত বাড়ীর বয়স্ক লোকদের সঙ্গে ইয়ারকি দিতে চায়, কাহাকেও মানে গণে না, কাহারও কথাবার্ত্তা শুনে না।

মা। আমার মনে হয়, এর জন্য বাড়ীর লোকেরাই দায়ী। উপযুক্ত শিক্ষা পায় না বলেই ছেলেদের এ রকম স্বভাব দাঁড়িয়ে যায়। খেলার মধ্য দিয়ে কি ভাবে নীতিশিক্ষা দেওয়া যেতে পারে, সে বিষয়ে আমি পরে বলব, এখন স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে খেলা কি রকম উপকারী এবং তাহাতে আমাদের কি রকম সাবধান থাক্‌তে হয় সে বিষয়ে আরও কয়েকটী কথা বলছি, শোন। আমাদের দেশে ছেলেখেলার প্রতি যে রকম উপেক্ষার ভাব দেখান হয়ে থাকে, অন্যান্য শিক্ষিত সমাজে, শিক্ষিত লোকদের মধ্যে সে রকম কোন ভাবের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। ইংলণ্ড ও আমেরিকাতে পরিবারের সকল যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধারা ছেলেদের সঙ্গে মিলে খেলে থাকে। ইংলণ্ডে বিকেল বেলায় কতক সময় শুধু বালক বালিকাদের জন্য রাখা হয়ে থাকে, ঐ সময়টাকে 'চিলড্রেনস্ আওয়ার' বলা হয়। সারা দিনের কাজ কর্ম্মের পর ঐ সময়ে পিতা মাতা একত্র হয়ে ছেলেদের সঙ্গে নানারূপ আমোদ আহ্লাদ করে থাকেন।

খেলার উদ্দেশ্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও মানসিক বৃত্তি সমূহের পরিচালনা করা। খেলার সময় যাতে এই দুইটা উদ্দেশ্য রক্ষিত হতে পারে, তদ্বিষয়ে পিতা মাতার দৃষ্টি রাখা উচিত।

কোন্ ছেলের জন্য কি রকম খেলার বন্দোবস্ত করা যেতে পারে, তাহা পিতা মাতারাই ঠিক করবেন। ছেলেদের বেশীক্ষণ রৌদ্রে কিম্বা ঠাণ্ডায় থাকতে দেওয়া কিছুতেই সঙ্গত নহে। কোন কোন ছেলে খেলা নিয়ে প্রায় সারাদিন রৌদ্রে থাকে, কেহবা জলে কাদায় থাকে, তাতে তাদের স্বাস্থ্যের বড় অনিষ্ট হয়ে থাকে। যে সব খেলাতে সমস্ত শরীর সুন্দররূপে চালিত হতে পারে, এমন সব খেলার বন্দোবস্ত করা উচিত। দু' তিন বৎসর বয়সের ছেলেদের ছোট ছোট বল দিলে তারা তা' নিয়ে বেশ ছুটোছুটি করে। অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সের ছেলেদের জন্য ফুটবল, ড়ুড়ু প্রভৃতি খেলা মন্দ নহে। কোন কোন স্কুলে এখন ড্রিল, ডন ও জাপানী জুজুৎসু ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। এই সব ব্যায়ামে বেশ উপকার হয়ে থাকে। বিকেল বেলাই খেলার উত্তম সময়। বিকেলে ঘণ্টাখানেক কাল নিয়মমত ডন করলে সর্ব্বাঙ্গ চালিত হয়। আমাদের দেশে পূর্ব্বে মাটির উপর নানা রকমে ছেলেরা ডন অভ্যাস করত, এখন ডনের জন্য নানা সরঞ্জাম প্রস্তুত হয়েছে। সম্প্রতি ডামবেল্ ভাজার দিকে সকলের বেশ দৃষ্টি পড়েছে। সেন্‌ডো সাহেবের প্রদর্শিত প্রণালীতে নিয়ম মত ডামবেল্ ভাজ্‌লে শরীর সুন্দররূপে চালিত হয়ে থাকে। তবে ডন, ড্রিল, ও ডামবেল্, এই সব খেলাতে একটা অসুবিধা আছে। এ সব ব্যায়াম অনেক সময়ে ছেলেদের একাই করতে হয়।

তাতে তারা আমোদ পায় না, অনেক দিন পর্যন্ত নিয়ম রক্ষা করে চলতে পারে না। পিতা মাতা যদি ছেলেদের জন্য এ সব খেলার বন্দোবস্থ করেই নিশ্চিন্ত থাকেন, তবে ছেলেরা কিছু দিন খেলে ছেড়ে দেয়! তবে যদি পিতা কি বাড়ীর অন্য বয়স্ক কোন আত্মীয় যুবক ছেলেদের সঙ্গে এ সব খেলায় যোগ দিতে পারেন, তবে ছেলেরা বেশ আমোদের সহিত নিয়ম মত এ সব ব্যায়াম কর্‌তে পারে।

সরোজ। মা, তুমি কি বল, ছেলেদের পাশাপাশি বাপও ডামবেল ভাজ্‌বেন, কি ছেলের সঙ্গে মিশে ডন কর্‌বেন? এ রকম একটা দৃশ্যের কথা মনে হলে যে হাসি পায়।

মা। সরোজ, যখন তোমরা ঘরে ঘরে এরকম দৃশ্য দেখবে, তখন মনে করবে, দেশ উন্নতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদে যদি ছেলেদের সঙ্গে পিতা মাতারা প্রাণ খুলে যোগ দিতে পারেন, তবে জে'ন, ছেলেদের অশেষ মঙ্গল হয়। তিন চারি বৎসর বয়স্ক ছেলেদের জন্য কোন কোন পরিবারে ম্যাজিক লেণ্টারন, ম্যাগনেট, রিয়েলিটিস্‌কাপ, কারপেণ্টার বকস্‌, পাজল বকস্‌ ইত্যাদি আধুনিক শিক্ষাপ্রদ খেলনা কিনে দেওয়া যেতে পারে। তাহাতে এক দিকে অল্প বয়স্ক ও অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন ছেলেদের যেমন আমোদ হয়, তেমনি শিক্ষাও হয়ে থাকে। অল্পবয়স্ক ছেলেদের পক্ষে ফুটবল, বেটবল ইত্যাদি ব্যায়াম উপকারী নহে। কেননা, তাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তখনও নিতান্ত কোমল অবস্থায় থাকে, ঐ সব

খেলাতে শরীরের অত্যধিক চালনা হয়ে থাকে, তাতে সময়ে সময়ে কোমল অঙ্গ প্রত্যঙ্গে আঘাত লাগবার সম্ভাবনা আছে। কোন কোন পরিবারে অবসর সময়ে, ছেলে মেয়েরা মিলে অভিনয় করে পিতা মাতা ও আত্মীয় জনকে দেখাতে পারে, কোথাও বা তারা আপন বন্ধু ও সমপাঠিদের সখের নিমন্ত্রণ খাওয়াতে পারে, কোথাও বা ছেলেমেয়েদের সুন্দর সুন্দর ছোট ছোট গান ও কবিতা শেখান যেতে পারে। কোথাও বা মা বাপ, তাদের সঙ্গে লয়ে, ফুলবাগানের ছোট ছোট ফুল গাছের যত্ন করতে উৎসাহ দিতে পারেন, কোথাও বা কোন কোন ছেলে মেয়েকে ভোরের বেলা ফুল কুড়াতে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। উপরোক্ত সব গুলিতে ছেলেরা বেশী আমোদও উৎসাহ পেয়ে থাকে। ঐ সকল নির্দ্দোষ আমোদে তাদের কোমল বৃত্তি সমূহের বিকাশ হয়, শরীরও ধীরে ধীরে চালিত ও পুষ্ট হয়। দেশে শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের জন্য নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদের বন্দোবস্ত করবার চেষ্টা হচ্ছে। এ বিষয়ে পিতা মাতা যত বেশী দৃষ্টি রাখ্‌বেন, ততই ছেলেদের মঙ্গল হবে। ছেলেরা যখন খেলতে যায়, তখন পিতা মাতার যে কয়েকটী বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত, সে কয়েকটী বিষয় আমি তোমাদের কাছে বলছি —

(১) ছেলেরা যেন অতিরিক্ত পরিশ্রম করে না।

(২) অধিক্ষণ রৌদ্রে কি জলে থাকে না।

(৩) খেলার নাম করে গায়ে যেন ধূলা বালি মাক্‌তে অভ্যাস করে না।

(৪) ঝগড়া বিবাদ করে না।

(৫) স্বার্থপরতা কি সঙ্কীর্ণতার ভাব যেন তাদের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না।

স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে খেলা বিশেষ উপকারী হলেও, একেবারে আমোদে মত্ত হয়ে থাকলে, তাতে উপকার না হয়ে বরং অপকার হতে দেখা যায়। প্রত্যেক বিষয়ের একটা সীমা আছে, তাহা অতিক্রম করলেই ফল বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়। আমোদ প্রমোদের অভাব যেমন শিশু জীবনের অনিষ্টকর, আবার বাহুল্যও তেমনি অনিষ্টকর। তাই খেলবার সময়েও ছেলেদের নিয়মের মধ্যে রাখতে চেষ্টা করবে।

লীলা। তা কি করে করা যায় মা?

মা। কেন লীলা, অতি সহজে ও সামান্য চেষ্টাতেই পিতা মাতা ছেলেমেয়েদের নিয়মের মধ্যে রাখতে পারেন। খাওয়ার জন্য পিতা মাতা যেমন একটা সময় নির্দ্দিষ্ট করে রাখেন, খেলার জন্যও ঠিক সেই রকম একটা সময় নির্দ্দিষ্ট করে দিলে, আর যখন তখন খেলতে পারে না। সব কাজের জন্য সময় নির্দ্দিষ্ট করা থাকলে কোন একটা কাজে বেশীক্ষণ লিপ্ত হয়ে থাকার সুবিধা হয়ে উঠে না। আমি আশা করি, তোমরা এখন বেশ বুঝেছ, আমরা কি ভাবে ছেলেদের উচ্ছৃঙ্খলতার হাত হতে রক্ষা করতে পারি।

ছেলেদের কাজও খেলা সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলেছি। এখন বিশ্রাম সম্পর্কে কয়েকটী কথা বলছি, শোন।

লীলা। ছেলেরা যখন বিশ্রাম করে, তখনও কি মা বাপের শান্তি নাই?

মা। সন্তান পালনে পিতা মাতার পরিশ্রমের কথা, সতর্কতার কথা শুনে অত অস্থির হলে চল্‌বে কেন। তুমি কি আশা কর, পিতা মাতা বেশ হাত পা গুটিয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন, আর ছেলেগুলো এক একজন মহাপুরুষ হয়ে দেশের গৌরবস্থল হউক। তাও কি হয়! ভাল ফসল চাইলে, কৃষকদের যেমন দিন রাত খাটতে হয়, তেমনি একটী ছেলে মানুষ করতে হলে, মা বাপের বহু যত্ন ও চেষ্টার দরকার। সাধনা ছাড়া সিদ্ধি কোথায়?

সরোজ। লীলা, তুই কি এ সব সামান্য কথাও বুঝিস না? বিনা চেষ্টায়, বিনা শ্রমে, কি কোন দিন কোন ভাল কাজ হতে পারে? বিশ্রাম সম্পর্কে মা কি বলে, শোন।

মা। দেখ সরোজ, কাজ কর্ম্মের সময় ছেলেরা কোন না কোন এক জনের কাছে থাকে, কাজে কর্ম্মে মনোযোগ থাকে, বিশ্রামের সময় কিন্তু ছেলেরা স্বাধীন থাকে, কোন একটা বিশেষ কাজে তাদের মন লাগাতে হয় না, কাহারও শাসনে থাকতে হয় না, এ সময় যে কোন রকমের অত্যাচার করার বিলক্ষণ সুবিধা থাকে। বস্তুতঃ অনেক ধনী পরিবারের ছেলেদের, এ সময়ে কুসঙ্গীর সঙ্গে মিশে, একেবারে নষ্ট

হয়ে যেতে দেখা গিয়াছে। ছুটীর সময় ছেলেরা যখন বাড়ী আসে, দিনের কাজ কর্ম্ম শেষ করে যখন আমোদ করতে থাকে, তখন পিতা মাতার কর্ত্তব্য তাদের দিকে দৃষ্টি রাখা। এই সময় তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টি না রাখলে ছেলেরা সহজে নষ্ট হয়ে যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

লীলা। আচ্ছা, মা, বিশ্রাম আবার কেন? পশু পক্ষীরা ত বিশ্রাম করে না।

মা। কে বলে পশু পক্ষীরা বিশ্রাম করে না? তুমি কি জান না লীলা, মানুষের শক্তি অতি সামান্য। আমাদের শরীর এমন ভাবে গঠিত যে, কিছুক্ষণ চালনা করলে পর শ্রান্ত হয়ে পড়ে, খানিকক্ষণ বিশ্রাম না করলে পর আর শরীর কাজ করতে চায় না। কাজ কর্ম্ম যদি একেবারে না কর, তোমার শরীর যেমন দুর্ব্বল হয়ে পড়বে, তেমন আবার যদি অতি বেশী খাটতে থাক, তোমার শরীর ভেঙ্গে যাবে,—তুমি রুগ্ন হয়ে পড়বে। এই দেখ না আমরা চোখ দিয়ে দেখ্‌তে পাই, যদি কিছুদিন কোন উপায়ে চোখের ক্রিয়া বন্ধ করে দেই—চোখকে দেখ্‌তে না দেই, তবে কিছুকাল পরে চোখের স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যায়, অন্যদিকে যদি আবার দিন রাত চোখ খাটাই, তা'তেও দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। অনেক ছেলে দিন রাত পড়ে পড়ে চোখ নষ্ট করে ফেলে, শোন নাই কি? তাই স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য শ্রমের যেমন আবশ্যক, বিশ্রামেরও

তেমনি আবশ্যক। বিশেষতঃ বিশ্রাম কাজের অনেক সাহায্য করে — একটুখানি বিশ্রামের পর আবার কাজ করতে ইচ্ছা হয় ও কাজে স্ফূর্ত্তি পাওয়া যায়। রাত্রির বিশ্রামের পর আমরা ভোরে কেমন স্ফূর্ত্তির সহিত, কাজ করতে পারি।

সরোজ। আচ্ছা, বিশ্রামের সময় কি ছেলেদের কোন কাজ কর্ম্ম করতে দেওয়া উচিত নয়, মা?

মা। আমি ঘুমের কথা বল্লাম বলে, মনে করোনা বিশ্রামের কালটা শুধু ঘুমিয়ে কাটাতে ছেলেদের অভ্যাস করাবে। বস্তুতঃ অনেক ছেলে মেয়েকেই দিন রাত অবসর সময়টুকু ঘুমিয়ে কাটাতে দেখা যায়। ঘুম এক রকমের বিশ্রাম হলেও, অধিকক্ষণ ঘুমালে স্বাস্থ্যের বড়ই অনিষ্ট হয়ে থাকে, শরীর নিস্তেজ হয়ে যায়। ডাক্তারদের মতে পাঁচ ছয় ঘণ্টার বেশী ঘুমান স্বাস্থ্যের পক্ষে মঙ্গলজনক নহে। রাত্রি দশটার সময় শুয়ে, ভোর পাঁচ টার সময় উঠলে যথেষ্ট বিশ্রাম করা হয়। দিবা নিদ্রা সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। কোন কোন সময়ে দেখা যায়, কোন কোন কারণে ছেলেরা অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত জেগে থাকে, কোন কোন মাতা অধিক রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়ে ছেলেদের খাইয়ে থাকেন, এই দুই প্রকারে শিশুর স্বাস্থ্য নষ্ট হতে দেখা গিয়াছে। আবার অনেক সময়ে দেখা যায়, ছেলে কি মেয়ে খুব কাঁদছে মা কিছুতেই শান্ত করতে পারছেন না, নিতান্ত নিরুপায় হয়ে শিশুর মুখে কিছু দিয়ে শিশুকে ঘুম পাড়িয়ে মুক্তি

লাভ করবার চেষ্টা করেন; কিন্তু এ রকম অনিয়মে যখ
তখন ছেলেদের ঘুমাবার অভ্যাস করালে ছেলেদের স্বাস্থ্য নষ্ট
হয়ে যায়, এবং এ কুঅভ্যাসের দরুণ তারা ভবিষ্যতে উন্নতি লা
করতে পারে না। মনে রেখ, ঘুমিয়ে কাটাবার জন্য মানুষে
জীবন নহে, জেগে কাজ করবার জন্যই মানুষের জীবন
তাই স্বাস্থ্যের অনিষ্ট না করে, মানুষ যত কম ঘুমা
পারে ততই ভাল। বিশ্রামের সময় ছেলেদের কোন কা
করতে দেবে না, এ কথা ঠিক নয়। অবসর সময়
আমাদের এক রকমের বিশ্রামের সময়, তখন তোমরা ছেলে
মেয়েদের সঙ্গে নানা রকমের আমোদের ব্যবস্থা কর
পার এবং তা'দের নিয়ে তখন খেলা করবার বেশ সুবি
করে নিতে পার।

সরোজ। মা, আমাদের আবার অবসর সময়! সারাদি
খাট্‌তে খাট্‌তে প্রাণান্ত হয়ে উঠে, ঘর-সংসারের কাজ ক
সময় পাই না, ছেলেদের সঙ্গে খেলব কখন? আমাদে
বিশ্রাম নাই।

মা। সরোজ, সত্যি, তোমাদের কাজও নাই বিশ্রাম
নাই। বাস্তবিক যারা কাজ করে, বিশ্রাম না করে তার
পারে না। তোমরা কি মনে কর, তোমরাই কেবল সংসা
চালাচ্ছ? অন্য দেশের রমনীরা কি ঘর-সংসার করে না;
তারা কাজ ভাল মতনই করে, বিশ্রাম করতেও ছাড়ে না;
তারা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে স্ফূর্ত্তির সহিত, ছেলের মতনই

খেলে, দশ কাজের মধ্যে এও তাদের অবশ্য কর্ত্তব্য আর একটী কাজ। জাপানে কি হয়ে থাকে, জান?

লীলা। কি হয়, মা?

মা। জাপানী মেয়েরা সুশৃঙ্খলার সহিত ঘর-সংসারের কাজগুলো গুছিয়ে, ঠিক সময়ে শেষ করে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে প্রত্যহ বেশ স্ফূর্ত্তির সহিত আমোদ করে। তারা 'মিশানের ভোজ' দেয়, 'পুতুলের ভোজ' দেয়, এর জন্য অনেক খরচে এক একটা উৎসব তাদের দেশে হয়ে থাকে। তোমরাত বলছ যে, এ রকম দৃশ্য দেখলে তোমাদের হাসি পায়। তোমাদের কাজের চেয়ে, ইংরেজ বা জাপানী রমনীদের কাজ কিছুতেই কম নয়, তারা পৃথিবীর কত খবর রাখে? প্রতি ঘরে ঘরে সংসারের কাজ ছাড়া কত রকমের শিল্প কাজ তাদের করতে হচ্ছে, তাদের কাজের তুলনায় তোমাদের কাজ কিছুই নয়। তোমরা কোন মতে ঘর-সংসারের কাজটা করে বাকী সময় ঘুমিয়ে, না হয় গল্প করে কাটাও। নয় কি? এ ঘর-সংসারের কাজের মধ্যেও শৃঙ্খলা কি স্থিরতা নাই — কত চেচামেচি, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কত হাক ডাক, কত বকুনি, কেমন নয় কি?

সরোজ। মা অন্য দেশের রমনীরা কি কথা কয় না? তুমি যে আমাদের সব কাজে দোষ খুঁজতে আরম্ভ করলে। কথা বলা ও কি দোষ?

মা। সরোজ, আমি নিন্দার ভাবে কিছু বলি নাই। কথা বলা দোষ হবে কেন? কিন্তু আমাদের একটী পরিবার, আর

জাপান, ইংরেজ, মার্কিন অথবা অন্য যে কোন সুসভ্য দেশের আর একটী পরিবার যদি পাশাপাশি বাড়ীতে রাখ, তোমরা নিজেরা আমার কথা স্বীকার করে নেবে, আমাদের পরিবারে সারাদিন বকাবকি, চেচামেচি ও অস্থিরতার কোলাহল উঠ্ছে, আর পাশের বাড়ীটা চুপচাপ, যেন তাতে জনপ্রাণী কেহই নাই। তোমরা শুনে আশ্চর্য্য হবে যে, জাপানী মেয়েরা ছেলেদের বক্‌তে জানে না, কেননা সে দেশের রীতিনীতি মতে যদি মা ছেলেকে বকে বা মারে, তবে মার ভারী নিন্দা হয়, সমাজ তাকে ঘৃণার চক্ষে দেখে। ফলে, জাপানী ছেলেরাও কাঁদ্‌তে জানে না। ছেলের কান্না সে দেশে খুব কম শুনতে পাওয়া যায়। ঘর-সংসারের কাজগুলো মেয়েরা এমন সুন্দর ভাবে করে যায় যে, তাতে আড়ম্বর কি ব্যস্ততা নাই, হৈ চৈ কি চঞ্চলতা নাই, কোথাও টু শব্দ শুনতে পাবে না; অথচ দিনান্তে দেখতে পাবে সকল বাড়ীর সব কাজ হয়ে রয়েছে। এবং বাড়ীটী বেশ ফিটপাট করে, জনক জননীরা দিব্বি স্ফূর্ত্তির সহিত ছেলেদের সঙ্গে মিশে নানা রকমের আমোদ কচ্ছেন। এ রকম দৃশ্য দেখলে, বাস্তবিকই আনন্দ হয় না কি? আরও আনন্দের কথা, জাপানীরা স্পষ্টতঃ স্বীকার করে যে, তাদের চরিত্রগুণ তারা ভারতবর্ষ হতে লাভ করেছে। এখন আগে যা বলছিলুম, তা শেষ করে নি —যে ছেলে যে রকমের কাজ করে এসেছে, অবসর সময়ে তাকে আর সেই রকমের কোন কাজ করতে দিও না।

একটী ছেলে হয়ত সারাদিন লেখা পড়া করে এসেছে, বিকেল বেলায় যদি তুমি তাকে আবার পড়তে বল, তার সেটা ভাল লাগবে না, তার বিশ্রাম হবে না। তুমি যদি তাকে সঙ্গে করে বেড়াতে যাও, কি বাগানে কাজ কর, তবে তাতে তার বেশ আমোদ হবে, বিশ্রামও হবে। ছেলেদের অবসর সময় কি ভাবে ছেলেরা কাটাবে, তার বন্দোবস্ত তোমাকেই করতে হবে। অবসর সময়, নূতন রকমের সামান্য সামান্য আমোদজনক কাজে ছেলেদের উৎসাহিত করলে মন্দ হয় না। একঘেয়ে এক রকমের কাজ সারাদিন রাত করলে পর, মনের স্ফূর্ত্তি থাকে না, কাজে একটা আমোদ পাওয়া যায় না, তাই মাঝে মাঝে অবসর সময়, সামান্য সামান্য, নূতন নূতন আমোদজনক কাজের ব্যবস্থা করে দিত পার। কাজের পরিবর্ত্তন দরকার।

লীলা। আচ্ছা মা, অবসর সময় কি রকম আমোদজনক কাজের বন্দোবস্ত করা যেতে পারে? দু' একটা উদাহরণ দিয়ে বল না।

মা। সেটা অনেক সময় পিতা মাতার আর্থিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। কোন দিন অবসর সময়ে, পিতা মাতা আপন সন্তানকে কাছে ডেকে, তাদের সঙ্গে সদালাপ করতে পারেন, উপদেশপূর্ণ সুন্দর সুন্দর গল্প বলতে পারেন। দিদি-মা, ঠাকুমার মুখে, আমরা ছেলেবেলা কত রকমের গল্পই না শুনেছি! এখন কালের পরিবর্ত্তনে তোমরা আর সে রকম গল্প

শুনতে পাওনা। কোথাও, কোন কোন দিন, ছেলেদের ছোট ছোট গান, হারমোনিয়ম ও অন্য রকমের ছোট বাজনা শেখাতে পারেন। কোথাও বা ছেলেমেয়েদের দ্বারা ছোট ছোট অভিনয় করাতে পারেন। সময়ে সময়ে, ছোট ছোট ভাই বোন মিলে সুন্দর সুন্দর গল্পের বই পড়তে পারে, অথবা কোথাও বা মেয়েদের চিত্রবিদ্যা ও শিল্পবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। কোথাও বা ছেলেমেয়েরা একত্রে পাড়ায় বেড়াতে যেতে পারে, কখনও বা ফুল কুড়িয়ে মালা গাথ্‌তে পারে, কোন কোন দিন বালিকারা নিজেরা রান্না করে ছোট ভাই বোনদের পরিবেশন করতে পারে। সময়ে সময়ে ছেলেদের ম্যাজিক্-লেণ্টার্‌ন্ বা ছায়াবাজী দেখান যেতে পারে। কোন কোন দিন, ছেলেদের নদীতে বেড়াতে নেওয়া যেতে পারে। বড় বড় সহরে যাঁরা থাকেন, তাঁরা ছেলেমেয়েদের, পশুশালায়, যাদুঘরে, চিত্র গৃহে, বোটানিকেল্ গারডেন, ও ইডেন্-গারডেন প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর স্থানে, বড় বড় বাগানে ও বড় বড় মাঠে বেড়াতে নিয়ে যেতে পারেন। ইহাতে এক দিকে যেমন আমোদ হয়, অন্য দিকে তারা প্রকৃতি হ'তে অনেক শিখতে পারে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের দিকে তাহাদের মন খুলে যায়, ছেলেবেলায় পিতা মাতার সঙ্গে বেড়িয়ে তাদের কোমল প্রাণে যে ভাবের উদ্রেক হয়, তা' তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনে বিশেষ কাজ করে। সরোজ, বিশ্রামের সময় এই কয়েকটী বিষয়ের দিকে বরাবর মনোযোগ রাখবে :—

(১) ছেলে মেয়েরা কুসঙ্গীর সঙ্গে যেন না মিশে।

(২) ঝি চাকরের সঙ্গে একত্র হয়ে কুকথা যেন না শিখে।

(৩) কোন রকমের কুকাজ কি কু অভ্যাস করবার যেন সুবিধা না পায়।

সরোজ। আচ্ছা মা, আর কি কি বিষয়ে আমরা মনোযোগী হলে পর, ছেলেদের সুস্থ রাখা যেতে পারে ?

মা। আহার, শ্রম ও বিশ্রামের কথা আমি বলেছি। জল, বায়ু ও পোষাকপরিচ্ছদ, স্বাস্থ্যরক্ষার অন্য উপকরণ। এ সব বিষয়ে আমি ক্রমে বল্‌ছি, শোন। শরীর রক্ষার পক্ষে জল অতি আবশ্যকীয় জিনিষ। সুস্থ দেহের প্রায় ৭০ ভাগ জল; এই জলীয় অংশ শরীরে ব্যবহৃত হয়ে, নানা আকারে শরীর হ'তে বের হয়ে আসে। কাজেই শরীর রক্ষার জন্য আমাদের প্রচুর পরিমানে জল খেতে হয়। আমরা প্রকৃতি হ'তে প্রচুর জল পেয়ে থাকি। কিন্তু জলে নানা জিনিষ মিশতে পারে, তাই সহজেই জল দূষিত হবার সম্ভাবনা আছে। বৃষ্টির জল ও ঝরণার জল বেশ স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায় এবং সে জল স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। নদী, পুকুর ও পাতকুয়ার জলে নানা রকম জিনিষ মিশে থাকে, তাই সে সব জল পরিষ্কার না করে খাওয়া উচিত নয়। অপরিষ্কার জলে নানা রকমের

কীট জন্মে; এবং সেই জলে সেজন্য নানা রকমের ব্যারাম হয়ে থাকে। খাবার আগে জলটা পরিষ্কার করে নেওয়া ভাল, সিদ্ধ করে নিতে পার্‌লে আরও ভাল।

সরোজ। জল পরিষ্কার কি করে করতে হয়, মা?

মা। কেন, অতি সহজে, অল্প পয়সায়, শুধু তিনটী কলসীর সাহায্যে, বালি ও কয়লার দ্বারা, জল বেশ পরিষ্কার করে নেওয়া যেতে পারে। প্রত্যেক গৃহে অন্য কোন বন্দোবস্ত না করতে পারলেও, এই বন্দোবস্ত সকলের করা উচিত। জল পরিষ্কার করবার জন্য, এখন বাজারে নানা রকমের ফিল্‌টারও বিক্রয় হয়। কিছু পয়সা খরচ করে, একটা ফিল্‌টার কিনে রাখ্‌লে সহজে পরিষ্কার জল খেতে পারা যায়। কিন্তু জল স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য দরকার হ'লেও, অতি পরিশ্রমের পর ছেলেদের জল খেতে দিবে না। অতি বেশী জল খাওয়া ভাল নয়। খাবার সময় কোন কোন ছেলে বারে বারে জল খায়, এ অভ্যাসও ভাল নয়, তোমরা জান।

কোষ্ঠবদ্ধতা ও অজীর্ণ প্রভৃতি রোগে পরিষ্কার শীতল জল ঔষধের কাজ করে। এই সব সামান্য উপসর্গে ছেলেদের ভোরে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাইয়ে দিলে অনেক সময়ে বেশ উপকার হয়ে থাকে।

লীলা। এ সব ত জানা কথা, জলের দ্বারা স্বাস্থ্যের আর কি রকম উপকার হতে পারে, বল না, মা।

সরোজ। হাঁ, লীলা, তুই অনেক কথাই জানিস।

মা। জল যে শুধু তৃষ্ণা নিবারণ করে, তা নয়। জল আমাদের শরীর পরিষ্কার করে, আমাদের গায়ের ময়লা ধুয়ে শরীর ঠাণ্ডা রাখে। রোজ ঠাণ্ডা জলে ছেলেদের স্নান করিয়ে দেওয়া উচিত। পরিষ্কার গামছা দিয়ে বেশ রগ্‌ড়াইয়ে স্নান কর্‌লে পর, আমাদের লোমকূপ সকল পরিষ্কার হয়ে যায়, শরীর বেশ ভাল থাকে — ঘা পাঁচড়া হতে পারে না। অনেক মাতা ছেলেদের ইচ্ছা করে নিয়ম মত স্নান করান না, পাছে তাদের ঠাণ্ডা লেগে, অসুখ করে, কিন্তু তাহা ভুল। স্নানের অভ্যাস না থাকলে, অতি সহজে ছেলেদের ঠাণ্ডা লাগে, এবং সর্দ্দি কাশী হয়, বিশেষতঃ রোজ গা পরিষ্কার না করলে, গায়ে ময়লা জমে নানা রকমের চর্ম্মরোগ হয়ে থাকে। আমাদের এখানে দেখা যায়, ছেলেরা একটু বড় হলে পর, যখন তারা নিজেরা জলে নেমে স্নান করতে শেখে, পিতা মাতা তখন তাদের স্নানের দিকে বড় দৃষ্টি রাখেন না। ফলে, কোন ছেলে তাড়াতাড়ি জলে ডুব দিয়ে উঠে, কেহবা অনেকক্ষণ জলের মধ্যে ডুবে থাকে, ইহাতে স্নানের উদ্দেশ্য রক্ষা হয় না। স্নান করবার সময় গা বেশ রগড়াইয়ে, সমস্ত গা পরিষ্কার করে স্নান করছে কিনা সে বিষয়ে মার দেখতে হয়।

লীলা। স্নানের জন্য তুমি এত পীড়াপীড়ি কেন কর্‌ছ, মা? অনেক দেশের লোক মোটেই স্নান না করে দিব্বি সুস্থ

থাকে। তিব্বত দেশে নাকি জন্মাবধি এক দিনও স্নান না করে লোকেরা বেশ জাঁক করে থাকে।

মা। লীলা, তিব্বত দেশের কথা আর বলো না। সে দেশের কথা যা শুনতে পাই, তাতে গা শিহরে উঠে। সে দেশে সৌন্দর্য্যের চিহ্ন নাকি গায়ে বেশ রকমে ময়লা জন্মান; বিবাহের ক'ণের মধ্যে যার গায়ে যত ময়লা জন্মেছে, সেই তত সুন্দরী ও সৌভাগ্যবতী বলে মনে করা হয়।

স্বাস্থ্য রক্ষার হিসাবে স্নানের বিশেষ আবশ্যকতা আছে, তাই আমি সে বিষয়ে তোমাদের নিকট বিশেষ ভাবে বলছি। তোমরা জান, আমাদের চামরা সরু চালনীর মত অসংখ্য ছিদ্রময়; ঐ ছিদ্রকে লোমকূপ বলে। এই লোমকূপ দিয়ে, শরীর বাহির হ'তে জলীয় বাষ্প, ও তৈলাক্ত জিনিষ প্রভৃতি গ্রহণ করে, আবার শরীরের পরিত্যক্ত জিনিষ—খাদ্যের জলীয় অংশ ও অন্য দূষিত পদার্থ, ঘর্ম্মাকারে, ভিতর হতে বের করে দেয়। তাই ঘাম সুস্থতার একটী লক্ষণ। চামরা শরীরের তাপ রক্ষার বিশেষ সাহায্য করে।

গায়ে ময়লা জমে, যদি লোমকূপ বন্ধ হয়ে যায়, তবে ঘাম বের হতে পারে না; যদি বা বে'র হয়, তাও আবার গায়ের ময়লার সঙ্গে মিশে নানা রকমের খোস, পাঁচড়া প্রভৃতি চর্ম্মরোগ জন্মায়ে থাকে। অনেক কীটাণু শরীরের ময়লায় জন্মে এবং লোমকূপের ভিতর দিয়ে শরীরে ঢুকে বাসা করে। তাতে শরীরে ব্রণ, দাদ,

খোস প্রভৃতি হয়ে থাকে। এই কীটাণুগুলো এত ছোট যে, চোখে দেখা যায় না। এই কীটাণুর আক্রমন হতে শরীর রক্ষা করতে হলে, নিত্য স্নানের বন্দোবস্ত করা চাই। স্নান আহারের পূর্ব্বেই করা উচিত, কেননা খাবার পর স্নান করলে হজমশক্তির ব্যাঘাত হয়।
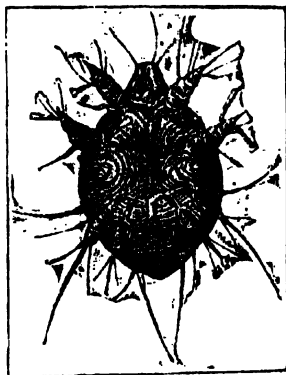
৪। খোসকীট।
(ছবিটী প্রকৃত আয়তন হতে বিশগুণ বড়।)

সরোজ। মা, বায়ু সম্বন্ধে আমরা কি রকম সাবধান থাকতে পারি? বাতাসের উপর ত আর আমাদের হাত নাই। এখন সে বিষয়ে দু' একটী কথা শুনতে ইচ্ছা করে।

মা। সরোজ, তোমরা পূর্ব্বে শুনেছ জল যেমন আমাদের শরীরের বাহিরের ময়লা ধুয়ে নেয়, তেমনি বায়ু আমাদের শরীরের ভিতরের ময়লা দূর করে। পরিষ্কার বাতাস দু' রকমে শরীর রক্ষার কাজ করে। তোমরা জান খাদ্য ছাড়া আমরা দু'চার দিন থাকতে পারি, কিন্তু বাতাস ছাড়া এক দিনও থাকতে পারি না। বাতাসে অক্সিজেন বা অম্লজান

নামে এক রকম বাষ্প আছে, তাহা মানুষের প্রাণ রক্ষা করে। এই বাষ্প আমরা বহির্জগত হতে গ্রহণ করে থাকি। তাই ছেলেদের শোবার ঘর, খেলবার ঘর, পড়বার ঘর এমন খোলা-মেলা ভাবে তৈরী করা উচিত, যেন ঘরে বাতাস ও আলো বিলক্ষণ আসা-যাওয়া করতে পারে। পচা দুর্গন্ধময় স্থানে ছেলেদের থাকতে দেওয়া উচিত নয়।

লীলা। মা, এক রকমের কথা তুমি পূর্ব্বে বলেছ। অন্য আর কোন্ রকমে বাতাস শরীর রক্ষা করে?

মা। কথাটা পরিষ্কার করে বলছি, শোন। দেহের অনুক্ষণ চালনায়, আমাদের দেহস্থ কোষ সমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। রক্ত এই কোষাদিতে অনুক্ষণ সঞ্চালনে তাদের পুষ্টিসাধন করে, তাতে প্রতি সেকেণ্ডে রক্তের প্রায় ৮০ লক্ষ জীবাণু নষ্ট হয়ে যায়। বাতাস এ নষ্ট জীবাণুর পুনর্জ্জন্মের সাহায্য করে। দেহস্থ কোষের ক্ষয়িত অংশ বায়ুর অম্লজান বাষ্পের সঙ্গে মিশে পুড়ে যায় এবং তা'তে অন্য এক রকম বিষাক্ত বাষ্প কার্ব্বনিক এসিড গেস্, হয়। সে বিষাক্তবাষ্প, দেহ হতে প্রশ্বাসে বের হয়ে আসে, তা'তে দেহকোষ সমূহ বেশ পুষ্ট হয়। বায়ু পূর্ব্বোক্ত রকমে একদিকে, ফুসফুসের মধ্যে রক্তের লাল জীবাণুর পুনর্জন্মের, অন্যদিকে, আবার নূতন আকারে জীবকোষ গঠনের সাহায্য করে। প্রত্যেক নিশ্বাসে আমরা অনেকখানি বাতাস গ্রহণ করি। মানুষ যতই বেশী পরিশ্রম করে ততই বেশী পরিমান বায়ু মানষের গ্রহণ করতে হয়। তাই দেখা যায়,

অতিরিক্ত পরিশ্রমের বেলা ছেলেরা নাকে মুখে শ্বাস গ্রহণ করে থাকে।

সরোজ। তা হলে প্রশ্বাসে যে বাতাস আমরা পরিত্যাগ করি, সে বাতাস আমাদের শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর।

লীলা। আমরা যে তবে মাথা পর্য্যন্ত লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকি, তা'ও কি অনিষ্টজনক? তা হলে মা, ছেলেদের নাক মুখ ঢেকে ঘুমাতে দেওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে উচিত নয়।

মা। কখনি উচিত নয়। তাতে যে দূষিত বাতাস তা'রা একবার প্রশ্বাসের দ্বারা বের করে, সেই বাতাসই আবার নিশ্বাসে টেনে নেয়।

লীলা। বাতাস দূষিত হয় কিসে মা?

মা। বাড়ীর চারদিকে গাছ পালা ইত্যাদি পচতে দিলে বাড়ীর বাতাস নষ্ট হয়ে যায়; আগুনেও বাতাস নষ্ট করে; শ্বাস প্রশ্বাস, ধূলা ও রোগের জীবাণুতেও বাতাস দূষিত হয়।

লীলা। আচ্ছা মা, কেহ কেহ শোবার ঘরে সারা রাত বাতি জ্বালিয়ে রাখেন; তাতেও কি অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে?

মা। আছে বই কি। আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে যে অম্লজান বাষ্পের দরকার, সে বাষ্প না হলে আগুন জ্বলে না! কাজেই যে ঘরে আগুন জ্বলে, সে ঘরের সে বাষ্পটা আগুনে পুড়িয়ে ফেলে, আর বাতাসটা দূষিত হয়ে যায়।

সরোজ। মা, বাস্তবিকই তোমার নিকট আজ অনেক সার

কথা শিখলুম। তুমি না বল্‌লে, বোধ হয়, এ সব আবশ্যকীয় কথা আর জান্‌তে পারতুম না। আচ্ছা, মা, পোষাকের জন্য আবার কি রকম সাবধানতার আবশ্যক?

লীলা। লজ্জানিবারণের জন্যই ত পোষাক।

মা। লীলা, তোমার ধারণা ভুল। শুধু লজ্জা নিবারণের জন্য পোষাক নহে। পোষাক স্বাস্থ্যরক্ষারও সাহায্য করে। শীতের দিনে পোষাক না হলে কি আমরা থাকতে পারি? পোষাক আমাদের শরীরের উত্তাপ রক্ষা করে শরীর সুস্থ রাখে। পোষাক লজ্জা নিবারণের প্রধান উপায়, ও সভ্যতার চিহ্ন, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের দেশে ছোট ছেলে মেয়েদের পোষাকের প্রতি মা বাপের যে বড় দৃষ্টি আছে, বোধ হয় না। অনেক পিতা মাতা ছেলে বেলা হতে ছেলেদের পোষাকের বন্দোবস্ত করা উচিত মনে করেন না; তাতে কিন্তু ছেলেমেয়েদের লজ্জাশীলতা নষ্ট হয়ে যায়। ছেলেবেলা হতেই ছেলেদের কাপড় চোপড় পরান উচিত। কাপড় খুব আঁট করে পরান উচিত নয়।

সরোজ। আচ্ছা বল দেখি লীলা, মা এ কথা কেন বল্লেন, কেন ছেলেদের এঁটে কাপড় পরান ভাল নয়?

লীলা। কেন দিদি, আমি যেন আর বলতে পারব না। এঁটে কাপড় পরলে পর শরীরের ভিতরের যন্ত্রগুলো ভাল করে কাজ করতে পারে না, এ ঠিক নয় কি মা? দিদি মনে করেছে আমাকে ঠকিয়ে যাবে।

মা। হাঁ লীলা, সে কারণেই ছেলেদের এঁটে কাপড় পরান উচিত নয়।

ছেলেদের কাপড়গুলো বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত।

সরোজ। সে কি মা, আমাদের দেশে যদি ছেলেদের পরিষ্কার কাপড় চোপড় পরান হয়, তবে সকলে ঠাট্টা করে, বলে ছেলেকে বাবু সাজান হচ্ছে, বিলাসিতা শেখান হচ্ছে।

মা। আমাদের দেশে ঠাট্টা করা কিছুই বিচিত্র নয়। পরিষ্কার ভাবে থাকা, আর বাবুগিরি করা এক কথা নয়। পরিষ্কার কাপড় পরলেই যে বিলাসিতা শেখান হয়, আমি মোটেই স্বীকার করি না। পরিষ্কার কাপড়টা পরলে, মনে একটা স্ফূর্ত্তি হয়, বিশেষতঃ ছেলেদের মধ্যে অপরিচ্ছন্নতার প্রতি একটা ঘৃণা জন্মে এবং ছেলেরা বরাবর পরিষ্কার থাকতে ইচ্ছা করে। তাদের এ ইচ্ছা অত্যন্ত মঙ্গলজনক। ময়লা কাপড়ের ময়লা অতি সহজে লোমকূপের মধ্যে প্রবেশ করে নানা চর্ম্মরোগ জন্মায়ে থাকে। রোগ উৎ-পাদনকারী অনেক কীটাণু বাতাসে থাকে এবং বাতাস হতে আমাদের কাপড়ে বসে; গায়ের ঘামে, কি তৈলাক্ত পদার্থে কাপড় ময়লা হলে, ময়লা কাপড়ের কীটাণু শীঘ্র বড় হয় এবং শরীরে অতি শীঘ্র চর্ম্মরোগ জন্মায়। এ কারণে ছেলেদের কাপড় চোপড় পরিষ্কার থাকা আবশ্যক। মা যদি এ বিষয়ে দৃষ্টি

রাখেন, রোজ যদি ছেলেদের কাপড়গুলো ধুয়ে দেন, তবে ছেলেদের কাপড় চোপড় পরিষ্কার রাখা বড় ব্যয়সাধ্য বলে আমি মনে করি না। সরোজ, জে'ন, পিতা মাতার রুচির দ্বারা সন্তান চালিত হয়, যে পিতা মাতা ছেলেকে সতত পরিষ্কার রাখতে চেষ্টা করেন, সে ছেলে কখনও নোঙড়ামি শিখতে পারে না, ধূলা কাদায় থাকতে ঘৃণা করে। কাজেই তার অসুখও কম হয়ে থাকে। শুধু পোষাক-পরিচ্ছদে নয়, খাবার সময়, পড়বার সময়, খেলবার সময় ছেলেদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে মা বাপের সতত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা উচিত। মা বাপের হাতেই ছেলেদের পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতার অভ্যাস জন্মে। ছেলে দেখে অনেক সময় বলতে পারা যায়, মা বাপ কি প্রকৃতির লোক, এবং তাঁদের রুচি কি রকমের। স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে আর একটা অতি আবশ্যকীয় কথা তোমাদের বলা দরকার মনে করছি।

লীলা। সে কি কথা, মা?

মা। বলছি, শোন। স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে আহার, শ্রম, বিশ্রাম, জল, বায়ু ইত্যাদি যেমন দরকার, মিতাচার ও সময়-নিষ্ঠা তেমনি দরকার। মিতাচার সম্পর্কে আমি পূর্ব্বেই তোমাদের বলেছি, আবার এখন বিশেষ করে বলা নিষ্প্রয়োজন। খাওয়া পরা ইত্যাদি সকল বিষয়ে মিতাচারী না হলে যে সহজে পীড়া জন্মে, সে কথা এখন তোমরা বেশ বুঝেছ। সময়নিষ্ঠা সম্পর্কে আমি কয়েকটী কথা বিশেষভাবে বলছি,

শোন। আমারা দেখতে পাই, ইংরেজজাতি কি রকম সময়ের মূল্য বোঝে — ঠিক সময়ে কাজ করে, ঠিক সময়ে খায়, ঠিক সময়ে অফিসে যায়, ঠিক সময়ে খেলে। তাদের সকল কাজ নিয়ম-বাঁধা। ইহা ইংরেজদের ব্যক্তি বিশেষের গুণ নহে, ইহা জাতীয় গুণ। এই গুণ থাকাতেই ইংরাজেরা বহু কাজ করতে সময় পায় এবং বহু কাজ করেও থাকে। আমরা যেমন সময়ের মূল্য বুঝি না, সময়ের অপব্যবহার করি, কোন শিক্ষিত জাতির মধ্যে এমনটা দেখা যায় না। খাবার সময় হয়েছে, একজন বন্ধুর সঙ্গে বসে হয়ত সময়টা কাটিয়ে দিলুম, অফিসে চাকরি করি, একদিন গেলুম না, অন্য দিন রাত্র বারটা পর্য্যন্ত হয়ত খেটে এলুম। এক বাড়ীতে দশটার সময় নিমন্ত্রণ হয়েছে, দশটা হতে চারটা পর্য্যন্ত নিমন্ত্রণ বাড়ীতে খাওয়ার অপেক্ষায় বসেই রইলুম। এক বাবুকে বিকেলে আসতে বল্লুম, তিনি রাত্রি আটটার সময় এসে উপস্থিত। বেলা তিনটার সময় সভা হবে, নোটীশ দেওয়া হয়েছে সভা স্থানে সন্ধ্যা ছয়টা পর্য্যন্ত বসে রইলুম, সভার কাজই আরম্ভ হল না। এরূপ ঘটনা আমাদের মধ্যে প্রতিনিয়ত দেখা যায়। সময়ের প্রতি এমন অসাধারণ উপেক্ষার ভাব আর কোন জাতির মধ্যে দেখা যায় না। অন্য দেশে আমরা কি দেখি — কোন বাড়ীতে, রাত ৮টার সময় তোমার নিমন্ত্রণ হয়েছে, তুমি আধ ঘণ্টা দেড়ী করে যাও, দেখতে পাবে, গৃহস্বামী

তোমার খাবারটা টেবিলের উপর রেখে গেছেন, খাবারটা ঠাণ্ডা হয়ে রয়েছে, তোমাকে একলা বসে খেতে হচ্ছে। কোন ভদ্র লোকের সঙ্গে ৯টার সময় দেখা করবে বলে, সময় করে এসেছ। নয়টার পাঁচ মিনিট পরে যাও, দেখতে পাবে, ভদ্রলোকটী তোমার জন্য নয়টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে, অন্য কাজে চলে গেছেন। তা'রা এক মুহূর্ত্তকাল সময় অপব্যয় করে না। সময় খাটিয়ে তারা জ্ঞান ও অর্থ উপার্জ্জন করে। যাতে সময় শুধু নষ্ট না হয়, সে জন্য তা'দের কত ব্যস্ততা। সে দেশে, সেজন্যই কত রকমের কল কারখানার আবিষ্কার হচ্ছে। তারা কাজ করবার জন্য সময় খুঁজে পায় না, নষ্ট করবার সময় তাদের কোথায়? বস্তুতঃ সময়ের দিকে আমরা মোটেই দৃষ্টি রাখি না; সময়ের কাজ সময়ে করা, আমাদের দেশের রীতিই নয়। আমার মনে হয়, আমাদের জাতীয় উন্নতির ইহা বিশেষ অন্তরায়। আমাদের এই দৃষ্টান্ত আমাদের ছেলেমেয়েরা অতি সহজে অনুকরণ করে, নিজেদের সর্ব্বনাশ করতে আরম্ভ করছে। আমাদের দেশের বহু কৃতী পুরুষ, সময়নিষ্ঠা গুণের অভাবে, অনেক কাজ অসম্পূর্ণ রেখে গেছেন। সময়ের কাজ, সময়ে করলে, এক দিকে যেমন স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, অন্যদিকে কাজেরও বিলক্ষণ সুবিধা হয়ে উঠে। যদি আমরা আমাদের ছেলেদের মানুষ করতে ইচ্ছা করি, তবে ছেলেবেলা হতে সময়ের মূল্য তাহাদের বুঝিয়ে দেওয়া উচিত। যাতে তারা সময়ের কাজ সময়ে করে, এবং সে রকম একটী অভ্যাস, যাতে তাহাদের মধ্যে জন্মিতে

পারে, তদ্বিষয়ে প্রত্যেক পিতা মাতা ও শিক্ষকের সাধ্যমত চেষ্টা করা উচিত। স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ে আমি তোমাদের আর অধিক বল্‌ব না; অনেক কথাই বলেছি। আমি আশা করি, তোমরা আমার সব কথাগুলো বেশ ভাল করে চিন্তা করে দেখবে, এবং ছেলেমেয়েগুলোকে বেশ মোটাসোটা সুন্দর সবল করে তুলবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। বস্তুতঃ দেশটাকে যদি অন্য দেশের সমকক্ষ করে তুলতে চাও, দেশের ছেলেগুলোকে, উন্নত দেশের লোকদের সঙ্গে এক ক্ষেত্রে দাঁড় করাতে চাও, তবে সর্ব্বপ্রযত্নে, সর্ব্বপ্রথমে ছেলেমেয়েগুলোর শরীরটা সুপুষ্ট, সুঠাম ও সবল করে তুল্‌তে হবে। রোগাপট্‌কা, খর্ব্ব দেহটা, নিয়ে মানুষ কোন ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করতে পারে না। এই প্রবল প্রতিযোগিতার দিনে, এ জাতি নিয়ে দেশটা দাঁড়াতে পারে না। জাতিটা ক্রমে দুর্ব্বল হয়ে, শেষটা ধ্বংস হয়ে যায়। দুর্ব্বল লোক, কি দুর্ব্বল জাতির স্থান কোথাও নাই। পৃথিবীর ইতিহাস তার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

লীলা। মা, তুমি কি চাও যে, আমরা অন্য দেশের লোকদের শুধু অনুকরণ করি?

মা। না, লীলা, তোমরা শুধু অনুকরণ কর, আমার ইচ্ছা নয়। আমি চাই, উন্নত আদর্শ দেখে, তোমরা বেশ ভেবে চিন্তে, উন্নত ভাব গ্রহণ কর এবং নিজে উন্নত হও ও সঙ্গে সঙ্গে দেশটাকে উন্নত করে তোল। কিন্তু আমরা এখন অন্য জাতির অনুকরণ কি করছি না, লীলা?

আমাদের ছেলেরা কি বিদেশীর অনুকরণ করে, চাল্‌চলনে পুরামাত্রায় বিদেশী হয়ে উঠ্‌ছে না? কোন মানুষ কি জাতি পরিপূর্ণ নহে, মানুষ মানুষ হতে, জাতি জাতি হতে কিছু না কিছু গ্রহণ করবেই। জাপান কি ইয়োরপ হতে কিছু গ্রহণ করে নাই? ইংরেজ অন্য জাতি হতে অনেক কিছু নিয়েছে। ভাল যা, অন্য জাতি কি অন্য মানুষ হতে কেন গ্রহণ করবে না? তা যদি না কর, তবে তোমার উন্নতিতে বাধা পড়বে। সভ্যতার স্রোত বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু দুঃখের সহিত বলতে হয় যে, আমাদের ছেলেদের অনুকরণে একটু বিশেষত্ব আছে। অন্য দেশের লোকেরা, জাতীয়তা সম্যক বজায় রেখে উন্নত দেশের উন্নত ভাব গ্রহণ করে উন্নত হয়। আমরা অনেকটা যাদুঘরের সাজান পশু পক্ষীর মত, জাতীয়তাকে ধ্বংস করে, অনুকরণের খোলোস পরে থাকি। সে অনুকরণে প্রাণ নাই, অথচ আড়ম্বরটা খুব আছে। ইহা বাস্তব গ্রহণ নয়, শুধু বর্জ্জন, আত্মবিসর্জ্জন মাত্র। তাই আমি চাই, আমাদের জাতীয়তার ক্ষেত্রে, তোমরা উন্নত জাতির উন্নত ভাবের বীজ ফেলে যাও, যেন উন্নত ভাব দেশের মাটিতে শিকড় ফেলে দেশটাকে আঁকড়িয়ে ধরতে পারে। অনুকরণ করতে গিয়ে, তোমরা ঘরের ছেলে পর হয়ে যাবে, দেশের মাকে মুখ্ ফিরাবে, এমনটা আমি চাই না।

সরোজ। হাঁ, মা, তোমার সব কথাই নূতন। এবং সব কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এসব কথা

জানলে, পিতা মাতা ও শিক্ষকেরা সাবধান হবেন। এবং অনেকের জ্ঞান হবে।

লীলা। এত গেল স্বাস্থ্য রক্ষার কথা, আচ্ছা কোন দিন কোন কারণে যদি অসুখ করে, তখন পিতা মাতার কি কর্ত্তব্য, মা?

মা। যে সব বলেছি, আগে এ সব বিষয়ে চিন্তা কর, সবটা বোঝ কিনা দেখ। অসুখের বিষয়, না হয় অন্য সময়ে বলা যাবে। যদি স্বাস্থ্য রাখতে জান, তবে অসুখ হবেই বা কেন? স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সদচিন্তা ও সতত মনের প্রফুল্লতা ও বিশেষ দরকার।

সরোজ। দেখ্ লীলা, আজ অনেক কথা শুনেছি, চল এসব বিষয়ে চিন্তা করে দেখি। এক সময় অনেকগুলো কথা শুনলে পর, কিছুই মনে থাকবে না। যে কয়টা উপদেশ পেয়েছি, সে সব কাজে লাগাতে পারি কিনা, চল্ সে চেষ্টা করি।

লীলা। আমি সব কথা বুঝেছি। আমি আর উপদেশ মত কি কাজ করতে পারি? তোমার নয় দিদি ছেলে আছে, তুমি মার কথা মত ছেলেকে চালাবে ও তাকে সুস্থ রাখতে চেষ্টা করবে।

সরোজ। কেন, তুই আমার সাহায্য করবি। আমি যদি কোন দিন কোন কথা ভুলে যাই, আমাকে মায়ের উপদেশ মনে করিয়ে দিবি। তুই আর কিছু না করতে পারলেও মার উপদেশ মত নিজকে চালাতে পারিস, মার কথা মত আমরা নিজেরা চল্‌লে আমাদের ও বিলক্ষণ উপকার হবে।

লীলা। আচ্ছা, তা দেখবো।

তৃতীয় প্রস্তাব

নীতি-শিক্ষা বিষয়ক কথা

সরোজ। আজ মা, ছেলেদের নীতি-শিক্ষা বিষয়ে আমাদের কিছু বল। ছেলে মেয়েদের কি রকমে সুস্থ রাখতে পারা যায়, তা বেশ শিখলুম। কি করে তাদের মানুষ করতে হয় সে বিষয় জানতে বড় ইচ্ছা করে। বস্তুতঃ ছেলেদের মানুষ না করতে পারলে সব বৃথা। দুশ্চরিত্র, অপদার্থ ছেলে সুস্থ থাকলেই বা কি, না থাকলেই বা কি?

মা। হাঁ সরোজ, আজ ছেলেদের নীতি-শিক্ষা বিষয়ে কিছু বলব মনে করেই এসেছি। কিন্তু সরোজ, নীতির সঙ্গে স্বাস্থ্যের কোন সম্পর্ক নাই মনে করো না। দুশ্চরিত্র অপদার্থ ছেলের পক্ষে স্বাস্থ্য রক্ষা করা বড় সহজ নহে। সুস্থ সবল ছেলেটার প্রকৃতি যেমনটা হয়ে থাকে, রোগা খিটখিটে ছেলেটার প্রকৃতি তেমনটা হয় না। পূর্ব্বে তোমাদের বলেছি কি উপায়ে ইচ্ছা করলেই, মা বাপ ও অন্য অভিভাবকেরা ছেলে মেয়েদের বেশ সুস্থ রাখতে পারেন, আজ তোমাদের দেখাতে চেষ্টা করব যে কি ভাবে ইচ্ছা করলেই তাঁরা আপন আপন ছেলেমেয়েকে মনের মত করে গড়ে তুলতে পারেন — তাদের মানুষ করতে পারেন। ছেলে মেয়েদের শারীরিক উন্নতি যেমন পিতা মাতা ও শিক্ষকের উপর নির্ভর করে, তাদের নৈতিক

উন্নতিও তাঁহাদের হাতে সম্পূর্ণ নির্ভর করে। তোমরা কিছু জাননা, কিছু কর না, ছেলেরা মানুষ হবে কিসে? মালি যদি চতুর না হয়, বাগান কি কখনও সুন্দর হয়? কোন কোন গুণ থাক্‌লে, ছেলে মানুষ হয়েছে বলতে পারি, সরোজ, বল দেখি।

সরোজ। কেন মা, ছেলে যদি বেশ ভাল শিক্ষা পায় তবেইত সে মানুষ হয়েছে বলতে পারি।

মা। কি উপায়ে তবে তাদের ভাল শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে, বল দেখি। ছোট ছেলে মেয়েরা কি উপায়ে শেখে? আমরা ত বই পড়ে, পরের উপদেশ শুনে শিখি। দুই তিন বৎসরের ছেলেরা বইও পড়ে না, উপদেশও বুঝে না, অথচ তারা একটু একটু করে অনেক কিছু শেখে। বল দেখি কে তাদের শেখায়।

সরোজ। আমি ওসব বুঝি না। তুমি বল না মা, কে তাদের শেখায়।

মা। এ বিষয়ে, তুমি কি কখনও চিন্তা করে দেখেছ, লীলা?

লীলা। আমার মনে হয় মা, তারা যেন অনেকটা দেখে দেখে শেখে। তা ঠিক কি না, জানি না।

মা। হাঁ, লীলা, ছেলেরা দেখেই অনেক কিছু শেখে। তাদের উপদেশ শুনতে হয় না, বইও পড়তে হয় না। বিশেষ ভাবে তাদের কিছু শেখাতে হয় না। ছেলেদের কাজ কর্ম্মের প্রতি যদি তুমি কোন দিন মনোযোগ পূর্ব্বক দেখে থাক,

একটি প্রবৃত্তি তাদের মধ্যে অতি প্রবল দেখতে পাবে — ছেলেরা বড়ই অনুকরণপ্রিয়। এই অনুকরণ-প্রবৃত্তি তাদের শিক্ষার প্রথম ও প্রধান সোপান। তারা যা দেখে, তা নিজেরা গ্রহণ করে, ভালও বুঝে না, মন্দও বুঝে না, বই তারা চায় না, উপদেশ তাদের সাহায্য করে না। মা বাপের মুখশ্রী, তাদের বইর কাজ করে, মা বাপের দৈনিক জীবন তাদের উপদেশের কাজ করে থাকে। মা বাপের মুখের ভাব দেখে, তারা কাজ কর্ম্মের দোষ গুণ বিচার করে। মা বাপ কি ভাই ভগ্নীর অনুকরণ ক'রে তারা নিজেরা চলতে থাকে। বাড়ীতে যদি দু'চারটী ছেলে থাকে, বড় ছেলেটী যা করবে, যে দিকে যাবে, ছোটগুলো তাকে দেখে, ঠিক তার অনুকরণ করে চল্‌বে। তাই বড় ছেলেটির দিকে একটু বেশী রকম দৃষ্টি রাখা দরকার। এ অবস্থায়, মা বাপ ও শিক্ষকেরা চেষ্টা করলেই ছেলেদের ভাল করতে পারেন, সহজে বুঝতে পার।

লীলা। আচ্ছা মা, কি করে ভাল করতে পারা যায়? চেষ্টার ত্রুটি যে হয়, মনে হয় না, অথচ প্রায় প্রতি বাড়ীতে পিতা মাতারা আক্ষেপ করেন যে, তাঁরা ছেলেমেয়েদের মানুষ করে তুলতে পারলেন না।

মা। আমার আর একটা প্রশ্নের উত্তর কর দেখি, লীলা, তার পর আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। বল দেখি, ছেলে কি রকম হলে পর, আমরা তাকে ভাল ছেলে বলি।

লীলা। কেন মা, ছেলে যদি কথা শুনে, সকলের বাধ্য হয়ে চলে ও নম্র প্রকৃতির হয়, তাকে সকলে ভাল ছেলে বলে থাকে আর —

মা। এখন আর চাই না। তবে এক একটী করে বলি। সত্যি, লীলা, বাধ্যতাই মনুষ্য জীবনের একটী প্রধান গুণ। পরিবারের মধ্যে বাধ্যতা না থাক্‌লে, পরিবারে ভয়ানক উচ্ছৃঙ্খলতা আসে। উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচারিতা মনুষ্য জীবনের উন্নতির বিশেষ অন্তরায়। তাই ছেলেদের মানুষ করতে হলে, প্রথমেই তাদের বাধ্য করে নিতে হয়। বাধ্যতা, বিনয় ও নম্রতা এক শ্রেণীর গুণ, একটা থাকলেই আর একটা আসে। যে ছেলে সকলের বাধ্য, সে স্বভাবতঃ বিনয়ী ও শান্ত প্রকৃতির হয়ে থাকে। তাই আগে বাধ্যতা বিষয়ে তোমাদের কিছু বলছি, শোন। ছেলেদের যদি বাধ্যতা শেখাতে চাও, তবে তাদের সাম্‌নে পরিবারের কা'কেও অবাধ্য হয়ে চলতে দিও না।

লীলা। মা, শুধু তা'তেই কি হয়?

সরোজ। মা, অনেক সময় শত চেষ্টাতেও আমরা ছেলেদের সঙ্গে কিছুতেই পেরে উঠি না। আদর করেই বলি, অথবা চোক রাঙ্গায়েই বারণ করি, তারা একটা না একটা অনর্থ করে বসে। তিন চার বছরের ছেলেগুলো আমাদের একেবারে অস্থির করে তোলে। আমরা কি মা, শুধু ছেলেদের বকি বা মারি? নিজের ছেলেমেয়েকে বক্‌তে কি মার্‌তে সহজে কা'রও ইচ্ছা করে কি?

লীলা। সত্যি, মা, ঐ বয়স হতে ছেলেগুলো ভারি দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির হয়ে উঠে। স্বাধীনতার দিকে একটা ঝোঁক তাদের মধ্যে বেশ দেখতে পাওয়া যায়। তুমি তাকে চেপে রাখতে চাও, সে জোরে ঘার উচু করতে চা'বে, তাকে যদি বল যে, আগুন হাত দিও না, সে ঠিক প্রদীপে হাতটা দিয়ে হাত পোড়াবে। যদি বই নিয়ে পড়তে বল, সে বই বন্ধ করে পালাতে চেষ্টা করবে। এ অবস্থায়, মা, শিক্ষক অথবা শিক্ষয়িত্রীরা একেবারে নাকাল হয়ে উঠেন। কা'রও ধৈর্য্য থাকে না, ছেলেরা যতই দুষ্ট হয়ে উঠে, তাঁদের মেজাজ ক্রমেই গরম হয়ে যায়। তখন কে কা'কে শেখায়? কেই বা শেখে?

মা। লীলা, তুমি আমাদের পরিবারের ঠিক ক্ষত স্থানটায় হাত দিয়েছ। অতি সত্য কথা, পরিবারে এ রকম ঘটনা অহরহ ঘটছে। প্রাকৃতিক নিয়মে ভবিষ্যতেও ঘট্‌বে, মনে হয়।

লীলা। মা, তোমার সঙ্গে আর পারা গেল না। তুমি যে কি বলছ, ঠিক ধরা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। তুমি বলছ, বাধ্যতা শেখাতে হবে, আবার বলছ যে, প্রাকৃতিক নিয়মে তারা অবাধ্য হতে চাবেই? এ কি রকম হেঁয়ালি। যদি প্রাকৃতিক নিয়মে এরকম ঘটনা পরিবারে ঘটবেই, তবে আর শিক্ষার এত আয়োজন কেন? আমরা শিক্ষা দিতে জানিনা বলে, আমাদের মিছামিছি বকছ কেন?

মা। লীলা, তোমার প্রশ্ন শুনে আমার বাস্তবিক বড় আনন্দ হয়, তুমি বিষয়ের গোড়াতে যেয়ে এমন সুন্দর

ভাবে প্রশ্ন তোল যে, তাতে অনেক সময় আলোচনাটা বেশ সরস ও যথার্থ শিক্ষাপ্রদ হবার সুযোগ হয়ে উঠে। আমি হেঁয়ালি ধরণের কিছু বলি নাই। চল, বিষয়টার গোড়াতে যাই, এবং এ দু'টা বিরুদ্ধ ভাবের সামঞ্জস্য করতে পারি কিনা আমরা তার চেষ্টা করে দেখি। একটী কথা সর্ব্বদা মনে রেখ, শিশু প্রকৃতির দিকে চোখ বুঝে চল্‌লে শিশু শিক্ষা আদবেই এগোবে না, যতই তুমি ব্যস্ত হও, যতই খাট না কেন, তোমার সমস্ত যত্ন চেষ্টা উপেক্ষা করে ছেলেরা পিছুতে থাকবে, তোমার আশা ভরসা সব নষ্ট হয়ে যাবে। কেমন না, লীলা?

লীলা। কিছুই বুঝ্‌তে পারলুম না, তুমি বলে যাও, মা।

মা। বলছি, শোন। ছেলেদের মানষের শ্রেণী হতে বাদ দিয়ে, তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা কি চেষ্টা করলে চলবে না। শিক্ষার চাপে তাদের মনুষ্যত্বটা যেন পিষে না যায় সে দিকে খেয়াল রেখ। বুঝলে, লীলা?

লীলা। মা যতই বলছ, ততই গোল লেগে যাচ্ছে যে। একদিকে শিক্ষা দিতে বল, অন্য দিকে বলছ, শিক্ষার চাপে ছেলেদের পিষে ফেলো না, অতই যদি আদর হবে, তবে শিক্ষাটা ছেড়ে দিলেই পার।

সরোজ। কেন লীলা, শুধু শুধু সময় নষ্ট করছিস্? মা, তোমার কথা, একটু দয়া করে, তুমি বুঝিয়ে বল। তোমার মনের ভাব বুঝে নেব, অত বিদ্যা আমাদের কা'রো নাই।

মা। তোমরা কি একটুও চিন্তা কর না? কি বল্‌ছ, লীলা?

লীলা। মা, তুমি যে জটিল মনোবিজ্ঞানের কথা তুলছ। এ কয়েক দিন শরীর-বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের কথা বলে, এখন তুমি যে মনোরাজ্যে ঢুকে পরছ। এ সব বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আমাদের চিন্তা রাজ্যের বাহিরে, শুধু চিন্তা করলে কি হয়, মা? বিজ্ঞান বিষয়ে একটু আধটু বিশেষ জ্ঞান থাকা চাই।

সরোজ। ও সব আমাদের বলে দরকার কি, মা?

মা। দেখ, লীলা, মনোবিজ্ঞান, দেহ-বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান কথাগুলো বেশ জাঁকাল শুনায় বটে, এবং বিষয়গুলো নিতান্ত জটিল বলে কাণে ঠেক্‌তে চায়। কিন্তু এত সব যে বিজ্ঞান বলছ, তোমাদের চিন্তার নিকট কিছুই নয়। অজ্ঞান বলে বিজ্ঞানের নামে একদম শিহরে উঠ্‌ছ। মন আগে, না মনোবিজ্ঞান আগে? শরীর আগে, না শরীর-বিজ্ঞান আগে? বিজ্ঞানের অজ্ঞাত জটিল তত্ত্বগুলো যেন তোমাদের চিন্তারাজ্যের বাহিরে, কিন্তু প্রত্যক্ষ জীবন্ত দেহটা, জাগ্রত মনটা, চিন্তারাজ্যের বাহিরে, বল্‌তে পার কি?

লীলা। কি রকম, মা?

মা। বলছি শুন, আগে শরীরটা, মনটাই ত পেয়েছ, তা'দের কাজ কর্ম্ম দেখে দেখে, তাদের কাজের একটা ধারা তোমরা ঠিক করে বইতে লিখে ফেলেছ, বিজ্ঞানের জন্ম এভাবে তোমাদের হাতেই ত। জটিল কোনটা—বিজ্ঞানটা,

না মনটা বা দেহটা ? দেহটা, কি মনটা যে নিতান্ত সাধারণ জিনিষ, তা দেখে ত কখনি তোমাদের চোক কি চিন্তা লাফিয়ে উঠে না, কেমন না ? তোমাদের হাতের গড়া জিনিষ, এ বিজ্ঞান, এ বড় জটিল, নাম শুনতে তোমরা অজ্ঞান হয়ে পড়। কিন্তু ভেবে দেখ্‌তে গেলে এর ভিতর কিছুই জটিলতা নাই, ধরতে চাও ত সহজে ধরা দেবে। ভয় কর বলে, বিজ্ঞান বিকট দেহ ধরে, তোমাদের কাছে জুজুবুড়ী হয়ে দাঁড়ায়। বিজ্ঞান জিনিষটা নামে যতই জাঁকালো হ'ক না কেন, নামে গা শিহরে উঠ্‌লেই বা কি, আসলে কিন্তু কিছুই নয়। বিজ্ঞানটা অনেকটা ছায়ার মত, দূর থেকে ইহাকে লক্ষ্য করে হাত তোল, বিজ্ঞান বিকট দেহ ধারী হয়ে, তোমাকে হাত দেখাবে, কিল তোল ইহাও তোমাকে কিল দেখাবে কিন্তু সাহস করে, ইহার সামনে যাও, দেখবে, বাস্তব কিছু না, সব ফাঁকি, বিজ্ঞান কোথায় মিলিয়ে গেছে, তার হাড়, বা মাংস কিছুই নাই, শুধু একটী নামের বোঝা মাত্র।

সরোজ। মা, 'ওর সঙ্গে বাজে কথা বলে কি লাভ হবে। তোমার কথা, লীলা কিছুই বুঝতে পারছে না, ও সব কথা এখন ফেলে রাখ।

লীলা। না, মা, আমি অত বোকা নই। দিদি আমাকে নেহাত খুকীর মত মনে করছে, দেখতে পাচ্ছি। মা, বিজ্ঞান জিনিষটাকে তুমি একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছ। বিষয়টা কি এত সহজ যে, সকলের হাতে ধরা দেয় ? এ যেন অনেকটা বেশী বলে

ফেলছ, মনে হয়। তুমি ত এই কয়েক দিন, নিজেই কত বিজ্ঞানের কথা বললে, এখন বিজ্ঞানটা কিছুই নয় বল্লে চলবে কেন।

মা। আমি বিজ্ঞানের কি কথা বল্লুম? তুমিই না আমার কথার মধ্যে বিজ্ঞানকে এনে ফেল্লে? আর বিজ্ঞানের নাম শুনে সরোজ বলে উঠল, 'ওসব কথা আমাদের বলে দরকার কি?' আমার কথার মধ্যে বিজ্ঞান কোথায়? ভাতের গ্রাসটা মুখে দিলুম, সেটা গলা দিয়ে পেটে গেল, গায়ে একটা পিনের খোঁচা দিলুম, টব করে মাথার মধ্যে একটা জ্ঞান বা অনুভূতি হ'ল, এ-ত বাস্তব ঘটনা। এখানে বিজ্ঞান কোথায়? এসব কথা বুঝতে তোমাদের একটুও বেগ পেতে হয় নি। যেমন সরল সোজা জিনিষ, তেমন সরল, সোজা ভাবে তোমরা সমস্ত বিষয় বুঝে নিয়েছ। এ পর্য্যন্ত কোথাওত বিজ্ঞানের বিষয় বলে খটকা লাগে নি। আমি বল্লুম খাটি জিনিষের কথা, প্রত্যক্ষ ঘটনার কথা। যদি এর মধ্যে বিজ্ঞান আসে, আসুক। চল, আমরা জীবন্ত দেহটা, সজাগ মনটা নিয়ে আলোচনা করি, তাতে যদি বিজ্ঞান পাছে পাছে আসে ভাল, না আসে আরও ভাল। আমি বিজ্ঞানটাকে উড়িয়ে দিচ্ছি না, লীলা। বিজ্ঞানটা একেবারে অবজ্ঞার জিনিষ নয়, সত্য। কিন্তু বিজ্ঞানের তত্ত্ব বুঝতে যে, তোমাদের অসাধারণ বুদ্ধি বা চিন্তার দরকার, এ কথা আমি স্বীকার করি না। তোমরা তোমাদের সাধারণ বুদ্ধি নিয়ে বিজ্ঞানটাকে সহজে ধরতে পার, তা'তে ভয় পাবার মত কিছু নাই। এটা বলাই আমার উদ্দেশ্য।

আমি যা বলতে আরম্ভ করেছিলুম তা' বল্‌ছি শোন। বাধ্যতা ইচ্ছাশক্তি মূলক একটী মনোবৃত্তি বা গুণ বিশেষ। স্বাভাবিক নিয়মে ছেলেদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেমন একটু একটু করে বড় হয়, তেমনি তাদের ইচ্ছা-শক্তিরও একটু একটু করে বিকাশ হয় এবং এই বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে কর্ম্ম-শক্তিও জন্মে — তারা আপন ইচ্ছামত হাত পা নাড়তে চেষ্টা করে। তারা তখন সাধারণতঃ নিজ শক্তি বলে যা' তা' করতে চায়। আড়াই বছর পর্য্যন্ত আমরা যেমনটা চাই, ছেলেমেয়েরা কলের পুতুলের মত প্রায় তেমনটা হয়ে উঠে। এ বয়সে তুমি যা' বল, তা'রা তাই করবে। ছেলেদের বাড়তির হিসাবে, এ বৃত্তির বিকাশেরও বেশ কম হয়,—কোন কোন ছেলের মধ্যে একটু শীঘ্র দেখা যায়, আবার কোন ছেলের মধ্যে একটু বেশী বয়সে দেখা যায়। আমরা এ সম্পর্কে বালক-জীবনটি মোটামুটি চারটী যুগে বিভাগ করে নিতে পারি। প্রথম যুগ — জন্ম হতে আড়াই বছর তক, শক্তির উন্মেষের যুগ — ইচ্ছানিরপেক্ষ অজ্ঞাত মনোব্যাপারের যুগ। দ্বিতীয় যুগ — আড়াই বছর হতে চার বছর পর্য্যন্ত, শক্তির বিকাশের যুগ — বাহ্যশক্তির আকর্ষণে অন্ধজ্ঞান সম্ভূত ইন্দ্রিয়াদির অহেতুক ব্যবহারের যুগ। তৃতীয় যুগ—পাঁচ হতে দশ বছর পর্য্যন্ত, শক্তির প্রভাবের যুগ—সজ্ঞান ইন্দ্রিয় চালনার যুগ। চতুর্থ যুগ — এগার বছর হতে ষোল বছর পর্য্যন্ত, ইচ্ছা-শক্তি মূলক সহেতুক কর্ম্মযুগ।

ছেলেরা যতকাল মার কাছে থাকে, তাদের যতকাল মার

উপর নির্ভর করে থাকতে হয়, তারা ততকাল সম্পূর্ণ বাধ্য হয়ে থাকে, মাকে তারা কষ্ট দিতে চায় না, মার সুখে তারা নাচে, মার দুঃখে কাঁদে। তোমরা কি দেখ নাই যে, দু'তিন বছরের একটী শিশুর সাম্‌নে তার মাকে মারলে, মার লাগুক আর না লাগুক, শিশু কেঁদে আকুল হয়। মাকে অনেকক্ষণ না দেখলে, শিশু অস্থির হয়ে উঠে। দেড় দুই বছর পর্য্যন্ত ছেলেরা ষোল আনা মার হাতের পুতুল, এ বয়সে তাদের নড়াচড়া তাদের উদ্দেশ্য মূলক নহে।

আড়াই বছর হতে চার বছর পর্য্যন্ত ছেলেরা মার বেশ গতঅনু থাকে, সতত মার কাছে কাছে থাকে। এ সময়টা হচ্ছে শক্তি বিকাশের যুগ, অর্দ্ধজ্ঞান সম্ভূত বাহ্যশক্তির আকর্ষণে ইন্দ্রিয়াদির চালনার যুগ। এ বয়সে তাদের ইচ্ছা-শক্তি একটু একটু ফুটতে থাকে। বাড়ীর দশ পাঁচজনকে কাজ কর্ম্ম করতে দেখে, তারাও কাজ কর্ম্ম করতে চায়। ভাল হ'ক, আর মন্দ হ'ক, একটা না একটা কিছু করে। এ বয়সে তাদের ইচ্ছা-শক্তির এমন জোর হয় না, যাতে তারা মার ইচ্ছাশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে। এ সময় মা বাপ যদি কোন কাজ করতে বারণ করেন, তারা দৃঢ়তার সহিত বলতে পারেন না 'আমি করব' অথবা সাহসের সহিত সে কাজটা করতে পারে না। এ বয়সে ছেলেদের মুখে কথা ফুটে। তখন তারা মাকে ছোট ছোট প্রশ্ন করে। দৃষ্টান্তস্থলে, তুমি যদি তোমার বড় ছেলের সচিত্র ইতিহাসের বইখানা, তোমার ছোট

ছেলেকে ধরতে নিষেধ কর, সে তখনি যে তোমার কথাটা না শুনে, বইখানা নিয়ে পালাবে, তা নয়। বইর ছবি দেখে, দাদাকে বইখানা সর্ব্বদা নাড়াচাড়া করতে দেখে, তার ভারি আগ্রহ হচ্ছে যে, সে দাদার মত বইখানা উল্‌টে পাল্‌টে ইচ্ছামত দেখে নেয়। কিন্তু সে ইচ্ছার এত জোর নাই যে, তোমার ইচ্ছা অতিক্রম করে যাবে, তাই বিনীতভাবে তার ছোট কথায় প্রশ্ন করে 'কেন মা, বইখান দেখি না, দাদা যে দেখছে' 'বইখান নিলে কি হবে? দেখি না মা' ইত্যাদি। মা যদি তেমনি আদর করে, ছেলেটীর ছোট প্রশ্নের সরল সহজ উত্তর করেন, অথবা তার হাতে অন্য সুন্দর একটা কিছু দেন, সে চুপ করে যায়। মা যদি ছেলেকে বলেন 'না বাবা, দাদার পড়ার বইতে হাত দিতে নাই' 'কাজের বই নিয়ে খেলতে হয় না।' ইত্যাদি। ছেলেরা অনেক সময় মেনে যায়। মার মিষ্ট কথা অগ্রাহ্য করে, পুনঃ পুনঃ এক রকমের কাজ অনেক ছেলেরা প্রথমাবস্থায় প্রায় করে না। তবে কোন কোন সময়, নিষেধ স্বত্বেও কোন ছেলে সে কাজ করে থাকে, আবার কোন কোন ছেলে উল্‌টা প্রশ্ন করে "কেন করব না? হাঁ, আমি করব' ইত্যাদি। তখন তাদের সঙ্গে যুক্তিতর্ক করবার আবশ্যক নাই। মিষ্টভাবে তাদেরই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে, সেখান হতে তাদের সরাইয়ে নেওয়া উচিত অথবা তাদের মন আকর্ষণ করে মত নূতন অন্য রকম কাজে তাদের লাগিয়ে দেওয়া আবশ্যক।

এ শক্তি-বিকাশের মধ্যে একটা ক্রম আছে। ছেলেরা প্রথম যুগে সম্পূর্ণ অজ্ঞানে কাজ করে। এ যুগে, অনেকটা অর্দ্ধজ্ঞানে কাজ করে থাকে। প্রথম প্রথম অবাধ্য হওয়ার ভাব থেকে ছেলেরা কিছু করে না। প্রকৃতির খেয়ালে, তারা তাদের মতই কাজ করে যায়, তোমার যে তা পছন্দ হচ্চে না, এতটা চিন্তা করে কাজ করার শক্তি তখন তাদের মধ্যে হয়ে উঠেনি। এ সব কাজের মধ্যে তারা যে সামান্য সামান্য দু'একটা অন্যায় কাজ বা অনর্থ করে না তা নয়। কিন্তু এসব নিয়ে খুটিনাটি করলে চলে না। কেননা অজ্ঞানে যা করে তা দোষ নয়। জ্ঞানে যা করে তাই দোষ। অনেক সময় এ ধরনের কাজ 'ছেলেমান্‌ষি' বলে অগ্রাহ্য করা হয়। কিন্তু এখানেও সতর্কতার বিশেষ দরকার। যদিও এ বয়সে ছেলেদের কাজ সম্পূর্ণ জ্ঞান কৃত নয়, কিন্তু ক্রমেই তাদের কর্ম্মশক্তি জ্ঞান মূলক হয়ে উঠ্‌ছে। বাধ্যতা মানে ছেলেদের ইচ্ছা ও কর্ম্মশক্তি তোমাদের ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা অর্থাৎ ছেলেরা আপন ইচ্ছামত কিছু না করে, তোমাদের ইচ্ছামত কাজ করবে, এইত। আমাদের দেহটা, অনেকটা বয়লার বা বাষ্পজনক লৌহকুণ্ডের মত সর্ব্বদা শক্তি উৎপন্ন করছে। এ শক্তি যদি সদপথে চালিত হয়, তবে বাষ্প-শক্তির মত, পৃথিবীর বড় বড় কাজ ইহার দ্বারা করা যেতে পারে। নানাদিকে যদি ছড়াতে অথবা শুধু জমতে দেওয়া হয়, তবে এ শক্তি অশেষ অনিষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শক্তি প্রবাহের পথ সর্ব্বদা খোলা থাকা চাই।

বাষ্প-চালিত জাহাজ বা রেলওয়ের চালক চতুরও দক্ষ না হলে, যেমন নানা বিপদ হয়ে থাকে, এশক্তির চালক ও সতত সতর্ক ও বিচক্ষণ বুদ্ধি সম্পন্ন না হলে, বিপদ অবশ্যম্ভাবী। ইচ্ছাশক্তির যখন বিকাশ হয়, কর্ম্মশক্তি যখন জেগে উঠে, ছেলেরা কাজ না করে পারে না। তাদের হৃদয়ে শক্তির উৎস জেগেছে, বন্যার স্রোতের মত উহা স্বাভাবিক নিয়মে এক দিকে বয়ে যাবেই। তবে এ স্রোতটাকে যে সে দিকে যে'তে না দিয়ে, আপন ইচ্ছামত, তোমরা অন্য দিকে ফিরিয়ে দিতে পার। ছেলেরা বাজে কাজ করছে, তাতে ঘরে অনর্থ হচ্ছে শক্তি শুধু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, কাজটা তখন একেবারে বন্ধ করে না দিয়ে, আর একটা কোন কাজে তাদের বসিয়ে দিলে সে কাজটাও তখন তারা বেশ আমোদের সঙ্গে করবে দৃষ্টান্ত স্থলে, তুমি লিখতে বসেছ, ছোট তিন বছরের মেয়েটী কলম কি দোয়াত নিয়ে যাচ্ছে, কাগজ ছিরে ফেল্‌ছে তখন তুমি তাকে বকে কি মেরে, একেবারে চুপ করে বসিয়ে না দিয়ে, যদি তার খেলনা গুলো কাছে এনে দাও, অথবা অন্য নূতন একটা জিনিষ দাও, সে সেগুলো নিয়ে বেশ খেলবে, তোমাকে আর অস্থির করে তুলবে না। তোমাকে বারবার চীৎকার করতে হবে না।

পাঁচ বছর হতে দশ বছরের মধ্যে শক্তিটা অনেকটা জ্ঞান মূলক হয়ে উঠে। ইহা শক্তি-বিকাশের তৃতীয় যুগ —শক্তির প্রভাবের যুগ। এবয়সে তাদের ইচ্ছা খাটাবার

জন্য, বালকদের মধ্যে আমরা বেশ একটা চঞ্চলতা দেখতে পাই। তারা আপন ইচ্ছামত কাজ করবার জন্য উত্তেজিত হয়ে উঠে। কিন্তু তখনও বিচার-বুদ্ধি বা জ্ঞানটা এমন ভাবে পরিস্ফুট হয় নি যে, তারা কাজের দোষগুণ বিচার করতে পারে অথবা ইচ্ছাশক্তিকে জোরে একদিকে চালিয়ে নিতে পারে। তদ্দরুণ এ বয়সেও তারা মা বাপের প্রভাব ছাড়তে পারে না। মা বাপের কথাটা, একেবারে অগ্রাহ্য করা, অতটা সাহস, কি শক্তির জোর তাদের মধ্যে দেখা যায় না। সাহস করে সাম্না-সাম্নি মা বাপের কথার বিরুদ্ধে কাজ তারা করতে পারে না বটে, কিন্তু শক্তির প্রভাবের দরুণ, একটু আড়ালে অনেক সময় ইচ্ছামত কাজ করে থাকে। মা বাপ কোন কাজ করতে নিষেধ করলে, মা বাপের সাম্নে তখন তাদের মধ্যে একটু নিষ্ক্রিয় ভাব বেশ টের পাওয়া যায়। প্রথম চার বছরে, মার সতর্ক চেষ্টায়, ছেলে মেয়েদের মধ্যে যদি মা বাপের ইচ্ছানুরূপ কাজ করবার প্রবৃত্তির একটা ধারা পড়ে না যায়, তবে ছেলেরা এবয়সে আড়ালে ইচ্ছামত যা তা করবেই। অনেক সময় দেখা যায়, মা বাপ কি শিক্ষকেরা সামনের অবাধ্যতা যেমন দমন করেন, আড়ালের অবাধ্যতার প্রতি তেমনটা দৃষ্টি রাখেন না। এ বয়সেও যদি ছেলেরা যথা সময়ে, যথোচিত বাধা না পায়, যদি তারা মা বাপের ইচ্ছামত কাজ করবার জন্য অভ্যস্ত হয়ে না উঠে, তবে ভবিষ্যৎ বিপদ অপরিহার্য্য। অনেক সময় দেখা যায়, এ বয়সে ছেলেরা তর্ক করতে চায়,

যুক্তি চায়। মা যদি তখন বেশ বুদ্ধির সহিত অতি সামান্য কথায় সাধারণ ভাবে তাদের প্রশ্নের উত্তর করতে না পারেন, ন্যায়ের দিকে তাদের মন ফিরিয়ে রাখতে না পারেন, অথবা আপনার আধিপত্য স্থাপন করতে না পারেন, তবে ছেলেরা আপন পথে চলে যাবেই। ছেলেদের মনেরগতি ফিরান, জোর জুলুমের কাজ নয়। তা'তে বিলক্ষণ বিচক্ষণতা, সহিষ্ণুতা ও সহৃদয়তার দরকার। মেজাজ গরম করে, ছেলেদের সঙ্গে ব্যবহার করলে চলবে না।

এগার বছর হতে ষোল বছরের মধ্যে ইচ্ছাশক্তি অনেকটা জ্ঞান ও বিচার-বুদ্ধি মূলক হয়ে উঠে। তখন তারা অনেকটা ভাল মন্দ বিচার করতে সমর্থ হয়। তৃতীয় যুগের নিষ্ক্রিয়ভাবের স্থলে তখন আমরা বেশ কর্ম্মঠতা দেখতে পাই। ইচ্ছাশক্তি বিকাশের ইহা চতুর্থ যুগ-শক্তির চালনার যুগ। এযুগে সাধারণতঃ ছেলেরা একটা গোঁ ধরে বসে। শতবার বারণ কর, তারা আপন ইচ্ছামত কাজ করে যাবে। মা বাপের দিকে একটুও তাকায় না। মার আর বক, সব অগ্রাহ্য করে তারা আপন ইচ্ছামত কাজ করবে। এ অবস্থায় শাসন পরাস্ত হয়, সংশোধন অসম্ভব হয়ে উঠে। তাই নীতিশাস্ত্রবিদ পণ্ডিত চাণক্য বলে গেছেন, 'ষোল বছর হতে ছেলেদের সঙ্গে মিত্রের মত ব্যবহার করতে হবে।' সহৃদয়তা ও সদ্‌পরামর্শের দ্বারা তখন তাদের দোষ না শোধ্‌রালে জোর জুলুমে কিছু হবে না। পূর্ব্বকালের সযত্ন চেষ্টায়, মার ইচ্ছানুরূপ, যদি ছেলেদের ইচ্ছাশক্তি প্রবাহের

একটী ধারা পড়ে যায়, এ বয়সে সে ধারা ধরেই তাদের শক্তি বয়ে যাবে। তাদের কাজ কর্ম্ম ও সম্পূর্ণ পিতা মাতার ইচ্ছানুরূপ হয়ে উঠবে। তখন পরিবারে সুখের অন্ত থাকে না, ছেলের প্রশংসা সকলের মুখে মুখে। পূর্ব্বোক্ত তিন যুগের মধ্যে মার ইচ্ছায় ধারা ধরে শক্তির ক্রমাগত প্রবাহে ছেলেদের মনের মধ্যে, নদীর মত একটা খাদ পড়ে যায়। ভবিষ্যতে কখনও তারা মা বাপের ইচ্ছাব বিরোধী হয়ে চলতে পারে না। তখন ছেলেরা মা বাপের কথা ছাড়া এক পাও ফেলে না। মাতা পিতা কি শিক্ষকের হুকুম পেলেই, তাদের ইচ্ছাশক্তিটা এমন বেগে ছুটে আসে যে, সাংসারিক অন্য সহস্র বাধা লঙ্ঘন করে, তারা তাঁদের হুকুম পালন করে থাকে। এজন্যইত আমরা দেখতে পাই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মার আদেশ পালন করবার জন্য, রাত্রে ঘাটে নৌকা না পেয়ে, সাঁতার দিয়ে দামোদর নদী পার হয়ে, মার কাছে গিয়েছিলেন। নির্ভয়ে জ্বলন্ত জাহাজের উপর দাঁড়িয়ে, দশ বছরের ক্যাসাবিয়েঙ্কা জাহাজ ছেড়ে যাবে কিনা পিতার অনুমতি চাচ্ছিল। এবং অনুমতি না পেয়ে, শেষে জাহাজে দাঁড়িয়ে পুড়ে মরল। বাধ্যতার এ রকম জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত অনেক দেখা যায়। এখন ভেবে দেখ বাধ্যতার উৎপত্তি কোথায়? এখন বুঝলে তোমরা, শিক্ষার ধারা কোন পথ ধরে যাচ্ছে, শিক্ষক ও মা বাপের হাত কোথায় এবং পরিবারের সুখ কোথায়?

সরোজ। মা অনেক সময়ে ছেলেগুলো বড় বেকিয়ে বসে,

কিছুতেই পারা যায় না, মার পিট করলে আরও যেন দুর্দ্দান্ত হয়ে উঠে।

মা। দেখ সরোজ, গৃহরাজ্যে মার পিটের স্থান নাই। সর্ব্বদা মনে রেখ, গৃহরাজ্য স্বেচ্ছাচারিতা কি খেয়ালের রাজ্য নয়। সহানুভূতি, সমব্যবহার, উদারতা ও গুণগ্রাহিতা ইহার শাসন নীতি। প্রেম পবিত্রতা ইহার ভিত্তি। যে বাড়ীতে মা ছেলেকে বুঝে না, ছেলের কাজে মার সহানুভূতি নাই, মার কাজে ছেলের উৎসাহ নাই, মার হুকুমের প্রতি ছেলের শ্রদ্ধা নাই, সে বাড়ীতে শান্তি কি সুখ স্থান পায় না। সংশোধনের স্থান ষোল আনা শাসন অধিকার করে বসে থাকে।

ছেলেরা যে ছেলেবেলা হতে দুর্দ্দান্ত হয়ে উঠে, তার কারণ আছে, প্রকৃতিই তাকে দুর্দ্দান্ত করে তুলে ; ছেলেকে মারলে কি হবে? প্রকৃতির সঙ্গে তোমার লড়তে হবে যে। প্রাণীজগতের এক স্তরে মানুষের স্থান। যে প্রকৃতি, ভিন্ন প্রাণী হতে মানুষকে আলাদা করে রাখে, সে প্রকৃতির মধ্যেই প্রাণী-সাধারণ একটা বৃত্তি আমরা সাধারণতঃ দেখতে পাই। এ বুনো প্রকৃতি নিজকে স্থাপন করে, মানুষ-প্রকৃতিকে নষ্ট করার চেষ্টা করে। এ বুনো প্রকৃতি যদি একবার আত্ম-প্রতিষ্ঠা করতে পারে, মানুষ প্রকৃতি আর মাথা তুলতে পারে না। তোমরা এমন ভাবে চলবে, সর্ব্বদা এমন ভাবে সতর্ক হয়ে থাকবে, যেন ছেলেদের বুনো প্রকৃতি তোমাদের উপর আধিপত্য করতে না পারে। অনেককে বলতে শুনা যায় 'ছেলে মানুষের আবার বাধ্যতা

কি ? তারা কথা না শুনলে দোষ নাই।' এ রকম ভাবে তারা যদি একবার আপন ইচ্ছামত কাজ করার সুযোগ পায়, তবে আর তোমাকে গ্রাহ্য করবে না। এমন কোন বয়স নাই, যে বয়সে তাদের অবাধ্যতা উপেক্ষা করা যেতে পারে।

লীলা। মা, ওদের একটু আধটু স্বাধীনতা দেওয়া ভাল। একেবারে হাতের মুঠোর মধ্যে রাখলে কি চলে ?

মা। অতি সুন্দর কথা বলছ, লীলা, বাধ্যতা স্বাধীনতার বিরোধী নহে। সর্ব্বদা মনে রেখো, ছেলেরা মানুষ, যদিও ছেলে মানুষ। তোমাদের ভিতর এমন কিছু নাই, যাহা ছোট্ট আকারে ছেলেদের মধ্যে দেখা যায় না। এ ছোট জিনিষ গুলো, তোমাদের বড় করে তুল্‌তে হবে। তবে তারা মানুষ হবে। চিরকাল অধীন হয়ে থাকা মানুষের প্রকৃতি নয়। স্বাধীন হয়ে চলবার জন্য, ছেলে বেলা হতে ছেলেরা নিজদের তৈরী করতে থাকে। আমাদের কাজ, শুধু তাদের সাহায্য করা — ভবিষ্যতে পদস্খলিত না হয়ে, যা'তে স্বাধীন ভাবে তারা সংসারে দাঁড়াতে পারে, এ রকম শক্ত ক'রে তাদের গড়ে তোলা। একটু আধটু কেন, পূরামাত্রায় তাদের স্বাধীনতা দেবে। তবে ঘুড়ির মত, হাতে তোমাদের সূতা থাকবে, যেন প্রকৃতির খেয়ালে তারা যেদিকে সেদিকে না যেতে পারে ; আর দৃষ্টি রাখবে তাদের কাজ কর্ম্মের প্রতি। ছেলেদের কাজে তোমাদের যথেষ্ট সহানুভূতি থাকা চাই। প্রতি কাজে তাদের বাধা দেবে তা নয়। অনেক সময় তোমাদেরও তাদের বাধ্য হয়ে চলতে

হবে। তাদের মেজাজ বুঝে কাজ করতে হবে। ছেলেরা আপন মনে কোন কাজ করতে থাকলে, যদি কাজটা দোষের না হয়, তবে তাকে বাধা দিও না। স্বাধীন ভাবে কাজ করতে তারা খুব ভালবাসে। যদি কা'রো সাহায্য ছাড়া, তারা কোন ভাল কাজ করে, তখন তাদের ভারি আনন্দ হয়। এ গেল বাধ্যতা শেখানের কথা। আমরা কিন্তু অনেক সময়, আমাদের ব্যবহারে ছেলেদের অবাধ্য হ'বার বিলক্ষণ সুযোগ করে দিয়ে থাকি।

সরোজ। সে কি রকম, মা ?

মা। বলছি, শোন। অনেক সময় আমরা দেখতে পাই, ছেলেমেয়েরা একমনে তাদের কাজ করতে থাকে। তাদের মন কাজে বেশ মেতে গেছে, এ অবস্থায় অন্য কোন দিকে মন দেওয়া, তার পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু হঠাৎ মা তাকে অন্য কাজে হুকুম করলেন। এস্থলে ছেলে অবাধ্য হ'তে চা'বে এবং অনেক সময় অবাধ্য হয়েই থাকে। তাই ছেলেদের মনের গতি ও অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। যেখানে কাজটা নিতান্ত দোষের নয়, এবং কাজে লিপ্ত থাকায়, যেখানে তোমার আদেশ পালবার সম্ভাবনা থাকবে না, সেখানে কোন আদেশ করবে না এবং জোর করে ছেলেকে তার কাজ হতে উঠিয়ে, ছেলের দ্বারা তোমার হুকুম পালন করাবার চেষ্টা করবে না। কোন কোন বাড়ীতে অনেক সময় দেখা যায়, ছেলেদের এমন কাজে হুকুম করা হয় যে, সে কাজটা না করলে

কা'রো বিশেষ অনিষ্ট হয় না। বস্তুতঃ ছেলেরা যদি কাজটা না করে, মা বাপেরা সারা শব্দ করেন না। কাজ না করাতে যদিও কা'রো অনিষ্ট হল না বটে, কিন্তু ছেলেদের এই ঔদাসীন্য তাদের মনের মধ্যে একটী দাগ রেখে গেল। তার ফল, এক সময় না এক সময় তোমাকে ভুগতে হবে। প্রত্যেক কাজ, ফটোগ্রাফের প্লেটের মত, ছেলেদের মনের মধ্যে এক একটা দাগ রেখে যায়। সেটা ক্রমে বড় হয়ে, ছবির মত, বাহিরে প্রকাশ হয়ে পড়ে। কোন কোন বাড়ীতে, সাধারণতঃ ধনী পরিবারে, ছেলেমেয়েগুলো বড় আদুরে হয়ে উঠে, বিশেষতঃ রোগা ছেলেমেয়েরা। তারা যা একবার না করবে, মা বাপ তাকে দিয়ে সেটা করাতে পারেন এমন হৃদয়ের বল তাঁদের নাই। ব্যারাম হয়েছে, ঔষধ খেতে হবে, এক দাগ খেয়ে, আর এক দাগ খাবে না। কেননা খেতে মিষ্টি নয়। মা বলেন 'খাও' ছেলে বলে 'না খাব না'। মা দু'তিনবার বলে চুপ করে থাকেন। আবার এও দেখা গেছে, কোন বাড়ীতে, ছেলেকে কোন কাজ করতে বারণ করা হয়েছে, কিন্তু ছেলে কাজটা ক'রে বসেছে। মা চোক রাঙ্গায়ে বকে উঠলেন, ছেলে ভয়ে বল্লে 'আর করব না', মা চুপ করে গেলেন। পুনরায় ছেলে সে কাজটাই করে বস্‌ল। মা আবার বকে উঠলেন, ছেলের আবার সেই উত্তর; মা চুপ করে গেলেন। এভাবে কিছু দিন, মা ছেলেতে বেশ চলতে লাগল। শেষটা মা হয়রান হয়ে ছেড়ে দিলেন,

ছেলের জিত হয়ে গেল। আবার এও দেখা যায়, অবাধ্যতা যতক্ষণ অনর্থে পরিণত না হয়, ততক্ষণ অবাধ্যতার দিকে তেমনটা খেয়াল করা হয় না। দৃষ্টান্ত স্থলে, মা বসে পড়ছেন, ছেলেটী টেবিলের উপর দোয়াতটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। মা এক একবার টেবিলের দিকে দেখেন, আর ছেলেকে মানা করেন 'দোয়াত ধরনা।' বিশেষ কোন অনিষ্ট হচ্ছে না দেখে, তেমন জোরে কিছু বলেন না। কাজেই ছেলেও ইচ্ছামত দোয়াতটা নিয়ে খেল্‌ছে, একবার সামনে টানে, একবার দূরে ঠেলে দেয়। এভাবে তিন চার বার, মানা করা সত্ত্বেও, ছেলে দোয়াত নিয়ে খেল্‌ছে। কিন্তু শেষটা হঠাৎ দোয়াতটা টেবিল হতে পড়ে, মার কাপড় চোপড় নষ্ট হয়ে গেল। আর তখনি ছেলের উপর মারপিট চলতে লাগল। এ অনর্থটা না হলে, মা কিছুই বল্‌তেন না। অবাধ্যতা মা ছেলের মধ্যে বেশ করে জন্মায়ে দিয়ে, শেষটা ছেলেটীকে মার্‌লেন। শাস্তিটা এখানে মারই হওয়া উচিত ছিল। কেমন না? আবার এও দেখা যায়, পিতা মাতা কি শিক্ষক রাগের মাথায় ছেলে মেয়েকে এমন একটা কাজে হুকুম করে বসেন, যে কাজটা করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। রাগ ঠাণ্ডা হ'লে পর, কাজটা করা হল কি না, সে জন্য তাঁরা গ্রাহ্য করেন না। আবার কোথাও এও দেখা গেছে, ছেলেকে কোন কাজ করতে বলা হয়েছে, ছেলে কাজ করবে না। দু'বার তিনবার বল্লে, ছেলে নড়েও না। শেষটা বলা হল 'আচ্ছা কাজটা কর, তোকে খেতে দেব' অথবা

'খেলতে দেব' ইত্যাদি। ইহাতে ছেলে কাজ করে বটে, কিন্তু বাধ্যতার হিসাবে সে কাজের কোন মূল্য নাই। এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা যদিও আমরা উপেক্ষা করি, কিন্তু তাহাদের ফল কোথায় দাঁড়ায়, এখন দেখ। ছেলেদের এমন কোন কাজে হুকুম করবেনা, যা তাকে দিয়ে করাবার তোমার ইচ্ছা নাই, অথবা যা সে করতে পারবে না, কি অন্য কাজের দরুণ, তখন করতে চাবে না। ছেলেদের খেয়াল ও প্রকৃতি দেখে, যে কাজটা তাদের করতে বলবে, সে কাজটা নিশ্চয়ই তাকে দিয়ে করিয়ে নেবে। তাদের বুঝতে দিও না, মার হুকুমের কোন গুরুত্ব নাই, তাঁর কথা মত কাজ না করলে, কিছু আসে যায় না। ছেলেদের মধ্যে এ বিশ্বাস ভাল মতনই থাকা দরকার যে, মা বাপ কি শিক্ষক যখন যেটা বলবেন, তাঁরা তাঁদের কথা মত কাজ না করিয়ে ছাড়বেন না। মা বাপের হুকুম ফাঁকা আওয়াজ নয়, তাঁরা মুখে যা বলেন, কার্য্যত তা করেন। অন্য দিকে মা বাপ ও শিক্ষকের ভাল জ্ঞান থাকা দরকার যে, হুকুম কি শাসন করা, খেয়ালের কাজ নয়। হুকুম করার পূর্ব্বে, অনেক কিছু ভাবতে হয়, অনেকটা দেখতে হয়। শুধু হুকুমে উদ্দেশ্য রক্ষা হয় না।

বাধ্যতা বিষয়ে আর বেশী কিছু বলবার নাই। মনে রেখ, বাধ্যতার মত এমন মহৎগুণ আর নাই। মহাপুরুষের জীবনীর অন্তরালে, এ গুণের প্রভাব দেখতে পাবে। যার ভিতর

এ গুণ নাই, সে কখনও মানুষ হয়ে দাঁড়াতে পারে না। একদা কোন ফরাসী কর্ম্মচারী, আমেরিকার জননায়ক জগদ্বিখ্যাত জর্জ্জ ওয়াশিংটনের কথা উত্থাপন করে, জর্জ্জের মাতাকে জিজ্ঞেস্ ক'রেছিলেন যে, তিনি কি করে জর্জকে এমন শক্তিশালী পুরুষ তৈরী করেছিলেন। জর্জের মাতা অতি সরলভাবে, সহজ ভাষায় বিদেশী কর্ম্মচারীকে উত্তর করে ছিলেন 'আমি তা'কে বাধ্যতাই শিখিয়েছিলুম।' বড় লোকের জীবনী পাঠে দেখা যায় যে, তাঁরা তাঁদের মহৎ গুণগুলো মার বুক হতে যেন দুধের সঙ্গে চুষে নিয়েছেন। তাই লীলা, বলছিলুম, তোমরা যদি একবার মানুষ হয়ে দাঁড়াতে পার, দেশের কলঙ্ক ঘুচে যাবে, সব দুঃখ মোচন হবে। দেশের অধঃপতনের জন্য যদি কেহ দায়ী, তবে তোমরা— দেশের রমণীরা, দেশের জননীরা।

লীলা। মা, এযাবত তোমার অনেক কথার সায় দিয়ে এসেছি। তুমি জাপান, মার্কিণ ও অন্য দেশের মহিলাদের সঙ্গে তুলনায় আমরা নিতান্ত বোকা, অজ্ঞ ও অকেজো বলে সাব্যস্ত করেছ; তারও কোন প্রতিবাদ করি নাই। তুমি যে এখন মুখের উপর শুনায়ে দিচ্ছ যে, দেশের ছেলেমেয়েগুলোকে আমরাই অধঃপাতে দিচ্ছি, এ অভিযোগে কবুল-জবাব দেওয়ার আগে, দু'টী কথা না বলে আর থাকতে পারলুম না।

সরোজ। আবার তুই কি জেঠামো আরম্ভ কর্‌লি, লীলা?

মা। লীলা, তোমাদের পক্ষসমর্থণের পক্ষে কি বলবার আছে, শুনি।

লীলা। মা, বলব?

সরোজ। বড় ভয় দেখাচ্ছিস্ যে?

লীলা। দিদি, তুমি চুপ কর না। বিনা দোষে গায় স'য়ে নেব, কিসের জন্য? আমরা কি মানুষ নই? আমাদের দেহটা কি তাদের মত রক্ত মাংসের দেহ নহে? তবে জাপান কি মার্কিণ দেশের রমণী হতে হীন হতে যাব কেন? আমরা অনুপযুক্ত কিসে? তারা যা করতে পারে, আমরা কি তা পারি না? কেন পারব না?

মা। লীলা, অতি সত্য কথা, তোমরা কোন দিকে কোন দেশের রমণী হতে হীন নও। অন্য দেশের রমণীরা যা করতে পারে, তোমরা কেন তা পারবে না? অবশ্য পারবে। তবে দুঃখ, তোমরা কিছু কর না। লীলা তুমি মাদের পক্ষে যখন দাঁড়িয়েছ, তোমাদের শক্তির উপর, তোমার এতই যখন বিশ্বাস, তবে দেশের রমণীরা, দেশের জননীরা কিছু করছেন না কেন, বলতে পার?

সরোজ। লীলা, তুই শেষটা মার সঙ্গে ঝগড়া করবি দেখতে পাচ্ছি।

লীলা। দিদি, তুমি কী যে বল! ঝগড়া করতে যাব কেন? খাটি কথাই বলছি।

মা। সরোজ, তুমি কেন লীলাকে বাধা দিচ্ছ? শোন

না, সে কি বলে। সে এসব বিষয়ে চিন্তা করেছে, মনে হচ্ছে।

লীলা। হাঁ, মা। তোমার কথা শুনবার পর থেকে আমি এবিষয় বিলক্ষণ ভেবে দেখেছি। আমার মনে হয় দোষটা, ষোল আনা তোমাদের, অথবা দেশের।

মা। কি করে?

লীলা। মা তুমি যে ভাবে ছেলে মানুষ করতে বলছ, তা'তে পনর আনা মার হাত, দেখতে পাচ্ছি। এ ক্ষেত্রে পিতার হাত অতি কম।

সরোজ। এতক্ষণে এই বল্লি, লীলা?

লীলা। যাও, দিদি, আমি তোমাকে কিছু বলছি না।

মা। তারপর, লীলা?

লীলা। শোন, বলছি। তোমার কথা মত একটা ছেলে মানুষ করতে হলে, মার দেহ-বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, মনো-বিজ্ঞান, শিক্ষা-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান এবং সংসারের কিছু অভিজ্ঞতা থাকা চাই। শিক্ষা, দীক্ষায় মা যদি নিজে মানুষ না হন, তাঁর ছেলেকে কে মানুষ করে, বল দেখি।

মা। তাত ঠিক কথা।

লীলা। যে সব সভ্যদেশের কথা বলে তুমি আজ আমাদের দু'কথা বেশ শুনিয়ে দিলে, সে সবদেশ এক মুখে, উচ্চকণ্ঠে, পৃথিবীর কাছে সাক্ষ্য দিচ্ছে,— রমণীরাই

দেশের মেরুদণ্ড, রমণীদের উন্নতিতে দেশের উন্নতি, জাতির উন্নতি।

মা। লীলা, ওসব কথা কেন? আমি ত সে কথা আগেই বলেছি।

লীলা। হাঁ, মা, বলেছ বলেই ত কথাটা তুল্‌ছি।

মা। বটে? তবে বলে যাও।

লীলা। মা, যে জাতটার উপর দেশটা পনর আনা নির্ভর করে, যে জাতটার, শিক্ষা দীক্ষার উপর, দেশটার উন্নতি অবনতি নির্ভর করে, সে জাতটাকে তোমরা কি ভাবে গড়ে তুলছ?

মা। তোমার উদ্দেশ্যটা ঠিক বুঝতে পারলুম না, লীলা।

লীলা। কেন, মা, শক্ত কথা কিছু বলি নাই। জিজ্ঞেস করি, মেয়েদের জন্য তোমরা কি একটু ও ভাব? আমাদের শরীর কি শিক্ষার দিকে, দেশ কি একটু ও তাকায়? বাড়ীতে মেয়ে জন্মিলে, মা বাপের মাথায় বাজ পড়ে। মেয়েরা দেশের জঞ্জাল, পিতার সুখের কণ্টক বলে তোমরা তুচ্ছ কর না কি? না দেখ শিক্ষার দিকে, না দেখ তাদের শরীরের দিকে। সত্য নয় কি মা?

সরোজ। লীলা, তুই সে কথা বল্‌ছিস কোন মুখে? তোর শিক্ষার জন্য, জলের মতন টাকা যাচ্ছে। তুই কেমন স্ফূর্তি করে ছুটে বেড়াচ্ছিস্। সে ভাগ্য ত আমার হয় নি।

লীলা। দিদি, তুমি বড় গোল করছ। আমি কি

নিজের জন্য কিছু বলছি? তোমার দৃষ্টান্ত দিয়েই বলছি, একটু শোন না। এই ত দশ বছর বয়স হতে তুমি স্বামীর ঘর করছ, সংসারের কি-ই বা খবর রাখ, কি-ই বা শিখেছ? ছেলের মা হয়ে, যদি তোমাকে ছেলের মতনই শেখাতে হয়, তুমি ছেলেকে শেখাবে কখন? তোমার মত ভাগ্য, দিদি, বাঙ্‌লা দেশের সারে পনর আনা মেয়ের। শুধু, বল্লেই কি হয়? বাপের বাড়ীতে যতকাল থাক, মা বাপ দু-ই শিগ্‌ঘির শিগ্‌ঘির সরাতে পারলে রক্ষা পান। সরাতে না পারলে, ভারি উদ্বেগ মনে করেন। স্বামীর বাড়ীতেও তোমরা নিতান্ত বাজে লোক, কোন গুরুতর কাজে তোমাদের হাত নাই।

সরোজ। হাত দিতে মানা করে কে?

লীলা। হাঁ, দিদি, সে কথা বলো না। তোমার বাড়ীতে দেখেছি, তোমার হাত কোথায় আছে। হাত দিবে কোন সাহসে? কিছুই ত জাননা, সংসারের কোন খবর রাখ কি?

মা, বল দেখি, এ অবস্থায় শুধু বকলে চলবে কেন? শুধু সভ্য দেশের উদাহরণ, কি দৃষ্টান্ত দিলে আমাদের দেশ উঠবে কেন? এ দেশের নারীজাতির ইতিহাস কখনও কলঙ্কের ইতিহাস নহে। এ দেশের রমণীরা এককালে দেশের মুখ উজ্জ্বল করে দাঁড়িয়েছিলেন। তোমরা আমাদের বাড়তে দিবে না, আমরা দেশটাকে গড়ে তুলব কি করে?

সরোজ। মা, তুমি যে চুপ করে রইলে? শেষটা লীলার সঙ্গে বুঝি পেরে উঠলে না। লীলা, তোকে যতটা বোকা মনে করেছিলুম, তাত নয়, দেখতে পাচ্ছি।

মা। না, সরোজ, লীলা বাস্তবিক বড়ই কঠিন প্রশ্ন তুলেছে। তার কথার ভিতর যথেষ্ট সত্য রয়েছে। তাকে বুঝ দেওয়ার মত, কোন উত্তর খুঁজে পাচ্ছিনা।

দেখ, লীলা, তোমার কথা ঠিক। এ দেশে যে নারী জাতিকে তুচ্ছ করা হয়, নারীজাতির প্রতি এ দেশের ব্যবহার যে দেশের উন্নতির বিশেষ অন্তরায়, সে বিষয়ে সন্দেহ কি। কিন্তু লীলা, দেশাচার কি শীঘ্র দূর করা যায়? এখন মেয়েদের প্রতি দেশের চোখ পড়েছে। মেয়েদের এ অবস্থা বেশীদিন থাকবে না, জেনো। কিন্তু দেশ তোমাদের প্রতি তাকাবে না বলে, তোমরা কি নিজেরা ও তোমাদের দিকে দেখবে না, নিজেরা নিজেদের উঠাতে চেষ্টা করবে না?

লীলা। মা, একশবার। কেন চেষ্টা করব না? কিন্তু মা, দেশটা শুধু তোমায় আমায় নিয়ে নয়। দেশের সব ভাইকে নিয়ে দেশটা। দেশাচার যদি চীন রমণীদের পায়ের মত, আমাদের সকলকে সতত ছোট করে রাখতে চায়, দেশটা বড় হবে কা'কে নিয়ে? তোমাদের সে-ই এক কথা, দেশাচার শীঘ্র যায় না। দেশাচার দূর করতে করতে, দেশটার সর্ব্বনাশ হয়ে যাচ্ছে, এ কথা তোমরা মোটেই ভেবে দেখ না। তোমরা যদি অনতি বিলম্বে এ দেশাচার দূর না কর, তবে আর শীঘ্র দেশ উঠবে, আশা করো না।

মা। হাঁ লীলা, সে কাজটা এখন তোমাদের হাতে। তোমরাই লেগে যাও। আমরা আর কয়দিন?

সরোজ। হয়েছে, লীলা, এখন চুপ করে যা। কিছু কাজের কথা শোনা যাক। মা বাধ্যতা বিষয়ে তুমি ত অনেক কথাই বল্লে। এখন ছেলেদের অন্য গুণ-শিক্ষা বিষয়ে কিছু বল।

লীলা। কাজে ও ব্যবহারে বাধ্যতা কি করে শেখাতে হয়, তা বেশ জানতে পারলুম। এখন অন্য নৈতিক গুণ সম্পর্কে কিছু বল, মা।

সরোজ। মা, সত্যবাদিতা ভাল ছেলের আর একটা লক্ষণ। সে গুণ ছেলেদের কি করে শেখান যেতে পারে?

মা। হাঁ, সরোজ, এখন সত্যবাদিতা বিষয়ে আমি তোমাদের কিছু বলব।

সত্যকথা বলা মানুষের ধর্ম্ম। ছেলেরা সহজে এ পথ ছাড়তে পারে না, যদি আমরা তাদের পবিত্র আব্‌হাওয়া ও আবেষ্টনের মধ্যে রাখ্‌তে পারি। ছেলেরা কেন, বয়স্ক লোকেরাও এ পথ ছেড়ে চলতে পারে না, চলতে গেলে, কোন না কোন জায়গায় হুঁচোট খেয়ে পড়ে যায়। এবং শেষকালে ফিরে আবার এ পথে আসতে হয়। মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি সত্যের দিকেই জেনো। মানুষ কল্পিত সুখের জন্য, স্বার্থের জন্য, সত্য গোপন করে, মিথ্যার জাল বুনে থাকে এবং প্রকৃত ঘটনা ঢেকে রাখতে চেষ্টা করে। কিন্তু সে অবস্থায়ও, অনেকক্ষণ ধরে খুটে খুটে

মানুষকে জিজ্ঞেস করলেই, সে সত্যটা প্রকাশ করে দেয়। এই জন্যই বিচারগৃহে, বিচারকগণ উকিল, ব্যরিষ্টারগণের জেরাপ্রশ্নের এত আদর করে থাকেন।

লীলা। তাই যদি হবে, তবে ছেলেরা কেন মিছে কথা বলবে, মা, তাদেরত স্বার্থের কোন টান নাই, সুখেরও কোন লালসা নাই?

মা। কারণ বলছি, শোন, ছেলেদের কল্পনা-শক্তি অতি বেশী। তাদের মুখে যখন ভাষা ফুটে, বাহ্য জগতটা ইহার বিচিত্র দৃশ্য ও ঘটনাবলী নিয়ে, যখন তাদের সামনে এসে দাঁড়ায়, তাদের ছোট কথায়, তারা তখন তাদের ভাব প্রকাশ করবার চেষ্টা করে থাকে। কল্পনা-শক্তির প্রভাবের দরুণ, অনেক সময় অনেক রকম অদ্ভুত কথা তারা বলে। আবার অনেক সময় ভুলেও অনেক কথা বলে। ছেলেদের এ অদ্ভুত রচনা আমরা সাধারণতঃ হেসে উড়িয়ে দেই। সে সব অসত্য বা বানান কথা বলে, কিছুই দোষের মনে করি না। নূতন দাঁত বে'র হলে ছেলেরা খাদ্য অখাদ্য বিচার না করে যেমন যা তা কামড়াতে চায়, এখানে ও অনেকটা তাই হয়ে থাকে। মুখে ভাষা ফুটলে, মাথায় কল্পনাশক্তি জাগলে, ছেলেরা আপন ইচ্ছামত আবল্ তাবল্ বলতে থাকে। ছেলেরা স্বভাবতঃ বড় কোমল, ও আমোদ প্রিয়। তারা অনেক সময়, পাছে মাতা পিতা কষ্ট পায়, এ ভাব হতে, কোন সময় বা আমোদের ভাবে মিথ্যা বলে। মা যদি ছেলেকে খুঁজতে

থাকেন, ছেলে পাশের ঘর হতে বলে ‘আমি নাই।’ বাড়ীর কোন লোক ছেলের হাতে একটী জিনিষ দিয়ে যদি জিজ্ঞেস করে ‘কেমন জিনিষটা বেশ সুন্দর না’ ছেলে অনেক সময় বলে ‘হাঁ।’ তোমারা অখাদ্য জিনিষটা যেমন ছেলেদের মুখে তুলতে দাও না, তেমনি এ অবস্থায় ও অসত্য যা, ভুল যা, কখনও তাদের বলতে দিওনা এবং সর্ব্বদা সত্য যা’ তা বলতে উৎসাহিত করো। কিন্তু আমরা ছেলেদের এসব ভুল, পরিবারে বেশ আমোদের জিনিষ করে তুলি। বাবার দেওয়া কাপড়টা, যদি ছেলে বলে ‘মা দিয়েছে,’ তা নিয়ে মা বাপ বেশ আমোদ করেন। ফলে, ছেলেটী, মা বাপের আমোদ দেখে, পরে তা’কে যতবার জিজ্ঞেস করা হয়, ভুল বুঝেও, ভুল উত্তর ইচ্ছা করে, বারে বারে সে দিয়ে থাকে। এখানেই মিথ্যার জন্ম।

সরোজ। মা. ছেলেমেয়েদের অদ্ভুত কথাবার্ত্তা নিয়ে সকল পরিবারেই সকলে আমোদ করে থাকে। তারা অনেক সময় এমন সব ঘটনা বানিয়ে বলে, যা শুনে না হেসে পারা যায় না। তা’রা কোথেকে কি কথা এনে বলে, কিছুই ধরা যায় না। সাত জায়গার জিনিষ একত্র করে, কি গল্প বলে বুঝবার সাধ্যি নাই। ছেলেদের সে সব কথা ও গল্প নিতান্ত অদ্ভুত, অর্থশূন্য ও অসঙ্গত, সত্যের কাছ দিয়েও তা যায় না।

মা। তেমনি মিথ্যার ছায়া ও মারায় না। ছেলেদের ঐ সব কথা. সত্য-মিথ্যা নিরপেক্ষ, নিরেট কল্পনার রচনা। ইহাও প্রকৃতির

কাজ। তুমি চে'পে রাখ্‌তে পারবে না। তারা আবল্‌ তাবল্‌ বকবেই। অদ্ভুত গল্প রচনা করবেই। তোমার বাধা দেওয়ার চেষ্টা বৃথা। তাদের স্বাধীন ভাবে বলতে দাও। যখন অদ্ভুত অসঙ্গত গল্প বলে, বলে যা'ক। তাতে মনোযোগ দিয়ে কাজ নাই। কিন্তু তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তায়, অথবা কোন বাস্তব ঘটনা বল্‌তে যদি তারা, ভাব বা ভাষায় সঙ্গতির অভাবে, অথবা অন্য কারণে, কোন ভুল করে, সে ভুল তখ্‌খনি শোধ্‌রিয়ে দিও। তা নিয়ে কখনও আমোদ করো না, বা অন্য কোনমতে তার প্রশ্রয় দিও না। আমাদের পরিবারে প্রতিনিয়ত অনেক রকম ঘটনা ঘটে, যা'তে ছেলেরা মিছে কথা বলতে শেখে।

লীলা। কি করে মা?

মা। একটী ঘটনা বলি, শোন। একদিন একটী তিন বছরের ছেলে মাকে খুঁজছিল। ছেলের মা কি কাজে অন্য এক ঘরে ছিলেন। ছেলে মাকে অনেকক্ষণ না দেখে 'মা' 'মা' বলে কেঁদে অস্থির হয়ে যাচ্ছিল। ছেলে যতই মাকে ডাকে, আর বাড়ীর সকলেই বলে, 'মা কুয়োতে পড়ে গেছেন।' বাড়ীর পাশে একটী কুয়ো ছিল; ছেলে বাড়ীর লোকদের কথা শুনে, কুয়ার পারে গিয়ে, চীৎকার করে মাকে ডাক্‌তে লাগ্‌ল। ছেলেটী বাস্তবিকই মনে করল, 'মা বুঝি সত্যি সত্যি কুয়াতে পড়ে গেছে।' বাড়ীর ছোট বড় সকলেই ছেলেকে এই রকম ভাবে কাঁদতে দেখে

বেশ আমোদ করতে লাগলেন। মা ও ছেলের এ রকম টান দেখে লুকিয়ে, বাড়ীর অন্য লোকের সঙ্গে বেশ আমোদ করতে লাগলেন। ছেলের কান্না যখন কিছুতেই থামে না, তখন মা হাস্‌তে হাস্‌তে, ঘর থেকে বের হয়ে, ছেলেকে কোলে করে খুবই আদর করতে আরম্ভ করলেন। ছেলে কিন্তু মার এ সব কাণ্ডকারখানা দেখে অবাক হয়ে রইল। এ রকম দৃষ্টান্ত আমরা প্রায়ই দেখতে পাই। কেবল শুধু যে আমোদ করে ছেলেদের মিছে কথা শেখান হয়, এমন নয়। অনেক সময় দেখা যায়, ছেলেদের যেটা দেবার ইচ্ছা নাই, সেটাকে অতি বেশী করে বলা হয়। একা বাড়ীর বের হলে শেয়ালে কাম্‌ড়াবে, কুকুড়ে তাড়া করবে, ভূতে গলা টিপবে ইত্যাদি নানা রকমের ভয় দেখান হয়। কোন জিনিষ খেতে দেবার ইচ্ছা না থাক্‌লে, বলা হয়, এটা বড় ঝাল, ওটা খেলে মুখে ঘা হবে। ঔষধ খাওয়ার সময় ঔষধ খেতে না চাইলে, তিক্ত কটু ঔষধটাকে বলা হয় বড় মিষ্টি, বড় ভাল জিনিষ, ইত্যাদি। এ রকম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাতে পরিবারে, ছেলেরা মিছে-কথা শেখে থাকে।

সরোজ। সত্যি, মা, এ রকম ঘটনা ত অহরহ পরিবারে ঘটেই থাকে। এতে যে ছেলেদের কোন অনিষ্ট হতে পারে, তাত মনে করতে পারি নি।

মা। কিন্তু সরোজ, এই সব ঘটনা থেকেই বাস্তবিক পক্ষে, ছেলেরা মিছে-কথা ও প্রতারণা প্রভৃতি দোষ শেখে।

ছেলে প্রকৃতি বড় সরল ও বিশ্বাসপ্রবণ। পাঁচ বছর পর্য্যন্ত ছেলেকে যা বল্‌বে, সে অতি সহজে তা সত্য বলে বিশ্বাস করবে। তাই ছেলেদের মঙ্গল চাও ত, তাদের সঙ্গে প্রতারণা করো না। ছেলেরা যদি একবার প্রতারণা ধর্‌তে পারে, মিছে বল্‌ছ বুঝতে পারে, তবে তারা তাই অনুকরণ করবে। ভবিষ্যতে তারা তোমাদের সঙ্গে ও প্রতারণা করবে ও তোমাদের কাছে মিছে কথা বলবে। এ বিষয়ে স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয় সম্বন্ধে একটী গল্প আছে, বলছি শোন। একবার রাত দুপুরে তাঁর বাড়ীতে ছোট একটী ছেলে ঘুম ভেঙ্গে কেঁদে উঠেছিল। ঝি কিছুতেই তাকে শান্ত করতে পারে না। কত আদর করে, কত বকে, ছেলে কিছুতেই শান্ত হয় না। নিতান্ত বেগতিক দেখে, শেষে ঝি রসগোল্লার লোভ দেখিয়ে বল্লে, 'যদি চুপ কর, তবে রসগোল্লা দেবো।' রসগোল্লার নাম করাতেই ছেলে চুপ করল। পাশের ঘরে লাহিড়ী মহাশয় ছিলেন, তিনি বুঝতে পারলেন, এ দুপুব রাতে, ছেলেকে রসগোল্লা দেওয়া ঝির আদবেই মতলব নেই। ছেলের কান্না থামাবার জন্য ঝি ছেলের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। লাহিড়ী মহাশয় ঝিকে ডেকে ভৎর্সনা করলেন এবং সেই দুপুর রাতে ঝিকে ময়রার দোকানে পাঠিয়ে রসগোল্লা আনিয়ে, ছেলের হাতে রসগোল্লা দিয়ে তবে ছাড়লেন। এ দৃষ্টান্ত হতে তোমরা সহজে বুঝতে পার, সত্য মিথ্যা বিষয়ে ছেলেদের সঙ্গে কি রকম ভাবে ব্যবহার করা তোমাদের উচিত।

লীলা। আচ্ছা মা, অনেক সময় ছেলেমেয়েরা মিছে কথা পাড়াপ্রতিবেশীদের নিকট শিখতে পারে না? এমনও ত দেখা যায়, কোন কোন ছেলে বাড়ীতে মা বাপের কাছে বেশ সত্যবাদী ও সাধু, কিন্তু বাহিরে মিছে কথা বলা বা প্রতারণা করা, কিছুই বাদ যায় না।

মা। পাড়াপ্রতিবেশী হতে যে না শিখে তা নয়। কিন্তু বাহির হতে কখনও যদি তারা কিছু শেখে, যদি ঘরে তারা তা দেখতে না পায়, পরন্তু তার বিপরীত কি অন্য রকমই দেখে, তবে বাহিরের শিক্ষা তারা জীবনে রাখতে পারে না। সেজন্যই আমি ছেলেদের আবহাওয়া ও আবেষ্টন বিষয়ে বারবার তোমাদের নিকট বলছিলুম। মিছে কথা ও প্রতারণার প্রতি একটা ঘৃণার ভাব এ বয়স হতে তাদের মধ্যে জন্মিয়ে দেবে। মিছে কথা বললে সকলে ঘৃণা করে, কেউ বিশ্বাস করে না, ইত্যাদি বলে মিছে কথার দোষ তাদের বেশ বুঝিয়ে দেবে। বাহিরে পাড়াপ্রতিবেশীদের নিকট মিছে কথা শিখতে পারে বলে, মা বাপ কি শিক্ষকেরা যদি নিজেরা নিশ্চিন্ত থাকেন, তবে তাতে কাজ হবে না। কথায় মিছে ব্যবহার যে দোষ শুধু তা নয়, কাজে মিছা ব্যবহার আরও দোষ। অনেক ছেলেকে কাজ করতে দিলে, তারা কাজটা ভাল মতে না করে, যে কোন রকমে শেষ করে চলে যায়। যেন জিজ্ঞেস করলে বলতে পারে, কাজ করেছে। অনেক পিতামাতা কি অভিভাবক এ দোষ গ্রাহ্য করেন না। এবং অনেক সময়ে ধরতেও পারেন না।

বাড়ীতে যদি সকলেই সত্য কথা বলেন, মিছে কথা বলা ঘৃণা করেন, অতি অল্প দিনের মধ্যে ছেলেদেরও সে রকম রুচি হয়ে যাবে। সেজন্যই আমি তোমাদের পূর্ব্বে বিশেষ ভাবে বলেছি যে, বাড়ীটা ছেলেদের পক্ষে অত্যন্ত মনোরম ও আদর্শ স্থান করে তুলতে হবে। ছোট ছেলে মেয়েদের সঙ্গে ব্যবহারে আমাদেরও যথেষ্ট ত্রুটি আছে বলে মনে হয়। বাড়ীতে কি স্কুলে, প্রত্যেক মা বাপ কি শিক্ষক, সর্ব্বদা ছেলেদের প্রতি বিশ্বাস রাখবেন।

সরোজ। কিন্তু আমরাত মা ঠিক বিপরীত করে থাকি। বাড়ীতে কোন রকমের কোন অনিষ্ট হলে, কোন জিনিষ ভেঙ্গে গেলে, কি হারিয়ে গেলে, অথবা কোন রকমের কোন গোলমাল হলে, প্রথমেই ছেলেদের ধরে থাকি। সন্দেহ করতে, প্রথমেই ছেলেদের সন্দেহ করে থাকি।

মা। সেটা ভয়ানক দোষ। বরাবর একজন লোককে সন্দেহের চক্ষে দেখলে পর, সে ভাল থাকলেও খারাপ হয়ে যাবে। যে ছেলের মনে এ ধারণা জন্মেছে যে, তাকে কেহ বিশ্বাস করে না, তার কাজ কেহ পছন্দ করে না, ভাল মন্দ সত্য মিথ্যার প্রতি সে নিতান্ত উদাসীন হয়ে থাকে। সে ছেলেকে ভাল করে তোলা, বড় শক্ত। বিশেষ কারণ ছাড়া, কোন দিন কোন কাজের জন্য ছেলেকে সন্দেহের চক্ষে দেখা উচিত নহে। প্রত্যেক ছেলে মেয়েকে বেশ বুঝতে দেবে যে, তার উপর তার পিতা

মাতা ও শিক্ষকের খুব বিশ্বাস আছে। সে যা বলে, তার পিতা মাতা ও শিক্ষক তা সত্য বলে গ্রহণ করে থাকেন। এ রকম ভাবে বল্লে পর, ছেলেদের মধ্যে আত্মসম্মান-জ্ঞান জন্মে যায়, এবং তারা সহজে মিথ্যাবাদী হয়ে, পিতামাতা কি শিক্ষকের নিকট লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতে ইচ্ছা করে না।

লীলা। মা তোমার কথামত ছেলেদের শেখান যে বড় কঠিন ব্যাপার দেখতে পাচ্ছি।

মা। হঁা, লীলা, আমি ত আগেই বলেছি, আমার শিক্ষা উপদেশের শিক্ষা নয়। বই মুখস্থ করায়ে শিক্ষা দেওয়া নয়। ছেলেদের মানুষ করতে হলে, শুধু বক্তৃতা দিলে চলে না, রাশি রাশি উপদেশপূর্ণ বই পড়তে দিলে কাজ হয় না। প্রত্যেক মা বাপ, শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী ছেলে মেয়েদের হাতে ধরে চালিয়ে নেবেন, নিজে করে এবং ছেলেদের দ্বারা করিয়ে ছেলেদের শিখিয়ে নেবেন। তাতেই তারা শিখবে। কথায় ও কাজে মিল থাকা চাই। 'মিছে কথা বলা বড় দোষ' দিন রাত ছেলের কাণে এ মন্ত্র দিলে উপকার হয় না। ছেলেদের সঙ্গে যারা ব্যবহার করেন তাঁদের সকলকেই সত্যবাদী হতে হ'বে, যেন তাঁরা নিজের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে ছেলেদের বলতে পারেন 'এই দেখ, আমরা কখনও মিছে কথা বলিনা, লোককে প্রতারণা করা ঘৃণা করি, তুমিও মিছে কথা কখনও বলো না।'

সরোজ। মা, আমার মনে হয় এ রকম শিক্ষা এখন

আমাদের দেশে দরকার হয়ে পড়েছে। আমাদের ছেলে মেয়েরা ঢের ভাল কথা জানে, কিন্তু জীবনে ভাল কাজ বড় একটা করতে পারে না। আচ্ছা মা, যদি কোন কারণে ছেলেদের উপর সন্দেহ হয়, তবে কি করা যেতে পারে?

মা। কেন, বেশ আস্তে আস্তে, আদর করে ঘটনাটা কি, ছেলেদের জিজ্ঞেস করে নেবে। হঠাৎ চোখ লাল করে ধমক দিয়ে উঠলে পর, ছেলেরা ভয়ে সত্যকথা গোপন করে মিছে কথা বলতে চায়। দেখ সরোজ, আর একটী কথা তোমরা বিশেষ ভাবে মনে রাখবে। উৎসাহ উত্তেজনা ছাড়া আমাদের কোন বৃত্তিই ফুটতে পারে না। মিছে কথা বললে যেমন শাস্তি দিতে হয়, সত্য কথা বললেও তেমনি তার পুরস্কার দিতে হয়। উৎসাহ চাই, সত্য কথা বলে যদি মা বাপের কাছে ছেলেরা উৎসাহ না পায়, তবে সত্য কথা বল্‌বার জন্য ছেলেদের বিশেষ আকর্ষণ না হওয়ারই কথা। আমেরিকার জর্জ ওয়াশিংটনের ছেলে বেলার ঘটনাটিত তোমরা বোধ হয় জান।

লীলা। মা, তুমি কি সেই চেরী গাছ কাটার কথা বলছ?

মা। হাঁ লীলা, একবার মনে করে দেখ দেখি, ওয়াশিংটনের পিতা কি রকম ভাবে সত্যবাদিতার জন্য ছেলেকে উৎসাহিত করে ছিলেন। এ জন্যই ত বলি, আদর করে দেওয়া যায়, শাসনও করা যায়।

লীলা। তুমি দেখি, মা বাপের প্রাণান্ত করে ছাড়বে।

যত অপরাধ শুধু মা বাপের ঘাড়ে চাপাচ্ছ। তোমার উপদেশ মত কাজ করতে গেলে মা বাপের পা ফেলবার সাধ্যি নাই।

মা। হাঁ লীলা তাইত। তুমি কি মনে কর, মা বাপ যদি পরিবারটীকে একটা নরককুণ্ড করে রাখেন, সে পরিবারে ছেলেরা কখনও মানুষ হতে পারবে। ছেলেরা মা বাপের দোষ শিখবে না, সে দিকে তারা দৃষ্টি করবে না, এও কি কখনও সম্ভব?

সরোজ। মা, এখন অন্য গুণের বিষয় দু'একটা কথা বল।

মা। অন্য কি গুণ জানতে চাও?

সরোজ। ভদ্রতা ও ন্যায়পরতা বিষয়ে কিছু বল।

মা। আগে ভদ্রতা শিক্ষা বিষয়ে কয়েকটা কথা বলে, পরে ন্যায়পরতা বিষয়ে তোমাদের বলছি।

লীলা। ভদ্রতা ও কি ছেলেদের শেখাতে হয়?

সরোজ। সে কি বলিছিস, লীলা? ভদ্রতা শেখাতে হয় না? একটা ছেলে নিয়ে কি আমরা কেহ কোন ভদ্র সমাজে যেতে পারি? একজন ভদ্রলোক বাড়ীতে এলে, তাঁর সঙ্গে কি শান্ত ভাবে দু'একটা কথা বলতে পারি? কথা বলবার সময়, কোন ছেলে কাপড় টানে, কেহ বা চীৎকার করে, কেহ বা খাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠে, কেহ বা ভদ্র লোকটীর গায়ে লাফিয়ে উঠতে চায়।

মা। সত্যি লীলা, ছেলেদের যে রকম অবস্থা. বড় দুঃখের কথা, আমরা তাদের কোন ভদ্রসমাজে নিয়ে যেতে

পারি না। এমন কি, দেখা যায়, বাড়ীতে কোন ভদ্রলোক এলে, অথবা কাহাকে খেতে বল্লে, ছেলেদের জন্য আলাদা একটা বন্দোবস্ত করতে হয়। কোন একটা কিছু দিয়ে হয়ত তাদের বাড়ীর বের করে দিতে হয়, অথবা কোন একটা খেলায় তাদের আটকিয়ে রাখতে হয়, নিতান্ত পক্ষে তাদের ঘুম পাড়িয়ে হলেও রাখতে হয়।

লীলা। এ রকম ঘটনা ত প্রতিগৃহে দেখতে পাই, তা কি করা যায়?

মা। ওটা কি শিক্ষার দোষ নয়?

সরোজ। ছেলেরা যে রকম অনর্থ করে, তাদের ঐ রকম ভাবে না রাখলে ত হয় না।

মা। আচ্ছা, তাদের যদি ঐ রকম ভাবে রাখ, কোন সভা সমিতিতে যদি লয়ে না যাও, কোন এক ভদ্রলোক বাড়ীতে এলে ছেলেদের বাড়ীর বের করে দাও, তবে তারা ভদ্রতা শিখবে কোথায়? কি করে লোকের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয়, কি করে সংযত হয়ে, ভদ্র সমাজের নিয়ম রক্ষা করে চলতে হয়, তা শিখবে কি করে?

লীলা। তবে কি করা যায় মা?

মা। আগেইত বলছি, বরাবর ছেলেদের সঙ্গে সঙ্গে রাখবে এবং নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারা তাদের ভদ্রতা শেখাবে। একজন ভদ্রলোক এলে কি রকম ভাবে চলতে হয়, কি রকম বিনয় ও নম্রভাবে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে হয়,

তাদের দেখাবে। ছেলেদের সঙ্গে তোমরা নিজেরা বরাবর ভদ্র ব্যবহার করবে। না হয়, তারা ভদ্রতা শিখবে কোথায় ? ছেলেরা কোন একটা জিনিষ এনে দিলে, বেশ হাসি মুখে বিনয় সহকারে গ্রহণ করো। প্রথম প্রথম একটু বিশেষ সাবধানতার সহিত তাদের চালালে, তারা শেষে নিজেরা সকলের সঙ্গে বেশ ভদ্রতার সহিত ব্যবহার করতে শিখবে। শুধু আগন্তুক ভদ্র লোকের সহিত ব্যবহারের সময়, কি সভা সমিতিতে, তাদের দিকে দৃষ্টি রাখবে, এমন নয়। অনেক সময় দেখা যায়, ছেলেরা বাড়ীতে যা মুখে আসে তাই বলে, যা ইচ্ছা তাই করে, সারাক্ষণ হাঙ্গামা ও গোলমাল করে বাড়ীটাকে একটা বাজার করে তুলে। বাড়ীতেও বেশ শান্তভাবে থাকতে এবং পরিবারের সকলের সহিত বেশ ভদ্রতার সহিত ব্যবহার করতে শেখাবে। যে ছেলে পরিবারে ভদ্রতা শেখে না, পরিবারে কারো সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করতে জানে না, সে ছেলে সভা সমিতিতে কি অন্য বাড়ীতে অথবা কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করতে জানবে কেন ? তাই ছেলে বেলা হতে ভদ্রতা শেখাতে চেষ্টা করো।

এখন তোমদের ন্যায়পরতা বিষয়ে বলছি, শোন। এ দুটা গুণও ছেলেরা অল্প বয়স হতে শিখে। অল্প বয়স থেকে যাতে ছেলেরা পরের জিনিষে লোভ না করে, পরের ন্যায্য প্রাপ্য না রাখে, এ বিষয়ে শিক্ষা দিতে হবে।

। কি করে শেখাতে হবে মা?

মা। প্রথম উপায়, মা বাপ নিজেরা দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাবেন, নিজের যে জিনিষ নয়, সেটা তাঁদের তাঁরা নিজেরা রাখেন না। পরের জিনিষ নিজের কাছে থাকলে, সে জিনিষের যথাসম্ভব যত্ন তাঁরা নিয়ে থাকেন। এবং সময় মত যার জিনিষ তাকে ফিরিযে দেন। ছেলেরা যদি বরাবর দেখতে পায় যে পরিবারে মা বাবা পরের জিনিষ রাখেন না, পরের যাহা, সময় মত তাকে তাহা ফিরিয়ে দিয়ে থাকেন, তবে ছেলে মেয়েদেরও সে রকম স্বভাব দাঁড়িয়ে যাবে।

সরোজ। সে কি মা, পরের জিনিষ কি কেউ না নিয়ে পারে? এক পরিবারের মধ্যে থাকলে একজনকে অন্য জনের জিনিষ প্রায়ই ব্যবহার করতে হয়।

মা। সরোজ, তুমি আমার উদ্দেশ্য বোঝ নি। আমরা সাধারণতঃ কী দেখ্‌তে পাই? আমি হয়ত তোমার একটা জিনিষ নিয়ে ব্যবহার করছি, তুমি তা মোটেই জান না। তুমি সেটা খুঁজে খুঁজে অস্থির হয়ে পড়েছ। হয়ত তোমার একটা জিনিষ আমি ব্যবহার করতে এনেছি, আর সেটা ফিরিয়ে দিচ্ছি না, যেমন তেমন করে ইচ্ছামত, আমার নিজের জিনিষের মত ব্যবহার করছি। পরিবারে কেহ কারো জিনিষ ব্যবহার করবে না, বা করা উচিত নয়, তা আমি বলছি না। তবে আমরা সাধারণতঃ এ রকম দৃষ্টান্তই বেশী দেখতে পাই। এ রকম দৃষ্টান্ত ছেলেদের পক্ষে মঙ্গলজনক

বলে মনে হয় না। তাদের বেশ পরিষ্কার করে বুঝতে দেওয়া উচিত, কোন্ জিনিষটা তার নিজের, কোন্ জিনিষটা পরের এবং তার নিজের জিনিষটা কি ভাবে ব্যবহার করবে, পরের জিনিষটাই বা কি ভাবে ব্যবহার করবে। অনেক সময় দেখা যায়, পরিবারে একটী ছেলে হয়ত অন্য এক ছেলের একটা খেলনা ভাঙ্গতে আরম্ভ করেছে, খেলনাটা তার হাত ছাড়া করবার চেষ্টা করলেই, সে কেঁদে ওঠে। এ অবস্থায় মা কি পরিবারের অন্য কেহ বলে থাকেন 'কি হবে থাক, ছেলে মানুষ খেলুক, ওটাত অন্য কারো নয়। বাড়ীর লোকেরইত জিনিষ। খেল্না, এক ছেলে না এক ছেলে ত, ভাঙ্গবেই। ছেলেকে কাঁদিয়ে দরকার নেই। খেলনাটা নিয়েছে একটু খেলুক, কিছুক্ষণ পরে ভুলে যাবে, তখন না হয় খেলনাটা লুকিয়ে রেখে দেওয়া হবে।' এ রকম ভাবে অনেকেই ছেলেদের অন্যায় আব্দারের প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন।

লীলা। আচ্ছা মা, এ অবস্থায় তুমি কি করতে বল?

মা। কেন ছেলেকে বেশ বুঝতে দেবে যে, সে জিনিষ তার নয়। যার জিনিষ সে না বল্লে, তার সেটা নেবার কোন অধিকার নেই। যার জিনিষ তার অনুমতি নিয়ে ব্যবহার করতে হবে। বাড়ীর লোকদের জিজ্ঞাসা করে তাদের কোন জিনিষ ব্যবহার করা আমরা আবশ্যক মনে করি না এবং ছেলেদেরও সে ভাবে শিক্ষা দেই না। এতে ফল হয়, ছেলেরা আপন পর ভেদ করতে শেখে না। পরের

জিনিষ হাত করে বসে। নিজের বলে দাবি করে। অনেক সময় দেখা যায়, মা ছেলেকে কোন বাড়ীতে বেড়াতে নিয়ে গেলে, ছেলে সে বাড়ীর জিনিষের উপর দাবি করে বসে। সে বাড়ীর ছেলের সঙ্গে জিনিষ নিয়ে কাড়াকাড়ি হয়, শেষটা মাকে ভারি লজ্জিত হতে হয়। এমনও দেখা যায়, একজনের হয়ত একটা জিনিষ নিয়ে এসেছে, সেটা আর ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে না, অথবা এমন অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, সেটা আর কাজে লাগান যাবে না।

সরোজ। আচ্ছা আর কি উপায় আমরা গ্রহণ করতে পারি।

মা। অনেক সময়, কোন একটা জিনিষ কোথাও কুড়িয়ে পেলে বা অন্য কেহ, কোন জিনিষ কাজে লাগবে না বলে ফেলে দিলে, আমরা সেটা ছেলেদের হাতে দিয়ে, খেলতে বলে থাকি।

লীলা। তাতেও কি দোষ হয়ে থাকে মা?

মা। দোষ হয় বই কি। তাতেও পরের জিনিষে লোভ জন্মে থাকে। ছেলেরা যদি দেখতে পায়, অন্য কেহ কোন একটা জিনিষ হারিয়ে ফেল্লে, সেটা সে যদি পায়, সেটা তার হবে, এবং সে ইচ্ছা মত ব্যবহার করতে পারবে, তবে তার মনে এ ইচ্ছাটা হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক যে, লোকেরা জিনিষ হারিয়ে ফেলুক, আর সে তাহা খুঁজে পাক। অন্যের কাছে কোন একটা সুন্দর জিনিষ দেখলে, সে হয়ত মনে

মনে ভাববে 'আহা! জিনিষটা যদি সে হারিয়ে ফেলে, আর আমি যদি তাহা পাই, তবে বেশ হয়।' অনেক সময় দেখা গেছে, কোন কোন ছেলে ইচ্ছা করে অন্যের খেলনা লুকিয়ে রাখে এবং কিছু দিন গেলে পর বের করে এনে বলে 'কুড়িয়ে পেয়েছি।' তাই কুড়ান জিনিষেও ছেলেদের কোন দাবি করতে দেওয়া উচিত নয়। অন্য পক্ষে মালিককে খুঁজে বের করতে, তাকে উৎসাহিত করা উচিত। বস্তুতঃ এই ভাব থেকেই আমাদের দেশে একটা রীতি আছে যে, কোন লোক যদি কোথাও কোন জিনিষ কুড়িয়ে পায়, সেটা সে নিজে নিতে পারে না, মালিক দাবি না করলে, কোন গরীবকে কিম্বা অন্য কোন সৎকাজে দিতে হয়।

লীলা। পরের পরিত্যক্ত জিনিষ ব্যবহার করতে দিলে কি দোষের সম্ভাবনা, মা?

মা। তা'তে ছেলেদের আত্মসম্মানের দিকে দৃষ্টি থাকে না। বরাবর পরের ছেঁড়া, ভাঙ্গা জিনিষ ব্যবহার ক'রে ক'রে, পরের ত্যাজ্য জিনিষের প্রতি ঘৃণার ভাব ছেলেদের মন হতে উঠে যায়। ছেলেদের বুঝতে দেওয়া উচিত, তার যে জিনিষ নাই, সে জিনিষ ছাড়া, তাকে থাকতে হবে। পরের ব্যবহৃত পরিত্যক্ত জিনিষ, তার ব্যবহার করা উচিত নয়। অন্যের পরিত্যক্ত জিনিষের প্রতি তার একটা ঘৃণা থাকা উচিত। অনেক সময় গরীব মা বাপ, প্রতিবেশী মধ্যবিত্ত

পরিবারের ছেলেমেয়েদের পরিত্যক্ত, ভাঙ্গা নষ্ট খেলনা ইত্যাদি আপন ছেলেদের দিয়ে থাকেন। এতে কিন্তু ছেলের প্রকৃতি বড় নীচ হয়ে উঠে বলে মনে হয়।

সরোজ। মা, তোমার কথা শুনে বড়ই আনন্দ হচ্ছে। অনেক কাজের কথা তোমার কাছে শিখলুম। এখন স্কুল কলেজে, পৃথিবীর কত কাণ্ডকারখানার কথা পড়ান হয়, কি করে বেলুন শূন্যে উঠে, কি করে রেলগাড়ী চলে, কি করে জোয়ার ভাঁটা হয়, কি করে দিন রাত হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি কত সৃষ্টিরহস্যই শেখান হয়, অথচ কি করে আমাদের ছেলে দের মানুষ কর্‌তে হয়, কি করে তাদের শরীর সুস্থ রাখতে হয়, সে সব বিষয়ে কোথায়ও কিছু শোনা যায় না।

মা। শুধু কি তাই, সরোজ? ছেলেদের শারিরীক অসুখ বিসুখের জন্য আমাদের কত ভাবনা। ছেলের একটু অসুখ দেখা দিলে, আমরা কেমন অস্থির হয়ে উঠি; জ্বর আস্‌বে ভয়ে কুইনাইন খাইয়ে দি, পেটের অসুখ হবে ভয়ে, খেতে দিই না, সর্দ্দি লাগবে ভয়ে, নাইতে দিই না। কত সাবধানতা! কিন্তু ছেলে যদি মিছে কথা বলতে শেখে, অথবা অবাধ্য হতে চায়, আমরা তার প্রতিকারের কোন চেষ্টা করি কি? স্বাস্থ্যের জন্য আমরা যে টুকু করি, নীতি-শিক্ষার জন্য যদি তার সিকি টুকুও করি, অনেকটা হয়। শারিরীক ব্যাধিটা আমাদের নিকট যতটা লাগে, নৈতিক ব্যাধিটা ততটা লাগে না। অথচ শারিরীক ব্যারামে রোগী

ঔষধ খেয়ে, সময়ে ভাল হয়ে থাকে কিন্তু নৈতিক ব্যারামের ফল সারা জীবন ভুগতে হয়। নৈতিক ব্যাধির ঔষধ নাই তা নয়। তোমরা দেখছ, ঔষধ আছে। তবে সময় মত ঔষধ প্রয়োগ হয় না, কেননা এখানে শুধু প্রেসক্রিপশনে চলে না। আমাদের জীবন দিয়ে খাট্‌তে হয়, তাই আমরা উদাসীন। দেখ সরোজ, আরও একটা বিষয়ে আমাদের বিশেষ মনোযোগী হওয়া উচিত। ছেলেদের প্রতি আমাদের কখনও অন্যায় ব্যবহার করা উচিত নয়।

লীলা। তার মানে কি মা?

মা। ছেলেদের যেমন অন্যের কোন জিনিষে লোভ করতে দেওয়া উচিত নয়, অন্যের কোন জিনিষ পেলে যেমন তাকে তা ফিরিয়ে দিতে উৎসাহিত করা উচিত, তেমনি অন্য কা'কেও তাদের জিনিষে লোভ কর্‌তে দেওয়া উচিত নয়। বিনা কারণে তাদের কোন জিনিষ অন্যকে দেবে না। তাদের জিজ্ঞেস না করে, তাদের জিনিষ অন্য কা'কে ব্যবহার করতে কখনও দিওনা অথবা নিজেরাও করো না। কোন কোন সময় দেখা যায় হয়তঃ ছেলে তাহার নিজের হাতের খাবারটা তাড়াতাড়ি খেয়ে, অন্য ছেলের হাতের খাবারটা পাবার জন্য জিদ করে। যদি। সে ছেলে তার খাবার হতে ভাগ দিতে না চায়, মা জোর করে খাকিকটা ভেঙ্গে দিয়ে থাকেন। এ রকম ব্যবহারে কিন্তু ছেলেরা বড় গোলে পড়ে যায়। ন্যায় অন্যায়ের তফাত বুঝতে পারে না।

একটী ছেলের খিদে পেয়েছে, সে জন্য হয়ত সে খুব

কাঁদছে, মা অন্য কাজে ব্যস্ত আছেন, খাবার দিতে সময় পাচ্ছেন না, ছেলের কান্নাতে অস্থির হয়ে, মা ছেলেকে দু'একটা চড় দিয়ে শান্ত করে দিলেন। এ রকম ঘটনাও আমরা দেখতে পাই। এতেও কিন্তু ছেলেদের ন্যায়-অন্যায় বিচার বিভ্রাট ঘটে। ন্যায়ের পুরস্কার, অন্যায়ের শাস্তি, এ দুটা না দেখলে পর, ছেলেরা ন্যায়পরতা গুণ শেখে না, এবং নিজেরা ন্যায়পরায়ণ হতে পারে না। ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন অন্যায় কাজ না করলে, ছেলেকে শাস্তি দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, ছেলের কোন অন্যায় করবার ইচ্ছা ছিল না, ঘটনাক্রমে একটা অন্যায় হয়ে পড়েছে, মা একটুও বিবেচনা না করে, ছেলেকে দু'চার ঘা লাগিয়ে দিলেন। দুজন ছেলে ঝগড়া করে মার কাছে নালিশ করলে, মা, অনেক সময় কে দোষী, বিচার না করে, বড় ছেলেকে খুব বকে দেন। ফলে, ছোট জনের অন্যায় কাজে প্রশ্রয় দেওয়া হয় এবং বড় ছেলে ন্যায় ব্যবহারে বাধা পায়।

সরোজ। আচ্ছা, এ রকম অবস্থায় কি করা যেতে পারে?

মা। ছেলেদের সামনে বরাবর ন্যায়ের সম্মান করবে। অন্যায়ের শাস্তি দেবে। পক্ষপাত কখনও তাদের দেখতে দেবে না। অনেক সময় দেখা যায়, কোন ছেলে তার খেলনাটা হারিয়ে ফেলে, অন্যেরটা নিয়ে কাড়াকাড়ি আরম্ভ করেছে, অথবা অন্যের খেলনা লয়ে খেলতে গিয়ে, খেলনাটা ভেঙ্গে ফেলেছে, কি হারিয়ে এসেছে। এ অবস্থায় তোমাকে

যদি বিচার করতে হয়, তুমি যার জিনিষ তাকে দেবে। ভাঙ্গা খেলনার পরিবর্ত্তে, যে ভেঙ্গেছে, তার ভাল খেলনাটা, যার খেলনা ভেঙ্গেছে, তাকে দেবে। যদি কোন অপরাধ করে থাকে, বিচার করে শাস্তি দেবে। যদি কোন অপরাধ না করে থাকে, তবে কখনও তার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করবে না। এ ভাবে ছেলেদের শিক্ষা দিলে পর তাদের মধ্যে অতি সহজে ন্যায়-অন্যায়-বিচারশক্তি ফুটে উঠবে। এবং সততা ও ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে তাদের পরিষ্কার জ্ঞান জন্মিবে। এখন আমি আর একটী গুণের কথা তোমাদের নিকট বলছি, শোন।

লীলা। সে কি গুণ মা?

মা। সে হচ্ছে সাহস। আমি সাহস বিষয়ে তোমাদের দু'একটা কথা বলব মনে করেছি। অন্যান্য গুণের মত ইহাও মনুষ্যত্বের একটী বিশেষ লক্ষণ।

সরোজ। সত্যি মা, সাহস মনুষ্য জীবনের অতি আবশ্যকীয় একটী গুণ। শুধু জ্ঞান থাকলে কিছু হয় না। সাহসের অভাবে, অনেক সময়, অনেকেই ভাল কাজ করেতে পারেন না। আমার বোধ হয়, প্রত্যেক গুণের পেছনে সাহস থাকা বড় আবশ্যক।

মা। সরোজ, তুমি ইহার আবশ্যকতা বেশ বুঝেছ, মনে হচ্ছে।

সরোজ। হাঁ মা, আবশ্যকতা বেশ বুঝি। কিন্তু যে রকম

বুঝি সে রকমও ছেলেমেয়েদের গড়ে তুলতে পারি না, এই দুঃখ। এই দেখনা, আমার খোকা কেমন দিন দিন ভীরু হয়ে যাচ্ছে — সন্ধ্যা হলে ঘরের বাহিরে একা পা দিতে চায় না, লোকের সঙ্গে মুখ ফুটে কথা বলতে পারে না, কোন একটা কাজ সাহস করে করতে পারে না।

মা। সরোজ, আমাদের ছেলেমেয়েরা ভারি ভীরু। শুধু ছেলেমেয়েরা বলি কেন, যুবক যুবতীরাই বা কোন্ সাহসী? আমাদের বদনাম আছে, আমাদের সাহস নাই, কোন কাজ করতে আমরা পারি না। বস্তুতঃ এখনকার দিনে আমরা প্রত্যক্ষ দেখতে পাই কি? অনেক সময় আমরা যা ভাল বুঝি, সাহস করে কাজে তা করতে পারি না।

সরোজ। আচ্ছা মা, এ রকম ভীরুতার মূল কোথায় বলতে পার কি? কেন আমাদের ছেলেমেয়েরা এত ভীরু হয়ে যাচ্ছে?

মা। সরোজ, কারণ খুঁজতে আমাদের বেশী দূরে যেতে হবে না। প্রত্যেক ঘরেই যথেষ্ট কারণ পাওয়া যাবে। আমরা ছেলেদের মধ্যে সাহস জন্মিতে দিই না। সরল ভাবে স্বাধীনতার সহিত কাজ করতে দিই না, তাতেই তারা এত ভীরু হয়ে উঠে। পূর্ব্বেই বলেছি, শিশু প্রকৃতি নিতান্ত সরল, তারা কুটিলতার ধার ধারে না, যাহা বুঝবে, তাহা করবে, যাহা দেখবে তাহা বলবে, ইহাই তাদের স্বভাব।

লীলা। হাঁ, মা, শিশুরা বেশ সরল, তাত জানি, ভীরু হয় কেন? সরল হলে কি ভীরু হতে পারে না?

মা। সরলতা ও সাহস যদিও এক নয়, কিন্তু সরলতা হতে সাহসের উৎপত্তি। সরল প্রকৃতির লোকের ভীরু হওয়া স্বাভাবিক, নহে কেন বলছি, শোন। ছেলেরা ফলাফল বিচার না করে, সরল ভাবে কাজ করে। ইষ্টানিষ্ট বিচার না করে, তারা যা করেছে, যা দেখেছে, সরল ভাবে প্রকাশ করে। ঐ রকম ব্যবহারে তারা যদি উৎসাহ পায়, তারা শেষে ফল বুঝেও, বাধা বিঘ্ন আশঙ্কা করেও, সত্য অনুসরণে বা সত্য প্রকাশে অথবা প্রতিজ্ঞা পালনে, কখনও বিচলিত হয় না। এখানেই সাহসের জন্ম। আমরাই ছেলেদের ভীরু করে থাকি, সরল ভাবে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতে দেই না। তাতেই তারা ভীরু হয়ে উঠে। নিজে কোন কাজ করলে, কি কোন কথা বল্লে আমরা তাদের বকে দিয়ে থাকি। স্বাধীন ভাবে তাদের কোন কাজ করতে উৎসাহ দিই না। সাহস হবে কি করে? ছেলেদের যদি একটী আঙ্গুল কাটে বা আঙ্গুল পোড়ে, আমরা কোথায় তাদের সাহস দিয়ে উৎসাহিত না করে, আমরাই ভয়ে অস্থির হয়ে যাই। ছেলেদের ঘরের মধ্যে আটকিয়ে রাখবার জন্য, আমরা কত ফন্দি না এঁটে থাকি। কত ভূত প্রেত, জুজুর আবিষ্কার করে থাকি। ছেলে একটুখানি ঘরের বের হলে পর 'শেয়ালে কামড়াবে' 'পাগলে ধরবে' 'মা মারবে' ইত্যাদি কত অলীক কথাই বলে থাকি। অন্ধকার রাত্রে একটু বের হলে পর 'ওমা অন্ধকারে ভূত আছে' 'জুজু ধরে নেবে' কত কি বলি।

এই অকারণ ভূত প্রেতের সৃষ্টিতে, আমাদের ছেলেদের কি যে অমঙ্গল হয়ে থাকে, বলবার নয়। তারা নিজেরাই এক একটী ভূত প্রেত হয়ে, ঘরের কোণে বসে থাকতে ভালবাসে। ছেলে বেলার এই ভূতের ভয় জীবনে আর কখনও দূর করা যায় না। এই পাশের বাড়ীর রামরতনের বয়স এখন পঞ্চাশ বৎসর, অথচ সে এখনও রাত্রে একা বাড়ীর বের হতে সাহস করে না, ভূতের ভয়ে অস্থির।

সরোজ। আচ্ছা মা, ছেলেরা যে রকম অশান্ত প্রকৃতির এ রকম কোন একটা কৌশল উদ্ভাবন না করলে, তাদের যে ঘরে রাখা যায় না। কোন্ ছেলে কোন্ দিন, কোন্ দিকে ছুটে যায়, তার কি ঠিক আছে।

মা। এতেই সরোজ তোমাদের শক্তি বুঝা যাচ্ছে। তোমরা যে ছেলেদের শাসনে রাখতে পার না, তাহা বিলক্ষণ প্রমাণ হচ্ছে। এখন দেখ, সরোজ, ঠিক সময়ে ছেলেদের একটী সৎশিক্ষা না দেওয়াতে, কি অনর্থটা না হচ্ছে, কত মিছে কথা বলতে হচ্ছে, কত ফন্দি আঁটতে হচ্ছে।

লীলা। একটী কথা জিজ্ঞেস করতে ভুল হয়েছে মা। এই যে দিদি বল্লে, প্রত্যেক গুণের পেছনে সাহস থাকা আবশ্যক, তার মানে কি? সাহস ছাড়া কি অন্য গুণ থাকতে পারে না?

মা। সরোজ, তোমার কথা তুমিই লীলাকে বুঝিয়ে বল।

সরোজ। এত মোটা কথা তুই বুঝলি না, লীলা?

শোন, বুঝিয়ে বলছি। এই যে আমার খোকা বুলু, জানিস ত তার প্রকৃতি বড়ই সরল। যেখানে যেটা দেখবে, যেখানে যা করবে, তাকে জিজ্ঞেস করলেই সে ঠিক সেটা বলে দেবে।

লীলা। হাঁ, দিদি, সত্যিই ত। সেই দিন টেবিলের উপর একটা কাচের গ্লাস রেখে দিয়েছিলুম। বুলু হয়ত মনে করেছিল, সেখানে কিছু খাবার আছে, টেবিলের উপর থেকে গ্লাস নামাতে গিয়ে, গ্লাসটা ভেঙ্গে ফেলেছে। কিছুক্ষণ পরে সে নিজেই এসে আমাকে বল্লে "মাসীমা, গ্লাস ভেঙ্গে ফেলেছি।"

সরোজ। এটা যে কেবল বুলুর বিশেষ গুণ, তা নয়। ছোট ছেলেরা সকলেই এ রকম করে থাকে।

লীলা। তাই যদি হবে, তবে আর সাহসের দরকার কি? বুলু যে সরল ভাবে আপনার দোষ স্বীকার করলে, এটা কি একটি গুণ নয়?

মা। লীলা, তুমি সরোজের কথা ঠিক বুঝতে পারলে না। সরল ভাবে ব্যবহার করা ছেলের প্রকৃতি। কিন্তু নানা কারণে ছেলেরা আপন প্রকৃতি অনুসরণ করতে পারে না। নানা ভয়, নানা প্রলোভন এসে বাধা দেয়। সে সব অতিক্রম করবার জন্য, সাহস পেছনে থাকা চাই। একটী ছেলে বেশ বুঝতে পারলে, সত্য কথা বলা ভাল, কিন্তু একদিন একটী গুরুতর অন্যায় করে যদি ভয়ে অন্যাটা স্বীকার না করতে পারে, তবে তার 'সত্য কথা বলা ভাল' এই জ্ঞান থাকার

কি লাভ। শুধু জ্ঞান কোন কাজে আসে? তাই সরোজ বলছে, প্রত্যেক গুণের পেছনে সাহস থাকা দরকার।

লীলা। সাহসও কি একটা গুণ নয়, সেটাও কি ছেলেদের প্রকৃতিগত নয়?

মা। হাঁ লীলা, সাহস একটা গুণ বই কি। সেটা বাইরের কিছু নয়, মানুষের প্রকৃতিগতই বটে। সাহস একটা মানসিক শক্তি বিশেষ। প্রত্যেক শক্তি যেমন চালনার দ্বারা পুষ্ট হয়, সাহসও তেমনি, যতই সাহসের কাজ করবে ততই সাহস বেড়ে যাবে। যে ছেলে, যাহা বুঝে সর্ব্বদা তাহা যদি করতে পারে, উত্তর কালে সে সাহসের সহিত পৃথিবীর সঙ্গে সংগ্রাম করতে পারবে। সে রকম প্রকৃতির ছেলেরাই দেশকে উপর দিকে তুলে ধরে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা ছেলেমেয়েদের মধ্যে সাহস জন্মিতে দিই না। এই যে বুলুর কথা বল্লে, তার যদি সাহস না থাকত, সে যদি বকুনি খাবার ভয় করত, তবে সে সরল ভাবে দোষ স্বীকার করতে কখনও পারত কি? গল্পে ও ইতিহাসে অসাধারণ সাহসিকতার দৃষ্টান্ত তোমরা পড়েছ। সাহস জীবনের উন্নতির পক্ষে বিশেষ দরকারী। এই সাহসের উপর ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাতীয় উন্নতি নির্ভর করে। যে ছেলে যাহা ভাল বুঝে, তাহা যদি সাহস করে প্রকাশ করতে না পারে, সাহস করে ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করতে না পারে, তবে তার শিক্ষা কি শক্তির দ্বারা কি কাজ হতে

পারে? একটী সাহসের দৃষ্টান্ত বলি। তোমরা সকলেই শুনেছ, পরলোকগত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় অতুল সম্পত্তির মালিক ছিলেন। তাঁর পিতার মৃত্যুর পর নানা কারণে তাঁকে নিতান্ত বিব্রত হয়ে পড়তে হয়েছিল। পিতা দ্বারকানাথ মহাশয়ের বৃহৎ কারবার ছিল। তাঁর কারবার ফেল হয় এবং মহর্ষিকে প্রায় ৩০।৪০ লক্ষ টাকার দেনার দায়ে পড়তে হয়। কিন্তু তাঁর পিতা মূল্যবান কয়েকটা সম্পত্তির জন্য এমন এক দলিল করে গিয়েছিলেন যা'তে কারবারের দেনার জন্য কেহ তাঁর ঐ সম্পত্তির উপর হাত দিতে পারত না। সে দলিল নিয়ে মহাজন সভাতে তর্ক উঠে। ঐ দলিলের দাবি ছেড়ে দিলে, পাওনাদারগণের সমস্ত দেনা শোধ হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের সমস্ত সম্পত্তি হয়ত নিলাম বিক্রী করতে হবে। তিনি যদি দলিলের স্বত্ব বজায় রাখবার চেষ্টা করেন পাওনাদারগণের দেনা শোধ হয় না। একটা দাবি উত্থাপন করিলেই তাঁর পিতার অতুল সম্পত্তির অধিকারী হয়ে, দিব্বি স্থখে তিনি কাল কাটাতে পারেন। সকলেই মনে করেছিল, মহর্ষি দলিল বজায় রাখবার চেষ্টা করবেন। প্রিন্স দ্বারকানাথের পুত্র, সম্পত্তির মায়া পরিত্যাগ করে, পথের ভিখারী হয়ে দাঁড়াতে সাহস করবে, এটা কেহ বিশ্বাস করতে পারেনি। বস্তুতঃ অনেকেই দলিলটা যাতে বজায় থাকে, সে ভাবে কাজ করবার পরামর্শও দিয়েছিলেন। কিন্তু সত্যপ্রিয় মহর্ষি, পিতার অতুল

সম্পত্তির লোভ উপেক্ষা করে, পিতৃঋণ শোধের জন্য অসাধারণ সাহসের পরিচয় দিয়ে সকলকে স্তম্ভিত করেছিলেন। তিনি অকাতরে সমস্ত সম্পত্তি মহাজনের হাতে অর্পণ করিলেন। ঈশ্বর অবশ্য সৎসাহসের সাধুতার পুরস্কারও দিলেন — তিনি তাঁরই অতুল বিভবের অধিকারী থেকে, দেনাদারের সমস্ত দেনা শোধ করে, পরম সুখে কাল কাটিয়ে গেলেন। সত্য অনুসরণ করবার জন্য, ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করবার জন্য, ছেলেদিগকে বরাবর উত্তেজিত করবে। বিনা কারণে ছেলেদের যতই ভয় দেখাবে, যতই তাদের সৎকাজের বাধা দেবে, ততই তারা ভীরু হয়ে যাবে। এ সম্পর্কে আমাদের দেশে অতি সত্য পুরাতন এক কথা আছে :—

ভয় করিলে ভয় বাড়ে, নিদ্রা বাড়ে শয়নে।
মন্থনে নবনী বাড়ে, আহার বাড়ে ভোজনে।

অনেক বাড়ীর ঝি চাকর, এমন কি অনেক বুড় মানুষও ছেলেরা যদি হঠাৎ কোন অনিষ্ট করে বসে, তবে অকারণ ভয় দেখিয়ে তাদের প্রাণ শুকিয়ে দেয়। ছেলেরা যদি কিছু ভাঙ্গে অনেকেই বলে থাকেন, 'কি সর্ব্বনাশ, এমন সুন্দর জিনিষটা ভেঙ্গে ফেল্লে? এখন যদি মা দেখেন, তবে মেরে হাড় গুড়ো করে দেবেন।' কেহ কেহ আবার বলে থাকেন "মাকে বলিস না, বল্লে মা বকবেন।" এ রকম ভাবেই আমরা ছেলেদের স্বভাব নষ্ট করে ফেলি।

সরোজ। আচ্ছা মা, আমাদের কি করতে বল।

মা। কেন কখনও ছেলেদের ভয় দেখাবে না। প্রত্যেক

সংকাজে বুক ফুলিয়ে সাহসের সহিত অগ্রসর হতে উৎসাহ দেবে। অন্যায় করলে পর, সাহসের সহিত অন্যায় স্বীকার করতে বলবে। এ রকম সাহস যদি তাদের মধ্যে জন্মায়ে দিতে পার, তবে মিথ্যা কথা প্রবঞ্চনা ইত্যাদি নানা দোষের হাত থেকে তাদের রক্ষা করতে পারবে। ভয় এক জিনিষ তাদের কাছে আসতে পারবে না। মহাবীর নেলসন সম্পর্কে একটী গল্প আছে, বলছি শোন। ছেলেবেলা একবার তিনি একা এক পাখীর অনুসরণ কর্তে কর্তে, বাড়ী ছেড়ে অনেক দূর গিয়ে পড়েছিলেন। বাড়ীর সকলে তাঁকে অনেক খোঁজ করেও বাহির করতে পারল না। তাঁর ঠাকুর মা অনেক জায়গা খুঁজে, অনেকক্ষণ পরে, শেষে এক নির্জ্জন মাঠে, একটা গাছের তলায় তাঁকে দেখতে পেলেন। তাঁকে দেখে কর্কশ স্বরে বলে উঠলেন, "হ্াঁরে ছোক্‌রা, তোর কি একটুও ভয় নেই? একলা কোন সাহসে এতক্ষণ পর্য্যন্ত এখানে বসে রয়েছিস, তোর ভয় করে না?" সরল শিশু, ঠাকুরমার কথার মানে না বুঝে, সরল ভাবে ঠাকুরমাকে জিজ্ঞেস করলে "ভয় কি রকম, ঠাকুর মা, বল না।" উত্তর কালে, উক্ত বালক অসীম সাহসী বীর পুরুষ হয়ে দেশর মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন। তাঁ'র সাহসের জন্য ইংলণ্ড আজ গৌরবান্বিত। উদ্ভিদ যেমন আলো, বাতাস ছাড়া বাড়তে পারে না, তেমন উৎসাহ না পেলে মানুষের কোন গুণ ফুটে উঠতে পারে না। সাহস বিশেষ রকম উৎসাহ চায়।

তোমরা জান, রাজ সরকার থেকে সাহসী ব্যক্তিকে বিশেষ ভাবে পুরস্কৃত করা হয়ে থাকে। বিলাতে এজন্য অনেক সভা সমিতি রয়েছে। সে সব সভা হতে, সাহসের জন্য বৎসর, বৎসর বিশেষ পুরস্কারের বন্দোবস্ত করা হয়ে থাকে।

লীলা। দিদি ঠিকই বলেছিল, প্রত্যেক গুণের পেছনে সাহস থাকা দরকার।

মা। আমি আর একটা নূতন কথা তোমাদের বলতে ইচ্ছা করি। যে গুণের কথা আমি এখন তোমাদের বলব ইচ্ছা করেছি, বঙ্গ-সমাজে, কি বঙ্গ-পরিবারে তাহা প্রায় দেখা যায় না।

লীলা। সে কি গুণ মা? তোমার সব কথাই নূতন।

মা। সে গুণ আত্মনির্ভর বা স্বাবলম্বন। ইহা মনুষ্যত্বের ভিত্তি। যার ভিতর এই গুণ নাই, সে কখনও সংসারে প্রকৃত মানুষ হয়ে দাঁড়াতে পারে না। মহাপুরুষের জীবনী পাঠ করলে দেখতে পাবে, এ গুণটা কি করে বেলুনের মত, তাঁদের, উপর দিকে তুলে নিয়েছে। আমাদের কৃষ্ণদাস পাল, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, রামমোহন রায় আমেরিকার এব্রাহেম লিন্‌কোলন, জেমস গারফিল্ড প্রভৃতি মহাপুরুষগণের জীবনে আত্মনির্ভর গুণ বিশেষ ভাবে দেখা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের সমাজে এ জিনিষটা কি. অনেকেই জানেন না।

সরোজ। সত্যি মা, এ গুণটা একেবারে নূতন, এ বিষয়ে আমরা কিছুই জানিনে।

লীলা। মা, গুণটা কি বুঝিয়ে বল না।

মা। যে গুণে মানুষ নিজের শক্তির উপর নির্ভর করতে শেখে-পরের সাহায্য ভিক্ষা না করে, পরের অনুগ্রহের অপেক্ষা না করে, নিজের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে, নিজের কাজ নিজে করে, আত্মনির্ভর সে-ই গুণ। স্বাবলম্বন মনুষ্য চরিত্রের বিশেষত্ব, যার আত্মসম্মান জ্ঞান নাই, আত্মমর্য্যাদার দিকে দৃষ্টি নাই, সে বরাবর প্রতি কাজে পরের মুখের দিকে চেয়ে থাকবে। পরের উপর নির্ভর করে থাকবে। ছেলেবেলা হতে, যে ছেলে এ ভাবে শিক্ষা পায়, বড় হলে, কখনও সে নিজের উন্নতি নিজে করতে পারে না। তাই প্রত্যেক পিতা মাতা ও শিক্ষকের কর্ত্তব্য, ছেলে বেলা হতে ছেলেদের আত্মনির্ভরশীল হতে শিক্ষা দেওয়া।

সরোজ। সে শিক্ষা কি করে দেওয়া যেতে পারে মা ?

মা। প্রত্যেক ছেলেকে এক একটা কাজের ভার দিও এবং সে কাজটা তাকে দিয়ে করিয়ে নিও। ‘পারি না’ কথা তাদের মুখে আনতে দিও না। তুমি প্রত্যক্ষ ভাবে কোন সাহায্য করো না, আবশ্যক বোধে দুএকটা সহজ উপায় বলে দিতে পার। তাদের নিজের কাজ গুলো, তাদের দিয়ে করিয়ে নিও। তাদের কাপড় চোপর তারা নিজেরা ধুয়ে শুকাতে দেবে এবং নিজেরা তুলে রাখবে। তাদের জিনিষ পত্র, বই ইত্যাদি তারা হাতে করে নিয়ে যাবে, হাতে করে বাড়ী এনে ঠিক জায়গায় গুছিয়ে রাখবে। ধনী পরিবারে, ছেলেরা এ সব কাজ নিজেরা করতে বড়

লজ্জা মনে করে। এ ভাবে ছেলেবেলা হতে কাজ করতে করতে ছেলেরা নিজ শক্তির উপর নির্ভর করতে শিখবে। পরের মুখের দিকে না তাকিয়ে, নিজের কাজ নিজে করতে চেষ্টা করবে। ছেলেদের হাঁটবার বয়স হলে, বরাবর তাদের কোলে করে রাখলে, যেমন তারা হাঁটতে পারে না, তেমনি যদি প্রতি কাজে ছেলেকে তোমার উপর নির্ভর করে রাখ, ঝি চাকরের সাহায্য ছাড়া, তা'কে কোন কাজ করতে না দাও, সে কখনও নিজের উপর নির্ভর করে চলতে শিখবে না, সর্ব্বদা কা'রো উপর নির্ভর করে চলতে চাবে। আত্মসম্মান-জ্ঞান তার থাকবে না এবং জীবনে সে উন্নতি লাভ করতে পারবে না। লীলা, তুমি আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট গারফীল্ডের জীবনচরিত খানি কি পড়নি ?

লীলা। হাঁ পড়েছি, বেশ সুন্দর বইত। কেন মা, সে কথা জিজ্ঞেস করলে? তিনি না কুড়ে ঘর হতে, নিজ চেষ্টায় আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট হয়ে, রাজ প্রাসাদের অধিকারী হয়েছিলেন ?

মা। তুমি জান, গারফিল্ড বড় গরীব ছিলেন, তাঁর ছেলেবেলা বড় দুঃখে কেটেছে। গারফিল্ড যে বাড়ীতে চাক্‌রী করতেন, সে বাড়ীর একটী মেয়ে, এক রাত্রে গারফিল্ডকে 'মাইনের চাকর' বলে বিদ্রূপ করেছিল।

লীলা। হাঁ, মা, জানি বই কি ? তার জন্যই ত গারফিল্ড পরদিন সকালে চাক্‌রী ছেড়ে চলে যান। তাঁর অপরাধ তিনি রাত্রে বাতি জ্বালিয়ে পড়ছিলেন।

মা। গারফিল্ড কি বলেছিলেন মনে আছে?

লীলা। সব কথা মনে নেই, তবে এ কথা বেশ মনে আছে, গারফিল্ড বলেছিলেন — 'মাইনের চাকর', বটে! তবে আমি আর 'মাইনের-চাকর' হয়ে থাকব না। আমি জানি, আমি নিশ্চয় এ অবস্থার উপর উঠতে পারব। মাহিনা দিয়ে নিজে চাকর রাখতে পারি কিনা, একবার দেখব।"

মা। আমাদের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামমোহন রায় মহোদয়গণের জীবনীতেও এরকম আত্মনির্ভরগুণের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয় এক কথায় ৫০০৲ টাকার চাকরী ছেড়ে দিয়ে বলেছিলেন—'গরীবের ছেলে গরীব হয়ে থাকব, আলু পটল বেচে খাব, যে চাকরীতে সম্মান নেই এমন চাক্‌রী করব না।' গারফিল্ড কি বিদ্যাসাগরের যদি আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান না থাকত, তবে তাঁরা এত সহজে অমন সুবিধার চাকরী ছাড়তে পারতেন না। যদি নিজের শক্তির উপর বিশ্বাস না থাকত, নিজের অবস্থার উন্নতি নিজে করতে পারবেন, এ সাহস গারফিল্ডের যদি না থাকত, তিনি কখনও সাহস করে বলতে পারতেন না — 'আমি নিজেই মাইনে দিয়ে চাকর রাখব।' উন্নতিশীল শিক্ষিত জাতির মধ্যে এই গুণটা বিশেষ ভাবে দেখতে পাবে। এ গুণে ইয়োরোপ ও আমেরিকার কত দীন দুঃখী ক্রোরপতি হয়েছে, কত মূর্খ পণ্ডিত হয়েছে, ইতিহাস পড়লে জানতে পারবে।

সরোজ। সত্যি মা, এ গুণটী আমাদের দেশে বড়

দেখা যায় না। পরের উপর নির্ভর করে থাকতে পারলে, আমাদের দেশের লোকেরা নিজের উপর আর নির্ভর করতে চায় না।

মা। সরোজ, যদি ছেলেদের সাহস থাকে, যদি তারা আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠে, তবে তাদের জন্য তোমাদের ভাবতে হবে না। তাদের পথ, তারা বের করে নেবেই। নিজের পায়ের উপর না দাঁড়াতে পারলে, কোন জাতি কি কোন ব্যক্তি উন্নতি লাভ করতে পারে না। আরও একটা কাজ তোমরা করতে পার।

লীলা। কি কাজ মা?

মা। ছেলেদের সামনে বরাবর উচ্চ আদর্শ ধরিও।

সরোজ। কি রকম মা।

মা। দেশের মহাপুরুষগণের আদর্শ তাদের সামনে ধরিও। মহাপুরুষদের চরিত্রের কথা বলে, তাদিগকে উৎসাহিত করো। সময় সময় দেশের মহাপুরুষদের ছবি তাদের হাতে দিও। ছবি দেখে ছেলেদের এক দিকে যেমন আমোদ হবে, তাঁদের কথা শুনে তাদের বেশ শিক্ষাও হবে।

সরোজ। আচ্ছা, মা, আর কোন্ বিষয়ে আমাদের মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক?

মা। অর্থ ব্যবহার ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া বিশেষ আবশ্যক। আমি অর্থ ব্যবহার বিষয়ে এখন দু-একটা কথা বলতে চাই।

লীলা। সে কি, মা! অর্থ ব্যবহারও কি আবার ছেলেদের শেখাতে হয়? তাত কখনও শুনিনি। তুমি যে মা, কত নূতন কথাই শেখাচ্ছ। কি করে টাকা রোজগার করতে হয়, কি করে তার ব্যবহার করতে হয়, এও আবার ছেলে মেয়েদের শেখাতে হয়?

মা। শেখাতে হয় বই কি। অর্থ-ব্যবহার শেখাটা কি নিতান্ত অনাবশ্যক বলে মনে কর? অর্থ ব্যবহার শিক্ষার উপর দান, ধর্ম্ম পরোপকার, স্বার্থত্যাগ প্রভৃতি হৃদয়ের গুণ নির্ভর করে। জীবনের সুখ সাচ্ছন্দ্য অনেকটা অর্থের উপর নির্ভর করে। টাকা পয়সার ব্যবহার না জানাতে, টাকা পয়সা থাকা সত্বেও, অনেককে বড় কষ্টে কাল কাটাতে দেখা গেছে। বিশেষতঃ টাকা পয়সা বিষয়ে ঠিক থাকতে না পারলে, মানুষ বেশীদিন অন্য সৎ গুণ জীবনে রাখতে পারে না। কথায় বলে 'অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়।' দেশের যত পাপ — চুরি, ডাকাতি শঠতা, প্রবঞ্চনা, ইত্যাদির মূলে অর্থ রয়েছে। এসব কারণেই ছেলে বেলা হতে, ছেলেদের অর্থ-ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া আমি উচিত মনে করি। সত্যি, লীলা, এটাও আবার ছেলেমেয়েদের শেখাতে হয়, আমাদের অনেকেই কল্পনাও করতে পারেন না কিন্তু বিষয়টা কি রকম দরকারী, এখন বোধ হয় তোমরা বুঝেছ।

সরোজ। সত্যি মা, অর্থ ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া নিতান্তই

দরকার। কলিকাতার বড় ধনী বিনোদ বাবু, এই সে দিন মারা গেলেন, তাঁর সম্পত্তি যে কত ছিল, তাত জানই। বিনোদ বাবুর একটী মাত্র ছেলে — পুলিনচন্দ্র। পুলীন বাবুর বয়সও বেশী নয়, বিশ বাইশ বৎসর হবে। বাপ মরবার পর, দুতিন বছরের মধ্যে, তিনি সমস্ত সম্পত্তি উড়িয়ে এখন অতি কষ্টে, কোন মতে দিন কাটাচ্ছেন। আমার এখন মনে হয়, যদি বিনোদ বাবু ছেলে বেলা হতে, পুলীন বাবুকে অর্থ-ব্যবহার শিখাতেন, তবে পুলীন বাবু এরকম ভাবে সম্পত্তিটা নষ্ট করে, নিজে এত দুঃখ পেতেন না।

মা। টাকা পয়সার বিশেষত্ব কখনও ছেলেদের জানতে দেবে না। একজন সংসারী লোক যেমন টাকাকে পৃথিবীর সার জিনিষ মনে করে, প্রাণ মন দিয়ে টাকার দিকে ছোটে, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার না করে, টাকা সংগ্রহ করে, ছেলেদের কখনও সে রকম করে তুলো না, অথবা সে রকম উৎকট টাকার লিপ্সা কখনও ছেলেদের মধ্যে ঢুকতে দিওনা।

সরোজ। আচ্ছা মা, আমরা কি করে তা করতে পারি ?

মা। বলছি শোন, তোমরা সকলেই জান, ছেলেমেয়েরা টাকা পয়সার দিকে মোটেই খেয়াল করে না। আমরা যেমন টাকা অতি মূল্যবান মনে করি, তারা তেমনটা মনে করে না। একটী ছেলের হাতে একটা টাকা দাও, সে টাকাটা তার অন্য খেলনার মত ব্যবহার করবে, তার জন্য যে বিশেষ

মমতা হবে, তা নয়। তাই ছেলে পিলেদের হাতে টাকা পয়সা দিতে অনেকেই বারণ করে থাকেন।

সরোজ। ছেলের হাতে টাকা দিলুম, টাকার বিশেষত্ব তাকে বুঝিয়ে দিলুম না, ছেলে অন্য খেলবার জিনিষের মত টাকাটা কোথায় ফেলে এল, তা কি ভাল মা? তার চাইতে টাকার বিশেষত্ব বেশ করে বুঝিয়ে, তাকে একটু সাবধান করে দিলে ভাল হয় না?

মা। দেখ সরোজ, টাকা কি জিনিষ, সেটাও ছেলেকে বুঝিয়ে বলবে না, আমি সে কথা বলছি না। তুমি আমার উদ্দেশ্যটা ভাল করে বোঝনি। অনেক পিতা মাতা টাকা খুব বড় জিনিষ মনে করেন এবং নানা রকম করে ছেলেদের কাছে বলেন। আমি ছেলেদের কাছে টাকার বিশেষত্ব, সে রকম করে বলা ভাল মনে করি না। টাকা কি এবং কি রকম ভাবে টাকা ব্যবহার করতে হয়, ছেলেদের অবশ্য বুঝিয়ে বলবে। তাদের বেশ করে বুঝিয়ে দেবে, আমাদের জামা জুতা কাপড় চোপড় ইত্যাদি সংসারের দশ রকম আবশ্যকীয় জিনিষের মত, টাকাও বড় আবশ্যকীয় জিনিষ। গায়ের জামা হারিয়ে ফেল্লে বা ইচ্ছা করে ছিড়ে ফেল্লে যেমন কষ্ট পেতে হয়, তেমন টাকা নষ্ট কল্লে, অভাবে পড়ে কষ্ট ভুগ্‌তে হয়।

সরোজ। তবে কি তুমি ছেলে মেয়েদের হাতে টাকা দিতে বলছ?

মা। বলি বই কি। তাদের হাতে যদি টাকা না দাও

তবে তারা তার ব্যবহার শিখবে কি করে?

লীলা। ছেলের হাতে টাকা দিলে যে তারা যা তা কিনে টাকা নষ্ট করে ফেলে।

মা। সে জন্যই ত, তাদের টাকার ব্যবহার শেখান দরকার। তাদের হাতে টাকা দিয়ে, টাকা কি করে ব্যবহার করতে হয়, শেখাতে হয়। প্রতি মাসে নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করবার জন্য, ছেলেদের হাতে কিছু টাকা দিলে মন্দ হয় না। কিন্তু প্রথম তিন চার মাস, বাপ মা বেশ সতর্ক হয়ে, ছেলেরা টাকার কি রকম ব্যবহার করে, দেখবেন। প্রথম কয়েক মাস, পিতা কি শিক্ষকের তাদের সঙ্গে করে বাজারে নিয়ে, তাদের রুচি পরীক্ষা করতে পারেন। ছেলেরা অনেক সময় বাহ্যিক চাক্‌চিক্যে ভুলে, টাকার অপব্যবহার করে, যা তা অনাবশ্যকীয় জিনিষ কিনে আনে। পিতা কি শিক্ষকেরা সঙ্গে সঙ্গে থেকে যদি ছেলেদের দ্বারা আবশ্যকীয় জিনিষ কেনান, তবে নিজের টাকা দিয়ে জিনিষ কেনার জন্য তাদের বেশ একটা আমোদও হয় এবং অন্যপক্ষে টাকার ব্যবহারও তারা বেশ শিখে যায়। চার ছয় মাস কাল পিতা মাতা একটু সাবধান থাকলে পর, টাকা খরচ বিষয়ে ছেলেদের একটী রুচি জন্মে যায়, একটা অভ্যাস দাঁড়িয়ে যায়। তার পর তাদের হাতে টাকা পয়সা দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যেতে পারে।

লীলা। হাঁ মা, এ রকম করলে মন্দ হয় না। বিলাতেও এ রকম করে অর্থ ব্যবহার ছেলেদের শেখান হয়ে থাকে

শুনেছি। কিন্তু মা আমাদের দেশ যে গরীব, সংসারের সমস্ত খরচ চালিয়ে, মাসে মাসে ছেলেদের হাতে কিছু টাকা দেওয়া অনেকের পক্ষে সহজ নহে।

মা। আমাদের দেশ যে গরীব সে বিষয়ে সন্দেহ কি। অনেকেই ছেলেদের হাতে টাকা দিতে পারেন না সত্য, কিন্তু একটা কাজ বোধ হয় অনেকেই করতে পারেন। সংসারের জন্য বাজার সকলকে করতে হয়, ছেলেদের হাতে টাকা পয়সা দিয়ে, তাদের দ্বারা বাজারটা করিয়ে নিলেও তাদের অনেক শিক্ষা হয়। একটা বিষয়ে তাদের বরাবর সাবধান করে দেবে, ধার যেন কখনও না করে।

সরোজ। অনেকে অভাবে পড়ে ধার করে না?

মা। ছেলেদের আবার অভাব কি? তাদের যদি সংযম শিক্ষা দিতে পার, অনেক অভাব তাদের কমে যাবে। তারা নিজেরাই অনেক অভাবের সৃষ্টি করে। কিন্তু সরোজ, অনেক বড় লোকের ছেলেও ত ধার করতে অভ্যাস করে। তারা ধার করতে শেখে, অভাবের জন্য নয় কিন্তু আমোদের জন্য। বাবা হয় ত বাজার গেলেন, দশ টাকা সঙ্গে ছিল, পনর টাকার বাজার করে, দোকানদারকে বলে পাঁচ টাকা বাকী রেখে দিলেন। হয়ত কোন দিন ছেলেকে পাঠিয়ে, পঞ্চাশ টাকার জিনিষ দোকান-দারের থেকে বাকী করে নিয়ে এলেন। এ সব যদিও সামান্য সামান্য ঘটনা, কিন্তু ইহার ফল ছেলেদের জীবনে বিষের মত কাজ করে। ছেলেবেলা হতে এ রকম ভাবে কাজ

করতে করতে, ছেলেরা শেষে বড় বেহিসাবি হয়ে দাঁড়ায়। তাই পিতা মাতার এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জীবনী হতে একটা ঘটনা বলি, তা হলে তোমরা জানতে পার্‌বে ছেলেমেয়েদের কি করে অর্থ-ব্যবহার শিক্ষা দিতে হয়।

লীলা। মা, সকলের অবস্থা কি মহারাণীর অবস্থার মত?

মা। সে তোমার বুঝবার ভুল, অবস্থা এক না হলে তাতে কি? কিন্তু একই নিয়ম সব জায়গায় খাটবে। ভাল যাহা, মহারাণীর পক্ষেও ভাল, তোমার পক্ষেও ভাল।

সরোজ। লীলা, দৃষ্টান্তটা আগে শোন, অনর্থক বাজে কথা তুলে কি লাভ?

মা। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার যখন অল্প বয়স, তিনি সরকার হতে নিয়ম মত জলপানি পেতেন এবং ইচ্ছা মত তাঁর জলপানির টাকা খরচ করে, তিনি আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব কি দীন দুঃখীদের উপহার দিতেন। এক দিন জলপানির টাকা নিয়ে মহারাণীর শিক্ষয়িত্রী, মহারাণীর সঙ্গে বাজারে গিয়েছিলেন। রাজকুমারী এক দোকানে আপন পছন্দ মত জিনিষ কিনে জলপানির সব টাকা খরচ করে ফেলেছেন। পরে তিনি অন্য এক দোকানে সুন্দর একটী বাক্স দেখতে পেলেন এবং বাক্সটা কিনতে চাইলেন। দোকানদার রাজকুমারীর ইচ্ছা বুঝে, রাজকুমারীর অন্য জিনিষের সঙ্গে বাক্সটা বেঁধে দিচ্ছিল, তা দেখে শিক্ষয়িত্রী দোকানদারকে বল্লেন—'দেখ, রাজ কুমারীর আর টাকা নেই,

তিনি বাক্স কিন্‌তে পার্‌বেন না। বাক্স ফিরিয়ে নাও। তবে তুমি যদি এক মাস অপেক্ষা করবে, স্বীকার কর, এ বাক্সটা রাজকুমারীর জন্য রেখে দিতে পার। আগামী মাসে তিনি যখন জলপানি পাবেন, তখন টাকা দিয়ে তোমার বাক্স নিয়ে যাবেন।' দোকানদার সম্মত হয়ে বাক্স ফিরিয়ে নিল। এ রকম দৃষ্টান্ত আমাদের পিতা মাতারা কি অনুরকণ করতে পারেন না? এ রকম ঘটনা বোধ হয় প্রায়ই ঘটে থাকে। আমার মনে হয়, পিতা মাতা যদি এ ভাবে ছেলেদের চালান, তবে ছেলেরা ছেলেবেলা হতে ধার করতে শিখবে না।

লীলা। রাণীর ত মা টাকার অভাব ছিল না, শিক্ষয়িত্রী রাণীকে বাক্সটা কিনে দিলেই পারতেন। যাদের ঢের টাকা আছে, দেবার শক্তি আছে, তারা যদি দুএক দিনের জন্য ধার করে, তবে বোধ হয় দোষের হয় না। যাদের দেবার শক্তি নাই, তাদের জন্য স্বতন্ত্র কথা।

মা। লীলা, তুমি এখনও বিষয়টীর গুরুত্ব বুঝতে পারনি। রাণীকে বাক্স কিন্‌তে না দিয়ে শিক্ষয়িত্রী অতি ভাল কাজ করেছিলেন। দোষ যাহা, তাহার প্রশ্রয় কখনও দেবে না। দেবার শক্তি থাকলে কি হয়, কু-অভ্যাস একটা দাঁড়িয়ে গেলে পর, দিয়ে দিয়ে আর কুলিয়ে ওঠা যায় না। আমি আগেই বলেছি, এ কু-অভ্যাসটা ধনী পরিবারেই বেশী। পয়সা যাদের আছে, তাদেরই বেশী সাবধান হওয়া উচিত। গরীবেরা অনেক সময়ে ভয়ে ধার করে না, কিন্তু যাদের টাকা আছে, তাদের ত সে ভয় নেই।

সরোজ। মা, নীতি-শিক্ষা বিষয়ে অনেক নূতন কথা তোমার মুখে শুনা গেল।

লীলা। তুমি এপর্য্যন্ত ছেলেমেয়েদের শিক্ষা বিষয়ে বলে এসেছ। কোন গুণ কখন, কি ভাবে শেখাতে হয় বোঝাতে চেষ্টা করেছ। কিন্তু সব ছেলেমেয়েরা ত অত সহজে শেখে না। আমরা না হয় চেষ্টা করতে পারি, ছেলেরা যদি বশে না আসে, কি করা যায়? তুমি বলেছ ছেলেদের সঙ্গে ব্যবহারে শাস্তি ও পুরস্কার দুইর দরকার হয়। কি রকম শাসনের ব্যবস্থা তুমি করতে বল? তুমি বলেছ, গৃহরাজ্যে মার পিটের স্থান নাই, জোর জুলুমে ছেলেদের প্রকৃতি বদ্‌লাতে পারে না।

সরোজ। সত্যি মা, লীলা বড় কাজের কথা বলেছে। ছেলেমেয়েদের শাসন বিষয়ে আমাদের বিশেষ জ্ঞান থাকা দরকার। তুমি ত বলছ, আমরা ছেলেদের শাসন করতে জানিনা। শাসনটা কি রকম হলে পর, সংশোধন সহজ ও নিতান্ত স্বাভাবিক হয়ে পড়ে?

মা। শাসনের উদ্দেশ্য সংশোধন। একথা মনে রেখে বেশ শান্তভাবে, ধৈর্য্যের সহিত, শাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। শাসন অস্ত্র যত কম ব্যবহার করতে পার, তত ভাল। পরিবারটাকে স্বৈরতন্ত্র করে না তুলে, যদি সাধারণতন্ত্র করে তুলতে পার, তবে আর শাসনের ফেসাদে পড়তে হয় না। অর্থাৎ তোমরা যদি স্বেচ্ছাচারী প্রভু হয়ে না দাঁড়াও এবং ছেলেমেয়েদের

পরিবারের নিতান্ত পোষ্য না করে, যদি অঙ্গ করে তুলতে পার, শাসনের আবশ্যকতা থাকে না। ছেলেরা যদি পরিবারটা নিজের বলে মনে করে, পরিবারের কাজকর্ম্মেও শৃঙ্খলা গঠনে, তাদের হাত থাকে, তবে জানিও পরিবারের নিয়মও কাজকর্ম্মাদির দিকে তারা, তোমাদের মতই সতৃষ্ণ দৃষ্টি রাখবে। কিন্তু আমাদের পরিবারে ছেলেদের সেস্থান কদাচ দেওয়া হয়। আমরা ষোল আনা কর্ত্তা হয়ে প্রভুত্ব করে থাকি, এবং ছেলেদের ছেলে মানুষ বলে একেবারে অগ্রাহ্য করি। কাজেই শাসনের ভাবনায় কর্ত্তারা অস্থির হয়ে উঠেন, নিত্য নূতন বিধি ব্যবস্থা করেন। ছেলেরা ও নিত্যি শাসনের জ্বালায় পাগল হয়ে যায় এবং সকল বিধি ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করে বিদ্রোহী হয়ে উঠে। শাস্তি শাসনের অপরিহার্য্য অঙ্গ নহে। তোমার হাত আছে, গায়ে জোর আছে, ছেলেদের মারতে পার। মুখ আছে, তাহাদের অহর্নিশি বকতে পার। কিন্তু মনে রেখ, তোমার ক্ষমতা এ পর্য্যন্তই। তোমার প্রভুত্ব এখানেই শেষ। তারপর আর তোমার হাত নাই। সংশোধন করে নেওয়া অর্থাৎ দোষটা শোধরিয়ে নেওয়া, কু-অভ্যাস বদলিয়ে ফেলা, তোমার হাতে নয়। সেটা ছেলেদের হাতে, সেটাই হচ্ছে আসল কাজ, আসল কাজটাই তাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তাই যদি কোন কল কৌশলে, ছেলেদের এ ইচ্ছাটার উপর হাত ফেলতে না পার, তাদের গায়ে হাত দিয়ে কোন লাভ হবে না, তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে না। তাই বলছিলুম জোর জুলুমে কোন কাজ হয় না, মারপিটে ছেলেদের মতিগতি ফিরে না।

লীলা। তবে কি হবে মা?

মা। ছেলেদের মনটী যে কোন উপায়ে তোমাদের অধিকার করে বসতে হবে। যদি তা না পার, তাদের শরীর অধিকার করে কিছুই লাভ নাই, পরন্তু তা'তে শুধু মনোকষ্ট, অনুশোচনা, অশান্তি। শাসনের প্রধান উপায় আমার মনে হচ্ছে, পিতামাতা ও শিক্ষকের প্রতি ছেলেমেয়েদের অকৃত্রিম ভালবাসা ও অচলা ভক্তি। যে সংসারে ভক্তি ও প্রেমে পিতামাতারা ছেলেমেয়েদের মন অধিকার করে বসতে পেরেছেন, সে সংসারে শাসন কাজ অতি সহজ ও সুখের হয়েছে। এ ভক্তি ও প্রেমের ডোরে তাদের বাঁধতে হলে, তাদের আপন করে নিতে হয়, সমান স্থান তাদের দিতে হয়। নিত্য তাদের সুখের দিকে, মতিগতির দিকে দেখতে হয়। তাই বলছিলুম উদারতা ও সহানুভূতি পারিবারিক শাসন নীতির ভিত্তি। যে ছেলে মা বাপকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, সে কখনও ইচ্ছা করে না যে, তার কোন দোষ মা বাপের কাণে যায়। যদি কোন দিন, কোন রকম দুর্ব্যবহারের খবর পেয়ে, মা ছেলেকে শুধু বলেন 'তুমি বড় অন্যায় করেছ' তাতেই ছেলে মরমে মরে যায়, ফিরে কখনও সে কাজ করে না। একদা কুমারী ভিক্টোরিয়ার শিক্ষয়িত্রী একটী পাঠ পড়বার জন্য তাঁকে বারবার বলছিলেন, কিন্তু বালিকা শিক্ষয়িত্রীর কথা শোনেনি। শিক্ষয়িত্রী শেষটা তাঁর মার কাছে কুমারীর এ অবাধ্যতার কথা বলেছিলেন। মাতা সস্নেহে ভিক্টোরিয়াকে লক্ষ করে বল্লেন 'আমি বড় দুঃখিত

হয়েছি, তুমি অবাধ্য হয়েছ', এই কথাতেই বালিকার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল, তিনি মাথা নীচু করে মাকে বল্লেন, 'মা তুমি ভবিষ্যতে এ বিষয় আর শুনবে না, এবার আমাকে মাপ কর।' এ ঘটনার পর, আর রাণীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ তাঁর মাতাকে শুনতে হয়নি। বল দেখি, এ ক্ষেত্রে মার পিট বা বকুনিতে কি এরকম ফল দাঁড়াত? তাই বলছিলুম, পারিবারিক শাসনের প্রধান অস্ত্র ভালবাসা ভালবাসার বন্ধন যদি রাখতে চাও, ছেলেদের কখনও বিরক্ত করো না। ঘন ঘন হুকুম করে, তাদের অস্থির করো না। অথবা চীৎকার করে তাদের কোন কাজের আদেশ করবে না। উত্তেজনাতে শিশু প্রকৃতি উত্তেজিত হয়ে উঠে। ভালবাসাতে হিংস্র পশুরা পর্য্যন্ত বশে আসে, ছেলেদের কি কথা। একটী ছেলেকে যদি চীৎকার করে কিছু বল, সে থতমত খাবে, একটু ইতস্ততঃ করবে। কিন্তু হাসি মুখে যদি কোন কাজ করতে বল, ছেলেটী তখনি ছুটে গিয়ে, কাজটী শেষ করে আসবে। এভাবে ভালবাসার ভিতর দিয়ে চালিয়ে নিলে, যখন তখন ছেলেদের দোষ খুঁজতে হবে না, হাঁক ডাক করতে হবে না। এখন বোধ হয়, তোমরা স্বীকার করবে যে, আদর দিয়ে শাসন ও করা যায়, শিক্ষাও দেওয়া যায়।

সরোজ। মা, আমরা যে অনেকটা গোঁয়েন্দা গিরি করে থাকি। ছেলেরা কখন কোথায় কি অনর্থ করে, তার

খোঁজ করি। সতত ভয়ে ভয়ে থাকি, কখন কোথায় কি ভাঙ্গে, কি অনিষ্ট করে বসে।

মা। না, সরোজ। পরিবারে পিতামাতা কি শিক্ষকের কাজ, গোঁয়েন্দা পুলিশের কাজ নয়। পাহারওয়ালার কাজও নয়। পাহারওয়ালার মত সর্ব্বদা চীৎকার করে 'অন্যায় কাজ করো না' 'বাড়ীতে অনর্থ করো না' ইত্যাদি বলে, ছেলেদের সতত সজাগ করে দেওয়া, তোমাদের কাজ নয়, অথবা পুলিশের মত তাদের পিছু পিছু ছোটা, তাদের পাক্‌রাও করে, কপালে আসামীর মার্কা দেওয়া তোমাদের কাজ নয়। তোমাদের কাজ রাণীর কাজ,—ছেলেমেয়েদের দিয়ে পরিবার গঠনের কাজ। তাদের দ্বারা পরিবারে সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলা স্থাপনের কাজ। যদি পরিবারে নিয়ম প্রবর্ত্তনে বা শৃঙ্খলাস্থাপনে, ছেলেমেয়েদের আনতে পার এবং তাদের দিয়ে নিয়মাদি গড়ে তুলতে পার, তারা নিজের গড়া নিয়ম ভাঙ্গবে না। তজ্জন্য তোমাদেরও পাহারওয়ালার মত, সতত চীৎকার করে, সজাগ করে দিতে হবে না, অথবা নিয়মাদি লঙ্ঘনের জন্য তাদের পিছু পিছু ছুটতে হবে না। পাহারওয়ালার মত উপদেশ দিয়ে তাদের যখন তখন সজাগ করে রাখবার চেষ্টা করো না। নিত্যি যদি বলতে থাক 'একাজ করো না', 'ওকাজ করো না' তারা ঠিক সে কাজটা করতে উৎসুক হবে এবং করে বসবে। আগুনে হাত দিতে বার বার মানা করে দেখে, তোমাকে একটু অন্যমনস্ক দেখলেই, সুবিধা বুঝে,

আগুনে হাত দিবেই। নিষেধ অমান্যের উৎকট লোভ সামলাতে না পেরে, তোমরা বইতে পড়েছ যে, আদম ও ইভ শাপভ্রষ্ট হয়ে, স্বর্গ হতে বিতাড়িত হয়েছিল। আমাদের প্রকৃতিই অনেকটা সে রকম। তাই ছেলেদের নিষেধার্থক উপদেশ যত কম দিতে পার, ততই ভাল। মোটেই যদি না দাও, আরও ভাল। চালচলনের স্বাধীনতায় অযথা যখনতখন হাত দিলেই, ছেলেরা জন্তুর মতই ক্ষেপে ওঠে। আত্মপ্রতিষ্ঠার ভাব, ছেলে বয়স হতে ছেলেদের মধ্যে বিলক্ষণ দেখা যায়। তাই একটু হিসাব করে চললে, একটু সংযত হয়ে আগ্‌পিছ্‌ চিন্তা করে ছেলেদের সঙ্গে ব্যবহার করলে, শাসনের জন্য এত ভাব্‌তে হয় না।

সরোজ। মা, ছেলেদের কি ঠিক তোমার ভাবে গড়ে তোলা যায়? ছোট ছেলেরা পরিবারে ভাঙ্গা গড়া কীই বা বুঝে? তাদের সম্পর্কে শাসন-নীতি কি রকম হওয়া উচিত।

মা। সরোজ, নিতান্ত ছোট ছেলেদের সম্পর্কে শাসনের কথা উঠেই না। শুধু শাসনে সংশোধন হয় না, যেখানে ছেলেরা শাসনের উদ্দেশ্য বুঝতে পারে না। ছেলেরা নীতিজ্ঞান শূন্য নয়। তাদের নীতিজ্ঞান আছে বলে, একটু ফিরিয়ে দিলে, তারা ন্যায়ের দিকে ফিরে আসে বলে, পরিবারে শাসনের ব্যবস্থা আছে। তোমরা জান, লোকের উদ্দেশ্য বিবেচনা করে, আমরা লোকের দোষ গুণ বিচার করি। যেখানে উদ্দেশ্য ভাল ছিল, কিন্তু কাজটা দোষের হয়ে পড়েছে

সে স্থলে অপরাধ সাব্যস্ত হয় না, দণ্ডের ও বিধি নাই। যেমন লীলা বুলুর কথা বলছিল, টেবিলে কি আছে দেখতে গিয়ে, হাত হতে গ্লাস পড়ে ভেঙ্গে গেছে। এস্থলে, অসাবধানতার জন্য সতর্ক করে দিতে পার, কিন্তু শাস্তি দেওয়া নিতান্ত অনাবশ্যক। যেখানে ছেলেরা কাজের দোষ গুণ বুঝে না, সেখানে গুণের জন্য যেমন প্রশংসা নাই, দোষের জন্যও অপরাধ নাই। যেখানে অপরাধী ব্যক্তি শাস্তির উদ্দেশ্য বুঝবে না, সেখানে শাস্তির বিধি নাই। যেমন পাগলের শাসন কোথাও হয় না। তেমন দু'এক বছরের শিশুর জন্য শাস্তির কোন আবশ্যকতা নাই। ছেলেরা সাধারণতঃ ইচ্ছা করে অন্যায় করে না। যদি ঘটনাক্রমে কাজটা দোষের হয়ে পড়ে, তারা নিজেরা দোষটা বেশ বুঝতে পারে এবং তজ্জন্য নিজেরাই দুঃখিত হয়। একটী ঘটনা বলি শোন — একদিন বাজার হতে পোটলা পোটলা দাল, নুন প্রভৃতি এনে, মোট শুদ্ধ উঠানে রেখেছে, তিন বছরের মেয়ে রমা, মোট হতে পোটলাগুলো উঠিয়ে, ভাঁড়ার ঘরে নিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ হাত হতে একটী পোটলা খুলে দাল পড়ে গেল, এ দেখেই মেয়ে কেঁদে আকুল। এরকম ঘটনা প্রায় বাড়ীতে দেখতে পাবে। এতেই বেশ বোঝা যায় যে, শিশুরা ন্যায় অন্যায় বেশ বুঝে এবং অন্যায় অনর্থের জন্য তারা নিজেরা কষ্ট অনুভব করে। এস্থলে সংশোধনের জন্য সমবেদনার দরকার, শাসনের আদবেই দরকার নেই। শাসনে, ফল অনেক সময় বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়। আত্মসম্মান জ্ঞান, অল্পাধিক সকল ছেলের

মধ্যে দেখতে পাবে। এ জ্ঞানে কখনও আঘাত করো না। সকলের সামনে ছেলেদের বকে কি মেরে, তাদের লজ্জা দেওয়ার চেষ্টা করো না। যেখানে সেখানে বকুনি ও মার খেয়ে, ছেলেরা যদি তোমার শাসনের প্রতি আস্থাহীন হয়ে ওঠে, তবে তাদের নিয়ে, তোমার সংসার করা চলবে না। তারা বিদ্রোহী হয়ে যখন তখন তোমাকে অগ্রাহ্য করতে চাবে। দোষের হিসাবে, শাস্তির পরিমাণও, তোমাদের বিবেচনা করতে হবে। এ সম্পর্কে ছোট একটী মেয়ের একটী ঘটনা বলছি, শোন। পাশের বাড়ীর চার বছরের রেবা মেয়েটীর গৃহস্থালীর দিকে একটু ঝোঁক আছে। একদিন তার বাবার পড়বার ঘরে, একটী টেবিলে কতগুলো বই এলোমেলো হয়ে রয়েছিল, সেখানে সুন্দর একটী গ্লাসওছিল। বাবা ঘরে লেখাপড়া করছিলেন। এবং মেয়েটী টেবিল গুছাচ্ছিল। বাবা বল্লেন, 'গ্লাসে হাত দিও না'। বাস্তব মেয়েটী গুছানের ভাব থেকেই, টেবিলের বই ও গ্লাস নাড়াচাড়া করছিল। শেষটা বাবা, তাঁর দপ্তর হতে এসে, মেয়েটীকে একটী চড় দিয়ে বের করে দিলেন। মেয়েটী চড় খেয়ে, নীচে গিয়ে মাকে বল্লে "দেখ মা, বাবা কেন আমাকে মারলে? আমিত গ্লাস ভাঙ্গিনি, আমি বইগুলো গুছিয়ে রাখছিলুম। গ্লাসে হাত দিলে কি হয়, ভাঙ্গিনি ত।" লঘু অপরাধের জন্য এ গুরুদণ্ডে, বাস্তবিকই মেয়েটীর প্রাণে বড় লেগেছিল। তার আত্মসম্মানে আঘাত পেয়েছিল। তারপর দু'এক দিন, সে আর বাবার ঘরে যায় নি, বাবার জিনিষে হাত দেয় নি। প্রকৃত দোষের হিসাবে, ছেলেরা

দোষ করে না। কিন্তু অসাবধানতা, অমনোযোগীতা ও লোভই তাদের দোষের কারণ হয়। তাই ছেলেবেলা কড়া শাসনের কিছুমাত্র দরকার হয় না। একটী ছেলে হয়ত তার জামাটা ঠিক স্থানে না রেখে, অন্য জায়গায় ফেলে রেখেছে। তুমি জামাটা ঠিক স্থানে তুলে রেখো না, তাকে দিয়ে তুলিয়ে রেখ। পরদিন স্নানের সময়, যদি জামাটা খুঁজে না বের করতে পারে, জামা ছাড়া তাকে থাকতে দিও। তাহলে শাস্তিটা তার মনে বেশ লাগবে। এ সম্পর্কে, রেবার বোন পূর্ব্বোক্ত রমার আর একটী ঘটনা বলছি, শোন। একদিন রেবা ও রমা দুই বোন খেতে বসেছে। মা দু'জনকে দুইটী করে বাতাসা দিয়েছেন। রমা একটী বাতাসা দিয়ে, দুধ ভাত খেয়ে, অপরটী হাতে করে, উঠে গেল। মা বল্লেন 'বাতাসা রেখে দাও, কাল দুধের সঙ্গে খেও।' একটু থামি মেয়ে, লোভ সামলাতে না পেরে, শুধু শুধু বাতাসাটা খেয়ে ফেল্লে। রেবা একটী বাতাসা খেয়ে, অন্যটী মার কথা মত উঠিয়ে রাখলে। পরদিন আবার দুজনে খেতে বসেছে, দুধ ভাত খাবার সময়, রেবা বাতাসা খাচ্ছে, দেখে, রমা বলে উঠল 'মা, দিদিকে বাতাসা দিয়েছ'? মা বল্লেন 'না, সে কাল তার বাতাসা রেখে দিয়েছিল। তুমিত দুখানাই খেয়ে ফেলেছ। রাখতে বল্লুম, রাখলে না। আজ আর কোথা পাবে?' মেয়েটী মাথা নীচু করে, আস্তে আস্তে, শুধু দুধ ভাত খেয়ে উঠে গেল। ইহাকেই বলে পারিবারিক শাসন।

পরিবারে যদি শাসনের ব্যবস্থা উঠিয়ে দিতে চাও, তবে পরিবারে শৃঙ্খলা স্থাপন করতে হবে। সময়-নিষ্ঠা, শৃঙ্খলা ও কার্য্যতৎপরতার মত, দোষ প্রতিষেধক ঔষধ আর নেই। প্রতি কাজে সময় ও শৃঙ্খলা চাই। প্রত্যেক জিনিষ ঠিক জায়গায় রাখার অভ্যাস করা চাই। ছেলেদের কখনও শুধু বসে থাকতে দিও না। যে কোন একটা কাজে বা খেলায় সর্ব্বদা লাগিয়ে রেখো। তাতে আলস্যতা দূর হবে, এবং তারা সতত কর্ম্মশীল হয়ে উঠবে। কাজকর্ম্ম ছাড়া থাকলেই, অনর্থের ভাব মনে জাগে, ছেলেরা কিছু না কিছু অনর্থ করতে চায়। ইংরেজীতে একটী কথা আছে, 'খালি মন, সয়তানের জায়গা।'

লীলা। মা, তুমি কতকাল এভাবে ছেলেদের শিক্ষা দিতে বল? তোমার গৃহ-শিক্ষার আরম্ভ মার দুধের সঙ্গে, তার শেষ কখন? এভাবে সারাজীবন শিক্ষা কাজ চল্‌তে পারে না।

মা। সারাজীবন কখনও শিক্ষা চলে না। সারাজীবন যদি শিক্ষাই দিতে হয়, তবে সে শিক্ষা কিসের জন্য, এবং সে শিক্ষার মূল্যই বা কি? আমাদের দেশে কথায় বলে 'নয়তে না হলে নব্বইতে হয় না'। ষোল বছরের মধ্যে গৃহ-শিক্ষার কাজ শেষ হওয়া চাই। ষোল বছর, ক্রমাগত ছেলেমেয়েদের, ইচ্ছামত চালিয়েও যদি তাদের মানুষ করে না তুলতে পার, তবে আর কতকাল শেখাবে, কেনই বা শেখাবে? কিন্তু লীলা, তোমাদের ঐকান্তিক চেষ্টায় ও প্রাণান্ত পরিশ্রমে, যদি ছেলেমেয়ের দেহ মন পুষ্ট হয়ে

উঠে, তাদের শৌর্য্যে, বীর্য্যে ও মহত্ত্বে তোমাদের মুখ উজ্জ্বল হবে, দেশ গৌরবান্বিত হবে। এরাই বুক ফুলিয়ে, পৃথিবীর কাছে তোমাদের মহত্ত্ব ঘোষণা করবে। এবং দেশকে ধন্য করবে। মনস্তত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা তাঁদের জীবনব্যাপী অনুসন্ধানের ফলে জেনেছেন যে, 'ছেলেরা কখনও খারাপ হয়ে জন্মে না। তাদের বৃত্তিগুলো, সযত্নে ও সতর্কতার সহিত, যথাসময়ে, যদি যথোচিত পরিচালনের সাহায্য করতে পার, সব ছেলেই সুন্দর সুপুরুষ হয়ে, উঠতে পারবে।' এখানেই তোমাদের মাতৃত্বের সাধনা, * এবং এ সাধনায় তোমাদের সিদ্ধিলাভ করতে হবে। ভগবানের নাম করে, এই পবিত্র মহৎ কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করো। ভগবান, তোমাদিগকে দেশের শৌর্য্য এ বীর্য্য ও মহত্ত্বের স্রষ্টী করে, তাঁর সৃষ্টি রক্ষা ও তাঁর মহত্ত্ব প্রচারের জন্যই তোমাদের সংসারে পাঠিয়েছেন। দেশ তোমাদের উপর নির্ভর করে। তোমরা এ ধন রক্ষার একমাত্র ও সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্রী। দেশের মূল্যবান সম্পত্তি, শিশু-দেহওমনের অপব্যবহার করে, অথবা অযত্নে তাহা নষ্ট করে, এই বিশ্বাসের মূলে কুঠার দিও না, এবং সমাজ, জাতি, দেশটাকে ডুবিয়ে দিও না।

* So far from saying that child-nature is utterly bad or beautifully perfect, we should say that it is a disorderly jumble of impulses, each pushing itself upwards in lively contest with the others, some towards what is bad, others towards what is good. It is on this mortley group of tendencies that the hand of the moral cultivator has to work, selecting, arranging, organising into a beautiful whole. James Sully's **Children's Ways.**

চতুর্থ প্রস্তাব

জ্ঞান-শিক্ষা বিষয়ক কথা

সরোজ। মা, তুমি নীতি-শিক্ষা সম্পর্কে, যে সব কথা বলেছ, সে সব বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি। যতই ভাবি, ততই কষ্ট হয়। আমাদের দোষ দুর্ব্বলতার দরুন, দেশের কি সর্ব্বনাশটাই না হচ্ছে! মা, তুমি ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য ও নীতির কথা বলেছ, জ্ঞান শিক্ষাও ত কিছু কম নয়। ছেলেদের চাক্‌রীবাক্‌রী ক'রে খেতে হবে। লেখাপড়া না শিখলে ত, অন্ন জুটবে না। তদ্বিষয়ে পরিবারে কি করা যেতে পারে, মা?

লীলা। মা, এ বিষয়ে আমাদের সুবিধামত বলবে বলেছিলে। এখন সুবিধা আছে, সে সম্পর্কে দু'একটী কথা বল না। আমরা কি চেষ্টা করলে, ছেলেদের মহাপুরুষ করে, গড়ে তুলতে পারি?

মা। চেষ্টা করলে, না পার এমন কাজ আছে?

সরোজ! মা, তুমি কি বলতে চাও, মহাপুরুষেরা পিতা মাতার হাতের গড়া ফল? তাঁদের ভিতর ঈশ্বরদত্ত কিছু নেই, অথবা তাঁদের প্রতিভার কোন মূল্য নেই?

মা। ঈশ্বরদত্ত কিছু নেই, মানে কি? আমাদের সবই ত ঈশ্বরদত্ত। মানুষের বুদ্ধি বল, গুণ বল, প্রতিভা বল, সবই

ঈশ্বরের দান। তবে মহাপুরুষেরা শিক্ষার ফল পান নি, পিতা-মাতাদের, তাঁদের জন্য কিছু করতে হয় নি, শুধু নিজের প্রতিভার উপর তাঁরা দাঁড়ান, এ কথা আমি স্বীকার করতে পারলুম না। প্রতিভা বল্‌তে, সরোজ, তুমি কি বোঝ, জানি না। কোন মানুষে অনন্য সাধারণ বুদ্ধি-শক্তি দেখলে, আমরা না বলে থাকি যে, তার বেশ প্রতিভা আছে? এ প্রতিভা জিনিষটা কি? এটা কি এমন কোন জিনিষ, যা প্রাণীসাধারণে দেখা যায় না? যার মধ্যে দেখা যায়, শুধু তাঁরই সম্পত্তি? কিন্তু তা বলে ত মনে হয় না। ইটালির জগদ্বিখ্যাত ভাস্কর মাইকেল এঞ্জেলো বলেছেন, 'প্রতিভা অফুরন্ত সহিষ্ণুতা মাত্র।' পৃথিবীতে এমন অসাধ্য কিছু নেই, যাহা পুনঃ পুনঃ ঐকান্তিক চেষ্টায় করা যেতে পারে না। ফ্রান্সের মহাবীর নেপোলিয়ান বলেছিলেন 'এ পৃথিবীতে মানুষের অসাধ্য কিছু নেই। যে মানুষ দৃঢ়তার সহিত বল্‌তে পারে যে, 'আমি এ কাজটা কর্‌ব' তার কাজ এই দৃঢ়তার বলেই অর্দ্ধেকটা হয়ে যায়। সে কাজ, তার পক্ষে কখনও অসাধ্য নয়।' সকল ছেলেমেয়েরা অল্পাধিক বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে সংসারে আসে। কা'রো কা'রো মধ্যে, সহজে, কোন কোন বিশেষ বিশেষ দিকে, সে বৃত্তির বিকাশ হয়, কা'রো কা'রো বেলা, বিকাশে সময় ও চেষ্টার দরকার হয়।

লীলা। মা, তুমি কী বলছ? যার ভিতর বাস্তব প্রতিভা থাকে, তাহা ছেলেবেলায়ই আপনা আপনি বের হয়ে পড়ে।

চেষ্টার বড় দরকার হয় না। ইংরেজ কবি মিলটন, চার বছর বয়সে লাটিন কবিতা লিখ্‌তেন। তিন বছর বয়সে, নেপোলিয়ান খেলনার কামান নিয়ে, কল্পিত সেনাদল চালাতেন। বিদ্যাসাগর পথ চল্‌তে চল্‌তে, রাস্তার মাইল-ষ্টোন হতে ইংরেজী সংখ্যা শিখেছিলেন।

মা। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে, ইহা সাধনার জিনিষ নয় কি? পণ্ডিত নিউটন, উপন্যাসিক সার ওয়ালটার স্কট, রাজ-নীতিবিদ সুপ্রসিদ্ধ সার রবার্ট পিল, মহাদেব রাণাডে, প্রসিদ্ধ সাধক রামপ্রসাদ প্রভৃতি মহোদয়গণের মধ্যে ছেলেবেলা প্রতিভার কোন পরিচয় পাওয়া যায় নি, তা বলে কি বলতে চাও, তাঁদের প্রতিভা ছিল না। প্রতিভাবান লোক সাধারণ নিয়মের বাহিরে, নিতান্ত খাপছাড়া গোছের, বলে মনে করো না। মানুষের শক্তিগুলো, যদি যথা সময়ে যথোচিত ফুটিয়ে তুলতে পার, নিতান্ত সাধারণ মানুষ ও অসাধারণ বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারে। সাধারণ ও অসাধারণের মধ্যে তফাতের কারণ, তোমাদের যত্ন, মানুষের আত্মনির্ভরগুণ ও ঐকান্তিক সাধনা।

লীলা। কিন্তু মা, প্রতিভা ও গুণ এক বলে মনে হয় না।

সরোজ। যা'ক, সে সব তর্ক তুলে কাজ নেই। যদি এ দেশের লোকেরা সকলেই প্রতিভাশালী হবে, তবে এ দেশের এত দুর্গতি কেন? কই, কোন ছেলেমেয়ে ত তেমন ভাবে, মাথা তুলে না? অন্য দেশে কত নূতন

নূতন তত্ত্ব, কত নূতন নূতন যন্ত্র, আবিষ্কার হচ্ছে। আমাদের দেশে, সে সবের কোন সারা শব্দ পর্য্যন্ত শোনা যায় না। পিতা মাতারা যত্নের ত্রুটি করেন না, স্কুল কলেজে ছেলেমেয়ে নিত্য পাঠাচ্ছেন। কিন্তু তাদের মাথা থেকে, তেমন কিছুই বের হচ্ছে না কেন?

মা। সরোজ, তোমার এ প্রশ্নে, সাধক রামপ্রসাদের একটী গান আমার মনে পড়ছে :—

'মন তুমি কৃষি জাননা,
এমন মানব জমি রৈলো পতিত, আবাদ করলে, ফলত সোণা।'

ইয়োরোপ, আমেরিকা, জাপান কি অন্য রাজ্যে এমন জ্ঞান বিভাগ নাই, যে বিভাগে, চিন্তা করবার জন্য. ছেলেমেয়েদের বেশ সুযোগ সুবিধা করে দেওয়া হয় না। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, রাজনীতি কি ধর্ম্মনীতি, যে কোন ক্ষেত্রে ছেলেদের প্রবৃত্তি অনুসারে, ঢুকবার জন্য, ছেলেমেয়েদিগকে বাড়ীতে বরাবর উৎসাহ দেওয়া হয়। এবং যে কোন জ্ঞান বিভাগে তারা একটু বুদ্ধির পরিচয় দিলেই, সমস্ত দেশ তাদের মাথায় তুলে নেয়। সে সব দেশে জ্ঞানের পরিচয়, চিন্তার বিকাশে। চিন্তাশক্তি খাটিয়ে, যে কোন ক্ষেত্রে, যে যত রকম নূতন তত্ত্ব, খুঁজে বের করতে পারে, তারই তত আদর ও সম্মান, হউক সে, মুটে মুজুর বা নিতান্ত নগণ্য লোক। কিন্তু আমাদের দেশে হয় কি? আমাদের দেশে ঘোড়া গাধাতে এক দর, একই কাজ। আমরা ছেলেদের

মধ্যে, প্রতিভার বিকাশ হবার, কোন সুযোগ সুবিধা করে দেই? আমাদের দেশে, স্বাধীন চিন্তা করবার, কোন সুযোগ ছেলেদের আছে কি? এ ক্ষেত্রে, তারা তোমাদের কোন উৎসাহ পায় কি? চার পাঁচ বছর তক তাদের বুদ্ধি বিকাশের দিকে আমরা দৃষ্টিই রাখি না। ছেলেরা একটু বড় হলে, বই হাতে দিয়ে স্কুলে পাঠিয়ে দেই। সেখান হতে দিন রাত পড়ে, গাদায় গাদায় বই মুখস্থ করে, দুঃখে কষ্টে কোন মতে পাশের একটী মার্কা নিয়ে আসে। তাতে আমরা মনে করি, ছেলেটী বেশ লেখা পড়া শিখছে। এই পাশের জন্য আমরা সর্ব্বশান্ত হয়ে পড়ছি, আর, একে, একে ছেলেরাও প্রাণান্ত করে, পরীক্ষা-সমুদ্রে ঝাপিয়ে পড়ছে। এই এক বাঁধাধরা পথ। তোমার ছেলের এ দিকে রুচি থাক্ আর নাই বা থাক্, এ পথে তাকে যেতেই হবে, ফল যা থাকে কপালে। তাই বলছিলুম, সরোজ, আমরা মনের কৃষি জানিনা। তা যদি জানতুম, তবে বাঙলার মাটীর মত, এমন উর্ব্বরা বাঙলার মনের ক্ষেত হতে, সোণা তুলতে পারতুম। সকলের বুদ্ধি ত আর একই দিকে খেলে না। কার বুদ্ধি কোন দিকে খেলবে, ছেলেবেলা বেশ টের পাওয়া যায়।

আমাদের ছেলেদের মাথা নাই! কার আছে? যে কোন ক্ষেত্রে, মাথার পরিচয়, আমাদের দেশের লোকেরা দেন নাই কি? যে কোন উন্নত জাতির লোকের সঙ্গে, সমক্ষেত্রে দাঁড়াবার উপযোগীতার পরিচয়, এ দেশের লোকদের মধ্যে পাওয়া যায়নি কি? বিচারপতি আশুতোষ, বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশ বোস,

ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র, কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ, সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র, সমাজ সংস্কারক কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ, ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক রামমোহন, পরোপকারী মহম্মদ মহসীন, আরও কত নাম করতে পারি। আমাদের দেশে নাই কি? আছে সব, এমন উর্ব্বরা চাষের জমি, এমন অসামান্য স্বাভাবিক-সম্পদ — আলো, জল, বাতাস প্রভৃতি পরিপূর্ণ ভূমি, আর কোথায় পাবে? নাই শুধু উৎকৃষ্ট চতুর চাষা। দেশের লোক চাষ জানে না, তাই এ উর্ব্বরা ভূমি জঙ্গলে ঢেকে যাচ্ছে।

লীলা। মা, তুমি কি লেখাপড়া বন্ধ করতে চাও? ছেলেমেয়েরা পরীক্ষা পাশ করবে, তাও তোমার ভাল লাগে না? ছেলেমেয়েরা ফি বছর পরীক্ষা পাশ করতে দেখলে কার না প্রাণে আনন্দ হয়? তোমার সবই অদ্ভুত দেখতে পাচ্ছি।

মা। শিক্ষা বন্ধ করতে চাব কেন? অন্য পক্ষে আমি চাই, দেশের সব ছেলেমেয়েরা ভাল মতনই লেখাপড়া শিখে। লেখাপড়া ছাড়া, এ পৃথিবীতে কেহ কখনও উঠতে পারে নি। এ কথা জেনে রেখ, লেখাপড়া ছাড়া মানুষ, জাতি বা দেশ কখনও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। পরীক্ষা পাশ কি উপাধি লাভের কোন মূল্য নেই, এ কথা আমি বল্‌ছিনে। সর্ব্বত্র পরীক্ষাও আছে, পাশও আছে। কিন্তু লীলা, এতটা বাড়াবাড়ি বোধ হয়, অন্য কোথাও নেই। আমাদের দেশের ধারণা যে, যে ছেলে পরীক্ষা

পাশ করতে পারেনি, সে কিছুই জানে না। অন্য দেশে স্কুল কলেজের শিক্ষা, উচ্চ জ্ঞান লাভের সহায় মনে করা হয়, কিন্তু আমাদের দেশে, তা'তেই জ্ঞান লাভের সমাপ্তি। অনেক ছেলে পরীক্ষা পাশ করতে না পেরে, আত্মহত্যা করে। অনেক পিতা মাতাও, আবার পাশের তালিকায়, ছেলে মেয়ের নাম না দেখে, একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসেন। শুধু পাশ পাশ করে, আমাদের ছেলেমেয়েগুলো, আমাদের জাতটা শুদ্ধ অধঃপাতে যাচ্ছে। এ পাশের ব্যাপারে, আমরা কি প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পাই ? প্রায় ছেলে বিশ্ববিদ্যালয় হতে বের হয়ে, সংসারের কাজের জন্য একেবারে অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়ে। তার শরীর কি মন, অন্য কোন কাজের উপযোগী থাকে না—স্ফূর্ত্তির সহিত অন্য কোন কাজ বা স্বাধীন চিন্তা করতে পারে না, প্রায় সব কাজে ভীরুতার পরিচয় দিয়ে থাকে। অন্যান্য সুসভ্য দেশে, ইউরোপ, জাপান, কি আমেরিকায়, সাধারণতঃ কি দেখা যায় ? যুবকগণ বিশ্ববিদ্যালয় হতে বের হয়ে, এক একজন, এক একটা আগুণের কণার মত, সংসারে ঢুকে। যেমন তাদের উৎসাহ, তেমনি তেজ, তেমনি চিন্তা শক্তির প্রখরতা। যে কাজে হাত দেয়, সেই কাজেই নাম করে আসে। কিন্তু আমাদের দেশে কি দৃশ্য দেখা যায় ? সংসারে স্বাধীন ভাবে বুদ্ধি ও তেজের সহিত, কাজ করবার উপযুক্ত শক্তি উপার্জ্জনের জন্য, আমরা আমাদের সুন্দর সুন্দর কচি কচি ছেলেমেয়েগুলোকে, স্কুল কলেজে পাঠিয়ে থাকি।

পড়া শেষ করে, যখন তারা বাড়ী ফিরে আসে, তখন অনেকের শরীরটা কঙ্কাল হয়ে পড়ে, স্বাধীন চিন্তাবৃত্তি থাকে না, বুদ্ধি নিস্তেজ হয়ে উঠে। উৎসাহ উদ্যমের লেশ মাত্র দেখা যায় না। যে রকম অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে, এ অবস্থায় আমাদের ছেলেদের পরীক্ষা পাশ করা বিড়ম্বনা মাত্র। পরীক্ষা পাশ, তাদের পক্ষে সংসারের কাজ কর্ম্মের উপায় স্বরূপ না হয়ে, যেন একটা অন্তঃরায় বিশেষ হয়ে পড়েছে। ইহা ছেলেমেয়েদের পক্ষে যেমন মারাত্মক, দেশের পক্ষেও তেমনি নিতান্ত অমঙ্গলজনক।

সরোজ, অতি সত্য কথা, শুধু স্বাস্থ্য-রক্ষা বা নীতি শিক্ষায় পেট ভরবে না। ছেলেদের অন্নেরব্যবস্থা করে দিতে হবে। কিন্তু সরোজ, পরীক্ষা পাশে যে চাকরী জোটে, তাতে পেট ভরে কয়টা প্রাণীর ? দেশের সকল লোকেরা যদি চাকরী করে পেট ভরাতে হয়, এত চাকরী আসবে কোথা হতে ? কে এত মজুর খাটাবে ? আমাদের মুনিবেরা, ছেলেদের চাকরীর আবেদন নিবেদন পত্রে, একেবারে অস্থির হয়ে পড়েছেন। শুনেছ, এ বৎসর, সরকারের তার বিভাগে ১৪টী চাকরীর জন্য, এপ্রেনটিস নেওয়া হবে বলে প্রকাশ করা হয়েছিল। এ খবর শুনে, শুধু বাছনি-পরীক্ষা দেবার জন্য, ঢাকা কলিকাতায় মেট্রিক হতে এম এ পাশ, প্রায় ১৪ শত ছেলে প্রার্থিক হয়ে এসেছিল। দেখ, দেশের অবস্থা। "সুজলা, সুফলা, মলয়জশীতলা, শস্যশ্যামলা, সাগর কুন্তলা"

বাঙ্‌লার ছেলেমেয়েদের পেটে অন্ন জুটেনা, এ দুঃখ রাখবার স্থান কোথায়? কিন্তু এ কি দেশের দোষ? এ দেশের মাঠে, এ দেশের বনজঙ্গলে, এ দেশের পাহাড়পর্ব্বতে, নদনদীতে এবং পশুপক্ষী, কীট পতঙ্গে, সর্ব্বত্র এ দেশের ধন অপর্য্যাপ্ত ছড়ান আছে। আমরা অজ্ঞ, খুঁজে পাচ্ছি না, কুড়িয়ে নিতে জান্‌ছিনা, তাতেই এত দুঃখ, এত দুর্গতি। আমরা ভুলেও দেশের দিকে ফিরিয়ে তাকাই না, তাই দেশের শাপেই আমাদের কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি উঠেছে। সরোজ, যদি বাস্তব ছেলেমেয়েদের পেটভরে অন্ন দিতে চাও, তাদের মন হতে, চাক্‌রীর লিপ্সা মুছে ফেল। এমন জ্ঞান তাদের দাও, যেন তারা দেশের মাটি হতে, সোণা তুলতে পারে। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছারপত্র নিয়ে হাজির হলে, দেশের ধনাগার উন্মুক্ত হবে না। ধন্না দিয়ে দেশের দুয়ারে পড়ে থাকতে হবে, তবে দেশ ইহার রত্নভাণ্ডার খুলে দেবে — অফুরন্ত ভাণ্ডার, যত ইচ্ছা, তারা নিতে পারবে, যত ইচ্ছা, পরের কাছে বেচে লাভ করতে পারবে। নিজের দেশটার সঙ্গে একবার ছেলেমেয়েদের বেশ করে পরিচয় করে দাও। তারা দেশের মাঠঘাট ঘুড়ে, বনজঙ্গল ফিরে, নদনদী খুঁজে, দেশের মাটী খুঁড়ে, দেশের ধন বের করে আনবে এবং দিব্বি সুখে উদর পূর্ত্তি করবে। তোমাদের আর ভাবতে হবে না। এ পরিচয়ের মূলে, শিক্ষা। তাদের মনোবৃত্তি গুলো, সাধারণ ভাবে, স্বাভাবিক উপায়ে ফুটিয়ে তোল।

প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-প্রেসে ফেলো না, তেলীদের ঘানির গরুর মত, তাদের চোখে মালা দিয়ে, তাদের দৃষ্টিটা শুধু পরীক্ষার দিকে ফিরিয়ে রেখ না। তাদের মনটা 'চাকরী' বুলি নিয়ে, চাতক পাখীর মত, শূন্যে ঘুড়তে দিও না।

লীলা। মা, এও কি তোমার গৃহ-শিক্ষার কাজ। তুমি কি বলতে চাও, ব্যবসা বাণিজ্য, কৃষি শিল্প ইত্যাদি উদর পূর্ত্তির নূতন নূতন ব্যবস্থা করা, গৃহ-শিক্ষার দ্বারা সম্ভব হবে?

মা। চেষ্টায় দোষ কি? যদি ছেলেমেয়েদের বাস্তব জ্ঞান শিক্ষার দিকে তোমাদের সজাগ দৃষ্টি থাকে, তাদের অন্ন সংস্থানের জন্য ভাবনা থাকে, কোন পথ ধরে তারা উদর পূর্ত্তি করবে, সেটা গৃহেই ঠিক করে দিতে পারবে। এবং সেভাবে তাদের দেহ ও মন গড়ে তুলতে পারবে। গৃহেই মানুষের মনুষ্যত্বের পত্তন হয়। যদি এ ভিত্তিটা বেশ মজবুত করে, তৈরী করে দিতে পার, তারা সংসারে যে কোন ক্ষেত্রে, সাহসের সঙ্গে, নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারবে। কামানের গোলার মত, যে দিকে ছোটাবে, সে দিকে পথ করে যাবে। শরীরে যার বল আছে, চরিত্রের যার জোর আছে, জ্ঞানের আলো যে পেয়েছে, তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে কে? তার পথে, কে বাধা দিতে সাহস করবে? এ রকম মানসিক বলে তাদের বলীয়ান কর, দেশের ধর্ম ভাণ্ডার তাদের সামনে খুলে রাখ, তারা নিজেরাই তাদের উপযোগী ক্ষেত্র, ছেলেবেলা হতে, ঠিক করে রাখবে।

সরোজ। এ রকম মানসিক বল ও জ্ঞান, শুধু শিক্ষায় কখনও হয় না। পূর্ব্বপুরুষ হতে কিছু সম্বল পাওয়া চাই।

মা। না, সরোজ। শিক্ষা ক্ষেত্রে বংশানুক্রম খাটে না। পিতৃপুরুষের দোহাই দিয়ে, যে রেহাই পাবে, সে উপায় নাই। কোন কোন ছেলের চেহারা দেখে, মতি গতি দেখে অনেক সময় বলতে পারা যায়, ছেলেটী কার, এবং কি রকম পরিবারে পালিত হয়েছে। কিন্তু ছেলের বিদ্যাবুদ্ধি দেখে, বলতে পারবে না, ছেলেটী কার — পণ্ডিতের কি মূর্খের ছেলে। পণ্ডিতের ছেলে, বংশানুক্রম মতে, পণ্ডিত না হয়ে তার উল্টা হতে দেখা গেছে। শিক্ষা-ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েদের স্বাধীনতা যথেষ্ট। বংশানুক্রমের চাপে তাদের জ্ঞানবৃত্তি কোন অংশে সঙ্কুচিত হয় না, যেদিকে চালাবে, যে বৃত্তি ফুটাতে চাবে, সে দিকে ছেলেরা চলবে, সে-বৃত্তিই তাদের ফুটে উঠবে। তাই এ ক্ষেত্রে ও গৃহ-শিক্ষার বিলক্ষণ কাজ আছে। এবং যথাসময়ে ইহার সুব্যবস্থা করতে পারলে, সুফল অবশ্যম্ভাবী।

লীলা। তবে মা, এ জ্ঞান লাভের উপায় কি? গৃহে আমরা কী রকম বন্দোবস্ত করতে পারি?

মা। আমাদের দেশে, একটী ধারণা অনেক কাল হতে চলে আসছে যে, ছেলেরা বেশ বড় হলে, তাদের 'হাতেখড়ি' দিতে হয় অর্থাৎ লেখাপড়ার ব্যবস্থা করতে হয়। ছেলেবেলায় শিক্ষার কোন রকম ব্যবস্থা করলে, অনেকেই মনে করেন যে

তাতে ছেলের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, মনের অবসাদ জন্মে। বর্ত্তমান যুগের চিন্তাশীল পণ্ডিতগণের অনুসন্ধানের ফলে, এ ধারণার ভিত্তি অনেকটা হাল্‌কা হয়ে গেছে। ছেলেদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মত, জ্ঞানের ও ক্রম বিকাশ হয়। ধারণাশক্তি ও চিন্তাশক্তি অন্যান্য শক্তির ন্যায়, ছেলেবেলা হতে একটু একটু করে বাড়্‌তে থাকে। এ অবস্থায় খেলার মধ্য দিয়ে, বেশ আমোদ জনক ভাবে, ছেলেবেলা হতে ছেলেদের জ্ঞান বিকাশের চেষ্টা কর্‌লে, শরীর ক্ষয় বা মনের অবসাদের আশঙ্কার কোন কারণ থাকে না। বস্তুতঃ মানসিক রোগে বিশেষজ্ঞগণ এখন বল্‌ছেন যে, শিশুকালে জ্ঞান-শিক্ষার চেষ্টা মানসিক অবসাদ কি শারীরিক দৌর্ব্বল্যের কারণ নয়। পরন্তু তার অভাবই এই রোগের কারণ। ছেলেদের অস্থি শক্ত না হতে, অতি বেশী ভার তাদের বইতে দিলে, তাদের হাড় ভেঙ্গে বা বেকে যাবার যেমন আশঙ্কা থাকে, এ ক্ষেত্রে ও অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে দিলেই, মানসিক শক্তি-বিকাশের বাধা হতে পারে, এবং স্বাস্থ্যেরও অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু তাতে এ প্রমাণ হয় না যে, তিন চার বছরের আগে জ্ঞানশিক্ষার আরম্ভই কর্‌তে হবে না। সংসারে শিখ্‌বার এত জিনিষ আছে যে, মানুষের এক জীবনে তার কিনারা করা অসম্ভব। এ অবস্থায় জ্ঞান শিক্ষা কখন আরম্ভ করতে হবে, এ রকম তর্কই উঠ্‌তে পারেনা, বস্তুতঃ স্বাভাবিক নিয়মে, জ্ঞানের আরম্ভেই জ্ঞান-শিক্ষার আরম্ভ হওয়া উচিত। এজন্যই পণ্ডিত

হার্বাট স্পেনসার বলছেন 'আমাদের পাকস্থলীর মত, মস্তিষ্ককে ও উপোস রাখলে চলবে না, দোল্‌নাতেই শিক্ষার আরম্ভ করতে হবে।' মনস্তত্ত্বে বিশেষজ্ঞগণের এ-উক্তির সত্যতা, আজ এমন জ্বলন্ত ভাবে জার্ম্মেণী, আমেরিকা ও ইংলণ্ড প্রমাণ করে দিচ্ছে যে, এখন তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ হওয়ার আর সম্ভাবনা নেই। এই বাল্য-শিক্ষার ফলে, জার্ম্মেণীর কার্‌ল্‌উইট, চোদ্দ বছর বয়সে দর্শন শাস্ত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ উপাধি পেয়েছেন। এগার বছর বয়সে, জেমস সিডিস আমেরিকায়, হার্বাট বিশ্ববিদ্যা-লয়ে অঙ্ক-শাস্ত্রে অতি জটিল বিষয়ে বক্তৃতা করতেন। নয় দশ বছর বয়সে. বালিকা ষ্টোনার, সকল শাস্ত্রে এমন শিক্ষা পেয়েছে যে, আমেরিকার শিক্ষা-সমাজ তা দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেছে এবং তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ষ্টোনারের মাতাকে দিয়ে ষ্টোনারের শিক্ষা-প্রণালী বিষয়ে বই * লিখিয়ে প্রকাশ করেছেন। লীলা, হয়ত, বলবে, তাদের মধ্যে প্রতিভা না থাক্‌লে, এত অল্প বয়সে, এমন অসাধারণ জ্ঞান লাভ হতে পারে না। কিন্তু এই ছেলেমেয়েদের পিতা মাতারাই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তাঁদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে, তাঁরা অসাধারণ কিছুই দেখতে পান্‌নি। বস্তুতঃ ছেলেবেলা হতে তাঁদের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলেই, তাঁদের ছেলেমেয়েরা দেহ ও মনের এ রকম অত্যাশ্চর্য্য পুষ্টি লাভ করেছে।

* Natural Education.

সরোজ। মা, ছেলেবেলা হতে, কিভাবে ছেলেদের জ্ঞান-শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে, তা বুঝতে পারলুম না। এ বয়সে ছেলে মেয়েরা জ্ঞানের কোন ধার ধারেনা। খাওয়া পরা খেলা নিয়েই তারা ব্যস্ত।

মা। তারা যে ব্যস্ত, তা নয়। তাদের খাওয়া পরা নিয়ে তোমরাই ব্যস্ত। তোমরা তাদের জ্ঞানের দিকটা দেখনা বলে যে, তারা ছেলেবেলা হতে জ্ঞান লাভ করেনা, তা নয়। তাদের যা করবার, প্রকৃতি ছেলেবেলা হতে, তাদের দ্বারা তা করিয়ে নেয়। এক বছরের শিশু যেটুকু জানে, দু'বছরের শিশু তার চেয়ে বেশী জানে, তিন বছরের শিশু আরও বেশী জানে। এভাবে বছর, বছর শিশুরা জ্ঞান পথে এগোয়ে যাচ্ছে, তোমরা সেদিকে দেখ, আর না দেখ।

লীলা। শিশুকাল হতে, ছেলেরা যদি প্রকৃতি হতে জ্ঞান লাভ করে, তবে সেদিকে পিতা মাতার দৃষ্টি রাখবার দরকার কি ?

মা। হাঁ, লীলা। মার বুক হতে দুধ চুষে, শিশুরা যেমন দেহ পুষ্ট করে, প্রকৃতির বুক হতে জ্ঞান চুষে, তারা জ্ঞান বৃদ্ধি করে। প্রকৃতি হতে সৌন্দর্য্য গ্রহণ করে, নিত্য নূতন ভাব গ্রহণ করে, তা'রা তাদের জ্ঞান-ভাণ্ডার পূর্ণ করে। তাই তোমাদের কর্ত্তব্য প্রকৃতির সাহায্য করা। শিশুদের শিক্ষার দুয়ার অর্থাৎ তাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়াদি বেশ উন্মুক্ত করে রাখা — প্রকৃতির বিভিন্ন দিকে, বিশেষত সৌন্দর্য্যের দিকটায়, বেশীর ভাগ তাদের মন ফিরিয়ে রাখা।

সরোজ। প্রকৃতির সাহায্য আমরা কি করে করতে পারি, তা ঠিক বুঝ্‌তে পারলুম না, মা।

মা। শিশু-শিক্ষার মূল সূত্রটা যদি ধরতে পার, তবে বুঝ্‌তে পারবে, তোমরা কি ভাবে প্রকৃতির সাহায্য করতে পার। চোখ, নাক, কাণ, ত্বক্‌, জিহ্বা এই পাঁচটী ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রকৃতির সঙ্গে শিশুরা পরিচিত হয়। তদ্দারা তারা বাহ্য জগতের জিনিষাদি চিন্‌তে পারে অর্থাৎ তাদের আকৃতি, নাম, প্রকৃতি, ইত্যাদি বিষয় জান্‌তে পারে। চিন্তা বা কল্পনা করে এ বয়সে শিশুরা জ্ঞান লাভ করতে পারে না। এ বয়সে তাদের জ্ঞান বস্তু-মূলক স্বরূপজ্ঞান অর্থাৎ বাহ্য-ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য-বস্তুতে আবদ্ধ। তাই শিশুরা প্রকৃতির সব দিকেই মনোযোগ দেয়, ভাল দিকে যেমন তাদের দৃষ্টি যায়, খারাপটার দিকেও মনোযোগ যায়। সুন্দর জিনিষ যেমন তাদের চোখে পড়ে, কুৎসিৎটাও তারা দেখে। সুন্দর সুরটা যেমন তাদের কাণে যায়, কর্কশ আওয়াজটাও তেমনি তারা শোনে। এ জন্য তোমাদের সাহায্যের দরকার হয়ে পড়ে। জলের তৃষ্ণা পেলে, ছেলেরা সামনের যে জলটা পায়, ভাল মন্দ বিচার না করে, মুখে তুলে নেয়। তোমরা কিন্তু অসুখের ভয়ে অপরিষ্কার জলটা মুখ হতে ফেলে দিয়ে, পরিষ্কার এক গ্লাস জল, তাদের খেতে দাও। এখানেও এ-ভাবে, তাদের জ্ঞান-লাভের সাহায্য করতে হবে। প্রকৃতির মন্দ দিকটা হতে তাদের মন উঠিয়ে নিয়ে, ভাল দিকটায় বসাতে হবে

কুৎসিৎ জিনিষটা হতে চোক ফিরিয়ে, সুন্দর জিনিষটায় চোক লাগাতে হবে।

লীলা। নূতনের প্রতি ছেলেদের বেজায় ঝোঁক দেখতে পাই, মা।

মা। সত্যি, তা না থাকলে, তারা কিছুই শিখ্‌তে পারত না। জ্ঞান লাভের যেমন আগ্রহ শিশুদের থাকে, তাদের জ্ঞান-শিক্ষা দেবার আগ্রহ তেমনটা, যদি তোমাদের মধ্যেও থাকে, তবে ছেলেবেলা হতে ছেলেরা জ্ঞানী হয়ে ওঠা, কিছুই বিচিত্র বা অসম্ভব নয়।

সরোজ। জ্ঞান-শিক্ষা দেওয়া যায় কি উপায়ে?

মা। নূতনের প্রতি কৌতূহল, বা সজাগ দৃষ্টি, তাদের শিক্ষার প্রথম সোপান। পাঁচ বছরের নীচের শিশুর মধ্যে এ কৌতূহল বিশেষ ভাবে দেখা যায়। নূতন কিছু দেখলে পর, তারা বেশ মনোযোগ দিয়ে, একবার, দু'বার, তিনবার করে ঘুরে ফিরে জিনিষটা বেশ করে দেখে নেয়। এ ভাবে পুনঃ পুনঃ দেখে, তারা জিনিষটার আকৃতি, প্রকৃতি বেশ মনে রাখে। পরে জিনিষটা না দেখেও, স্মৃতির সাহায্যে, তার নাম, আকৃতি ও গুণ বিষয়ে অনেক কিছু বলতে পারে। তাই এ বয়সে, তাদের চোখের সামনে, সুন্দর সুন্দর নানা রকমের, নূতন নূতন, ভিন্ন ভিন্ন জিনিষ নিয়ে এস। তারা জিনিষের বৈচিত্র্যে আকৃষ্ট হবে। নানা রকমের রঙ দেখে, জিনিষের নানা রকম আকার দেখে, তারা জিনিষের পার্থক্য বুঝ্‌বে। হাতে লয়ে, জিনিষের

ওজন বুঝ্বে, হাল্কা কি ভারি জান্বে। বার বার শুনে, জিনিষাদির নাম, তাদের কাণে লেগে থাকবে। তাই বস্তু-জ্ঞানের যখন আরম্ভ হয়, তোমরা একটু সচেষ্ট হলে, এ জ্ঞানটাকে বেশ পাকা করে তুল্তে পার। ছেলেরা বস্তুর নামটা, যেমন তোমাদের মুখ হতে শিখে নেয়, বস্তুর আকার গুণ সংখ্যা প্রভৃতিও তেমনি শিখে নিতে পারে। কিন্তু তত দরকারী নয় বলে, শেষোক্ত বিষয় গুলোর দিকে তোমরা মোটেই খেয়াল কর না।

এ বস্তু-জ্ঞানের সঙ্গে, ছেলেবেলা হতে, নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভে তাদের সাহায্য কর্তে পার। টেবিলে বসে, দোয়াত, কলম, বইয়ের সাহায্যে, বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন নাম, আকার, আয়তন, সংখ্যা, ওজন, সাদৃশ্য ও পার্থক্য প্রভৃতি শেখাতে পার। গোল দোয়াত কি চৌকোণা দোয়াত দিয়ে, জ্যামিতির বৃত্ত বা চতুর্ভুজ, কলম দিয়ে, সরল-রেখা, বক্র-রেখা, কোণ, ত্রিভুজ, বইয়ের দুই কিনারা ধরে, সমান্তরাল রেখা, ইত্যাদি শেখাতে পার। দুহাতে দুখানা জিনিষ তুলে দিয়ে, জিনিষের আপেক্ষিক ভার, বোঝাতে পার। কয়েকটী বস্তু একত্র করে অথবা কড়ি বা তেতুল বিচি দিয়ে ১ হ'তে ১০ পর্য্যন্ত সংখ্যা শেখাতে পার। একটী দোয়াত, আর একটী পাতলা খাতা হাতে দিয়ে, শেখাতে পার যে, শুধু আকারে বড় হলে জিনিষ ভার হয় না। এ ভাবে ক্ষেত্রতত্ত্ব, গণিত ইত্যাদ বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান বিনাশ্রমে তারা শেখে নেবে, এর জন্য স্কুলে, মুখস্থ করে, আর হয়রান হ'তে হবে না।

জিনিষের সাদৃশ্য ও পার্থক্য সূক্ষ্ম ভাবে বোঝাতে, জ্ঞানের বিকাশ হয়। যে ছেলের মধ্যে, এই শক্তি বেশী আছে, জ্ঞান-লাভ তার পক্ষে অনেকটা সহজ হয়ে পড়ে। যার ভিতর এ শক্তি দেখতে পাওয়া যায়, আমরা তাকে 'চালাক' ছেলে বলি, যার ভিতর এ শক্তি দেখতে পাই না, তাকে বলি 'বোকা।' চিন্তাশীল পণ্ডিত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'শিক্ষা-বিষয়ক চিন্তা' নামক গ্রন্থে লিখেছেন — 'ছেলেমেয়েদের দর্শন ও শ্রবণ ইন্দ্রিয়াদির প্রখরতার ন্যূনাধিক্যের হিসাবে, তাদের মধ্যে বুদ্ধির ন্যূনাধিক্য দেখতে পাওয়া যায়।' * তাই ছেলেবেলা হতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জিনিষের প্রতি তাদের ইন্দ্রিয়াদি সযত্নে এমন ভাবে সজাগ করে রাখবে, যেন তারা চট্ করে জিনিষের সাদৃশ্য বা পার্থক্য ধরতে পারে। ছেলেদের শ্রবণ শক্তি সাধারণতঃ বড় তীক্ষ্ণ। কোথাও একটু টু শব্দ না হতে, তারা কাণ আলুগা করে। শব্দের উচ্চ নীচ স্বর বা তাল তাদের কাণে যায়। ছেলেবেলা হতে যদি স্বর তালে তাদের ইন্দ্রিয় সজাগ থাকে, বড় হলে পর, তারা সঙ্গীত বিদ্যায় দক্ষ হয়ে উঠবে। চেচামেচি ভালবাসবে না। আর যদি সর্ব্বদা কাণের কাছে বেসুরা শব্দ করতে থাক, বাড়ীতে সর্ব্বদা চীৎকার করতে থাক শ্রবণ ইন্দ্রিয়টা ভোঁতা হয়ে যাবে। তারা সুরের বৈষম্য ধরতে পারবে না। তেমনি চোখের কাছে যদি বরাবর

* A Few Thoughts on Education.

কুৎসিত জিনিষ রাখ, তারা সৌন্দর্য্যের আদর করবে না, সুন্দর কুৎসিত তফাৎ করতে পারবে না।

লীলা! মা, ছেলেদের কি এ সব শেখান সম্ভব? "পদার্থ-বিদ্যা বা গণিত বিদ্যায়, এ বয়সে তারা আমোদ পাবে কেন?

মা। এ সব বিষয় আমোদের হিসাবে যদি না শেখাতে পার, তবে এ বয়সে পাঠের ভাবে এ সব জটিল তত্ত্ব তাদের শেখান কখনও সম্ভব নয়। খেলার ভিতর দিয়ে, দশ রকমের আমোদের ভিতর দিয়ে, এ সব জ্ঞান তাদের দিতে হবে। বই পড়ে, উপদেশ শুনে, এ-বয়সে শিক্ষা চল্‌বে না। পাঠের নাম কর্‌লে, তারা একদম ফিরে বস্‌বে। তাই নিত্য নূতন শিক্ষা মূলক খেলার বন্দোবস্ত করে দিতে হবে। যদি স্কুলের-পাঠের মত পাঠ দিয়ে, জোরে শেখাবার চেষ্টা কর, ছেলেদের মন পাবে না, চেষ্টা বৃথা হবে। সাত রঙের সাত রকম ভিন্ন ভিন্ন আকারের সাতটী খেল্‌না নিয়ে, তাদের সঙ্গে খেলতে বস, দেখতে পাবে তারা সাতটী রঙ চিনে নেবে খেলনার মধ্যে সাদৃশ্য ও পার্থক্য দেখে উৎসাহের সঙ্গে তারা বস্তু বিষয়ক দরকারী জ্ঞান লাভ কর্‌বে। তারা ক্রমে সব কয়টী রঙের নাম, জিনিষের নাম, আকার আয়তন গুণ ভার, সংখ্যা ইত্যাদি বল্‌তে পার্‌বে। খেলনার সঙ্গে যদি বর্ণমালা মিশিয়ে দাও, কাঠের টুকরায় বা কার্ডবোর্ডে অক্ষর গুলো 'চিত্র করে দাও, তবে খেলার সঙ্গে তাদের বর্ণ-পরিচয়ও সহজে হয়ে যাবে।

এ বয়সে ছেলেমেয়েরা একটু একটু করে অনেক কিছু মনে রাখতে পারে। বস্তু-জ্ঞানের সঙ্গে ছেলেরা যখন প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়, প্রকৃতির দৃশ্য দেখে, তারা বেশ আমোদ পায় এবং তদ্‌বিষয়ে ছোট ছোট কবিতা তারা মার মুখে শুনে, বেশ মনে রাখে। কবিতার বর্ণনার সঙ্গে, তাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের একটা মিল দেখে, তারা এসব কবিতা শুনতে বেশ ভালবাসে।

চেয়ে দেখ কত ফুল ফুটিয়াছে কাননে;
কি ওটি, গোলাপ বুঝি
রহিয়াছে আধ' বুজি
ললিত মাধুরী যেন লেখা ওর আননে।
* * * * 'বনফুল'।

পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল॥
রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে।
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে।
* * * * 'প্রভাতবর্ণনা'।

উপরোক্ত রকমের প্রাকৃতিক বস্তু বা দৃশ্য বিষয়ক কবিতা শুনে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের দিকে তাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, তাদের আমোদ জন্মে এবং ক্রমে এ সব বিষয়ে তাদের কল্পনা ও চিন্তা খেল্‌তে থাকে। এ অবস্থায় বিস্ময় উৎপাদক চিন্তাকর্ষক অন্য ভাবের ছোট কবিতা তাদের শোনালে তাদের

চিন্তাশক্তি আরও জাগ্রত হয়, তারা নিজেরা প্রাকৃতিক ঘটনা বিষয়ে চিন্তা বা বর্ণনা করতে চেষ্টা করে।

হুড়্ হুড়্, গুড়্ গুড়, মেঘ ডাকিছে।
মাঠ পথ ছেড়ে লোক, বাড়ী আসিছে॥
চিক্ মিক্ বিদ্যুতের আলো জ্বলিছে।
চ'ক্ষ্ গেল, বলে লোক চ'ক্ষু ঢাকিছে॥
কড়্ কড়্, হড়্ হড়্, বাজ পড়িছে।
কাণ যায়, প্রাণ যায়, বুক কাঁপিছে॥
* * * * 'ঝড় ও বৃষ্টি'।

জন্মিয়ে যে দিন ভাই প'ড়েছি মাটিতে —
দাঁত নাই, শক্তি নাই, কিছুই খাইতে॥
ভাগ্যে ভাই, মার বুকে দুধ টুকু ছিল।
জিভ দিয়ে চুষে তাই, জীবন বাঁচিল॥
ভাগ্যে ভাই, মা বাপের ছিল এত স্নেহ;
তা না হ'লে কে পালিত — কে রাখিত দেহ?
* * * * 'ঈশ্বর'।

গানে ও কবিতায় ছেলেরা আশ্চর্য্য রকমে মুগ্ধ হয়। সাপুড়ের বাশীর সুরে, যেমন সাপ মাথা নীচু করে, বাড়ীতে মেয়েদের গান ও ছড়া শুনে অস্থির ছেলেরা শান্ত হয়। এভাবে বস্তুজ্ঞানের সঙ্গে ছেলেদের যখন চিন্তা-শক্তির বিকাশ হতে আরম্ভ হয়, তারা অত্যাশ্চর্য্য অসম্ভব গল্প শুনতে ভালবাসে। তাদের এ কৌতূহল পূর্ণ কর্‌বার জন্যই, দিদিমা ও ঠাকুরমারা কত গল্পের সৃষ্টি করে গেছেন

আমরা সকলেই জানি। শিক্ষার হিসাবে এ সব ছড়া ও গল্পের যথেষ্ট মূল্য আছে। এ সব ছড়া ও গল্পে. ছেলেদের কল্পনাশক্তি জাগ্রত হয়। অদৃশ্য, অদ্ভূত ভূতের গল্প শুনে, ছেলেরা নিজেরা মনে মনে অদ্ভূত ঘটনা কল্পনা করে। আমরা অনেক সময় দেখতে পাই, মেয়েরা পুতুলকে জীবন্ত-খোকা কল্পনা করে, খাওয়াচ্ছে শোয়াচ্ছে, মার মতই কোলে দোলাচ্ছে, ভূতের নাম করে, ভয় দেখাচ্ছে। এই গল্পগুলো সকল সময় দৈত্য, দানব, ভূতপ্রেতের অথবা নিতান্ত অসম্ভব তাজ্জব ব্যাপারের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে, যদি পৃথিবীর ইতিহাসের বিচিত্র. অত্যাশ্চর্য্য অসাধারণ ঘটনাবলীর মধ্যে আন্‌তে পার, তবে দু'দিক রক্ষা পায়। ছেলেদের গল্প শুনার সখ মিটে. দেশের ইতিহাস ও কিছু কিছু শেখা হয়। রাজস্থানের অদ্ভূত কীর্ত্তিকাহিনী, রোম গ্রীশের অপূর্ব্ব ঘটনাবলী যদি বেশ একটু গুছায়ে, গল্পের ছলে, বলতে পার, তারা বেশ আগ্রহ করে পৃথিবীর ইতিহাসের প্রধান প্রধান ঘটনা জান্‌তে পারে। আমার মনে হয়, এ ভাবে তোমরা যদি ছেলে বেলা হতে সাহায্য কর, ছেলেরা অনেক কিছু শিখতে পারে, এবং তোমাদের এ-চেষ্টা তাদের মানসিক শক্তি বিকাশের কোন বাধা জন্মাতে পারে না।

লীলা। মা, খেলা গল্প ও কবিতার সাহায্যে জ্ঞাতব্য বিষয় গুলো. শিশুদের না হয়, শেখাবার চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু ছেলেদের বেলা এ নিয়ম খাটুবে না। তারাতো গল্প

শুন্‌তে তেমনটা আগ্রহ দেখায় না, আর সকল সময়ে তাদের নিয়ে খেলি বা গল্প করি, সে সুযোগই বা কোথায় ?

মা। বাল্য-শিক্ষা বিষয়ে ও শিক্ষা-নীতির মূল সূত্র একই, তবে বয়সের হিসাবে, নিয়মটার একটু পরিবর্ত্তনের দরকার। এ বয়সে তাদের হাতে বই দিতে হয়, নিয়মমত পাঠের বন্দোবস্ত করতে হয়। কিন্তু আমরা মনে করি, স্কুলে পাঠিয়ে আমরা নিষ্কৃতি পেলুম। ছেলেরা বই হাতে করে স্কুলে যায়, স্কুল হতে পাঠ নিয়ে আসে, বাড়ীতে পাঠ মুখস্থ করে, পর দিন স্কুলে পাঠ বলে। এভাবে সম্প্রতি জ্ঞান-শিক্ষা চল্‌ছে, কিন্তু লীলা মনে রেখো, বাল্যশিক্ষার সময়ও তোমাদের উদাসীন হয়ে থাক্‌বার যো নেই। ছেলেরা কি রকম বই পড়্‌ছে, তারা কোন ইন্দ্রিয়, কি ভাবে, চালনা কর্‌ছে, সতত সে দিকে তোমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে। বই হতে পাঠ না দিয়ে, যদি কোন কোন সময় প্রকৃতি হতে পাঠ দিতে পার, তবে অনেক উপকার হয়। বই প'ড়ে বিদ্যা আর কত লাভ হতে পারে ? তা'তে খাট্‌নীর হিসাবে, লাভ বড় কম। প্রকৃতির উন্মুক্ত বিশাল গ্রন্থ পাঠ করে জ্ঞানার্জ্জনের প্রবৃত্তি যদি তাদের মধ্যে জাগায়ে দিতে পার, তবে তাতে খাটুনী কম, অথচ লাভ যথেষ্ট। তা'তে যা জ্ঞান হয়, তাই সার জ্ঞান। এবং তার জন্য যা পরিশ্রম তা গায়ে লাগে না।

লীলা। মা, ছেলেরা পড়বে, পাঠ মুখস্থ করবে, তা'তেও লাভালাভ বিচার কর্‌তে হবে ?

মা। বিচার না কর্‌লে, চলবে কেন?

সরোজ। যদি নাই পড়তে পার্‌ল, তবে জ্ঞান হবে কিসে মা? তুমি একদিকে বলছ, ছেলেদের জ্ঞান শেখাতে হবে, অন্যদিকে বলছ, পড়তে দিওনা, মুখস্ত করে মাথা বোঝাই করে দরকার নেই।

মা। সরোজ, প্রকৃত জ্ঞান হয় কিসে, জান?

সরোজ। কেন মা, লেখাপড়াতে।

মা। লীলা, তুমি কি বল, শুধু পাঠে জ্ঞান হয় কি?

সরোজ। তবে মা, জ্ঞান হয় কিসে?

মা। শুধু পাঠে জ্ঞান হয় না, হজম করতে না পারলে, যেমন শুধু খাওয়াতে শরীর পুষ্ট হয় না। আয়ত্ত কর্‌তে না পারলে, শুধু লেখাপড়াতে জ্ঞান হয় না। জীর্ণরস দিয়ে যেমন খাদ্যটা ভিতরে হজম করে নিতে হয়, চিন্তারস দিয়ে পাঠটা, বেশ করে আয়ত্ত করে নিতে হয়। পড়াটা বাইরের জিনিষ, চিন্তাটা ভিতরের জিনিষ।

সরোজ। ছেলেরা নিজেরা চিন্তা না করলে আমরা কি করতে পারি?

মা। তোমরা ঘরে বসে অনেক করতে পার। আমার বিশ্বাস দেশকে জ্ঞানে উন্নত করতে হলে, সর্ব্ব প্রথমে দেশের মা ও শিক্ষকগণকেই বেশ ভাল তৈরী করে নিতে হয়। তাঁরা যদি নেহাৎ দায়সারার মত শিক্ষা-কাজটা না করেন, তবে দেশের ছেলেমেয়েদের এত দুর্গতি হতে পারে না।

লীলা। মা, কিন্তু আমাদের দেশে শিক্ষা কাজটা নেহাৎ সহজ কাজ বলে মনে করা হয়, এবং যাঁকে তাঁকে শিক্ষক করে স্কুলে ঢুকান হয়, তাঁরা ত রুটিন-বাঁধা কাজ করেই খালাস।

মা। তাতেই এতটা অনর্থ হচ্ছে। এবং এ জন্যই গৃহে তোমাদের নিজেদের চেষ্টার বিশেষ দরকার হয়ে পড়েছে। তোমাদের সহযোগিতার উপর স্কুল শিক্ষার সুফল নির্ভর করে। শিক্ষা কাজ বড় দায়িত্ব পূর্ণ। মনস্তত্ত্বে অভিজ্ঞ না হলে, ছেলে প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত না হলে, ছেলেদের সঙ্গে মিশতে না জান্‌লে, শুধু পরীক্ষা পাশের জোরে অধ্যাপনা বা শিক্ষা কাজ চল্‌তে পারে না।

লীলা। মা, শুধু কল্পনা বা চিন্তায় জ্ঞানলাভ হয় কি?

মা। তোমরা জান, কৌতুহল বা আমোদ শিক্ষার মূলে। কোন বিষয় জানবার একটা আগ্রহ বা কৌতূহল ছেলেদের মধ্যে দেখ্‌তে না পেলে, তুমি তাকে সে বিষয় শেখাতে পারবে না। কৌতূহল জন্মিলেই, ছেলেরা বিষয়টার দিকে মনোযোগ দেয় এবং বিষয়টা নিখুঁত ভাবে জানতে চেষ্টা করে। এ চেষ্টার মধ্যে তুলনা আছে, যুক্তি আছে, বিচার আছে। অন্য জিনিষের সঙ্গে জিনিষটা তুলনা করে, যুক্তি দ্বারা সাদৃশ্য ও পার্থক্য বিচার করে, জিনিষটা বিষয়ে প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। তাতেই বাস্তব জ্ঞান জন্মে। এভাবে অতি সাধারণ ঘটনা হতে, সাধারণ জ্ঞান হতে, চিন্তার ফলে, একাগ্রতার গুণে অসাধারণ তত্ত্ব বা বিজ্ঞানের প্রচার হয়।

সরোজ। কি রকম মা?

মা। তুমি কি পণ্ডিত নিউটনের কথা শোননি?

লীলা। তিনি না মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব বে'র করেছিলেন? শূন্যে জিনিষ ওঠে, পড়ে কেন, তার কারণ ঠিক করেছিলেন?

সরোজ। এ নূতন তত্ত্ব তিনি কি করে বে'র্ করলেন?

মা। একদিন একটী আতা ফল মাটীতে পড়তে দেখে, তাঁর মনে প্রশ্ন ওঠল, 'ফলটী উপর দিকে না গিয়ে সোজাসুজি নীচের দিকে এল কেন?'

সরোজ। এত অতি সাধারণ ঘটনা মা।

মা। নিতান্ত সাধারণ, কিন্তু বৃহৎ প্রাকৃতিক তত্ত্বের ভিত্তি। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে আম গাছ হতে ঝুর ঝুর করে, আম পড়তে দেখে, কোন ছেলে, কোন দিন জিজ্ঞাস করে, 'আমটা উপর দিকে না গিয়ে, নীচের দিকে এল কেন?' পৃথিবীর যাবতীয় জটিল আবিষ্কারের মূলে, দেখতে পাবে, অতি সামান্য সাধারণ ঘটনা। এ বিশ্বপ্রকৃতিতে জ্ঞানের উপকরণের অভাব নেই, যে কোন পদার্থ বা প্রাকৃতিক ঘটনা অনুসরণ করলেই, জ্ঞানলাভ করতে পারবে।

সরোজ, নিউটনের মনে যে প্রশ্ন উঠেছিল, সে প্রশ্নের মীমাংসা করবার জন্য, তিনি আহার নিদ্রা ছেড়ে দিয়ে একমনে চিন্তা করতে আরম্ভ করলেন। হাজার রকমের প্রশ্ন তাঁর মনে উঠতে আরম্ভ হল — আতাটি নীচের দি[illegible] এলত কোণাকুণি ভাবে এলনা কেন? সোজা আসে [illegible] উপর

দিকে না গেল তো পাশের দিকেও যেতে পারছো, পাখীটা উপর দিকে ওঠে, ঘুড়ি উপর দিকে উঠে যায়, ভারি জিনিষ গুলো কেন উপর দিকে যায় না? ইত্যাদি প্রশ্ন দিন রাত চিন্তা করে, যুক্তি ও বিচারে শেষটা ঠিক করলেন যে, পৃথিবীর এমন এক শক্তি আছে, যে-শক্তি শূন্যের জিনিষ গুলোকে পৃথিবীর দিকে টেনে আনছে। নিউটনের কৌতূহলের ফলে, মনোযোগের বলে, অনুসন্ধান ও চিন্তার জোরে, এমন সত্য তিনি প্রকাশ করে গেলেন, যার ফলে আজ সৌরজগতটা আমাদের নিকট ধরা দিয়েছে — চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র মণ্ডলীর গতিবিধি আমরা বুঝ্‌তে পারছি। জ্ঞানের উৎপত্তি এ ভাবেই হয়। ভারি জিনিষ উপর হতে নীচের দিকে পড়ে এ সাধারণ জ্ঞান সকলেরই তো আছে। কিন্তু এ জ্ঞানে পণ্ডিতেরা সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না। এ জ্ঞান প্রকৃত জ্ঞান নয়। এ সাধারণ বা স্বরূপ জ্ঞানের পিছে যে বৃহৎ জ্ঞান আছে তাকে খুঁজে বের করতে হবে। এ জন্য পণ্ডিতগণ, মানব-প্রকৃতি, জড়-প্রকৃতি, বিশ্ব-প্রকৃতি নিখুঁত করে জান্‌বার চেষ্টা করেন। সাধারণ বস্তু বা ঘটনা নিপুণ চক্ষে পর্য্যবেক্ষণ করে, তৎসম্পর্কে সঠিক বৃত্তান্ত বা কার্য্য-কারণ-সম্পর্ক নির্দ্ধারণ করার নাম বিজ্ঞান বা বৃহৎ জ্ঞান। জ্ঞান-পিপাসুদের ইহাই বাঞ্ছিত জিনিষ। জ্ঞান শিক্ষার ইহাই চরম লক্ষ্য এবং এখানেই সাধারণ লোক আর পণ্ডিতের তফাৎ।

সরোজ। মা, এ বৃহৎ জ্ঞানের কি দরকার, এ রকম জ্ঞান না হলেও তো আমাদের চলে।

মা। তা কি চলে না? অনেকেরই দিন চলে যাচ্ছে তো। মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব জাননা বলে, আতাফলটা তো আর উপর দিকে যাচ্ছে না। অথবা খেতে আতাটা তোমাদের কাছে তেতো লাগ্‌ছে না। জ্ঞান যদি চাও, তবে প্রকৃত জ্ঞান লাভ, যা'তে কর্‌তে পার, তা'রই চেষ্টা ক'র।

লীলা। মা, তবে জ্ঞান-লাভের জন্য, কল্পনা ও চিন্তার কি রকম চালনার দরকার?

মা। কৌতূহল উদ্দীপক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিষ, তাদের কাছে উপস্থিত ক'র এবং তৎসম্পর্কে নানা রকমের সরস আলোচনায়, তাঁদের জ্ঞান-পিপাসার উদ্রেক ক'র। এমন প্রশ্ন ক'র না, যার উত্তর খুঁজে বের কর্‌তে, তাদের বেগ পেতে হবে। প্রথম প্রথম উত্তর-বোধক ছোট ছোট প্রশ্ন ক'র, যেন সহজে, তারা নিজেরা, সামান্য চিন্তায়, উত্তর দিতে পারে। অনেক সময় ছেলেরা নিজেরা অনেক প্রশ্ন করে। শিশুদের প্রশ্নের সহজ ও সঠিক উত্তর দিতে কখনও ভুলো না। শুধু তাদের মনে চিন্তা কি কল্পনা জাগিয়ে চুপ করে থাক্‌লে চল্‌বে না, কল্পনা ও চিন্তা সুপথে চালিয়ে নিতে হবে।

অতি ভয়ানক, কি অতি বিস্ময়-জনক গল্প কি দৃশ্য তাদের কাছে উপস্থিত ক'র না। অত্যুজ্জ্বল আলোক বা

বিকট চিৎকারে, যেমন ছেলেদের দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি নষ্ট হয়ে যায়, তেম্নি বীভৎস ভাব, ভয়াবহ গল্প বা দৃশ্যে তাদের কল্পনা আরষ্ট হয়। অনেক সময় অদ্ভূত ভ্রমন কাহিনী বা বিচিত্র গল্প শুনে, ছেলেমেয়েরা নিজকে সে অবস্থায় কল্পনা করে, অলস চিন্তা বা 'জাগ্রত স্বপ্নে' নিবিষ্ট হয়ে, কর্ম্মশক্তি নষ্ট করে ফেলে। কল্পনাকে যদি চাকরের মত, কাজে খাটাতে পার, অনেক বড় কাজ তদ্বারা হতে পারে। কিন্তু যদি বৃথা চিন্তা, কি শুধু অলস কল্পনার হাতে নিজকে স'পে দাও, তবে ইহা জীবন নষ্ট করে ফেল্‌বে। ছেলেদের 'কল্পনার মানুষ' হতে দিও না। ঈছপস্‌ ফেবলের 'দুধের হাঁড়ি মাথায় গোয়াল্‌নীর' মত, শুধু আকাশ-কুসুম গড়্‌তে দিও না। কোন কোন পণ্ডিত বলেন, ছেলেদের এ ঝোঁক হতেও অত্যাশ্চর্য্য সুফল, সময় সময়, ফলে থাকে।* যখন ছেলেরা বৃথা চিন্তা, কি অদ্ভূত কল্পনায় নিয়োজিত থাকে, তখনি কোন কাজে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ ক'র। কল্পনা, ঘটনা ও সময় পরস্পরা ক্রমে, সূক্ষ্ম হ'তে বৃহৎ, অস্পষ্ট হ'তে ক্রমে স্পষ্টতায় বিকাশ লাভ করে। তাই ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আলাপ কর্‌বার সময়, ঘটনা ও সময়ের শৃঙ্খলার দিকে মনোযোগ রেখো। ঘটনাগুলো এলোমেলো করে, সময় উল্‌টিয়ে পাল্‌টিয়ে অর্থাৎ আগের ঘটনা পিছে, পিছের ঘটনা আগে, এ রকম গোলমাল করে যদি ছেলেদের নিকট কোন গল্প বল,

* The Teachers Hand-Book of Psychology : Sully.

ছেলেদের রচনা-বিভ্রাট ঘট্‌বে। কল্পনার সাহায্যে, কিছু একটা গড়্‌তে, তারা একটা হিজিবিজি করে বস্‌বে। মেঘের কথা বলে, যদি বল বাষ্প হতে মেঘ হয়, তাদের কল্পনা কিছু ধর্‌তে পার্‌বে না। কিন্তু শীতকালে পুকুরের বাষ্পের দিকে, অথবা রান্নাঘরের ধোঁয়ার দিকে, তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে, যদি মেঘের কথা বল, আকাশের গায়ে মেঘ ভাসে কেন, তারা কল্পনা ক'রে, অনেকটা ঠিক কর্‌তে পার্‌বে।

লীলা। অনেক সময় ছেলেরা বেশীক্ষণ মনোযোগ রাখ্‌তে পারে না। তাদের জোর করে বসিয়ে না দিলে, তারা পড়াতে মনই দিতে চায় না। ছেলেদের মনোযোগ রাখ্‌বার উপায় কি, মা?

মা। ছেলেবয়সে বেশীক্ষণ, কোন এক বিষয়ে মনো-যোগ, রাখা শিশু-প্রকৃতি বিরুদ্ধ। ছেলেদের মনটা সর্ব্বদা নানাদিকে ছড়িয়ে থাকে। এ বিক্ষিপ্ত মনকে কুড়িয়ে এনে, যদি একটী বিষয়ে জড় কর্‌তে পার, তবেই, বিষয়টার প্রতি ছেলেদের মনোযোগ আস্‌বে। যখন বিষয় হতে মন উঠে যাবে, তখনি তাকে খালাস দিতে হবে। এর পরও যদি তাকে বন্ধ করে রাখ, তার মানসিক অবসাদ অপরিহার্য্য। কিন্তু আমাদের পরিবারে সময়ের নিক্তি দিয়ে, ছেলেদের লেখাপড়ার ওজন হয়। সারাক্ষণ বই হাতে থাক্‌তে দেখ্‌লে, আমরা মনে করি, ছেলেটীর বেশ লেখাপড়া হচ্ছে। এবং এজন্যই অনেক বাড়ীতে, প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা, ছেলের হাতে

বই দিয়ে, প্রাইভেট্ টিউটারের পাহারায় বসিয়ে রাখা হয়। এ রকম অস্বাভাবিক উপায়ে, জ্ঞানলাভ তো কিছুই হয় না, পরন্তু শুধু বইয়ে চোখ বুলিয়ে, সময় ও শক্তি নষ্ট করা হয় মাত্র। তুমি হুকুম করে বা জোর করে, বইটা হাতে তুলে দিয়ে, বসিয়ে রাখ্তে পার, কিন্তু জোর করে ছেলের মনটা বসাতে পার কি? শিক্ষার কাজ যে সম্পূর্ণ মনের ব্যাপার। জোঁকের মত মনটা লাগাতে না পার্লে, জ্ঞানলাভ হতে পারে না। মন লাগাতে হলে, একটু স্বাদ লাগা চাই। শিক্ষার বিষয়টা বা পাঠটা, তাদের কাছে রসাল করে ধরো, উহাকে অত্যন্ত মনোরম, চিত্তাকর্ষক ও আমোদজনক করে তুলো, তোমাদের আর বেগ পেতে হবে না, তারা নিজেরা, তাদের বিক্ষিপ্ত মন কুড়িয়ে এনে, ঐ বিষয়ে জোঁকের মতই বসাবে, এবং এক মনে চুষে, তারা বিষয়টা হতে, সার বের করে নেবে। কোন এক বিষয়ে ছেলেরা অধিকক্ষণ মনোযোগ রাখ্তে পারে না বলে, বিষয়ের পরি-বর্ত্তন দরকার। পরিবর্ত্তনের মধ্যে যত বৈচিত্র্য থাকে, ততই ভাল, তাতে জ্ঞানের অনেকটা সাহায্য হয়।

লীলা। বিষয়ের বৈচিত্র্যে জ্ঞানের সাহায্য হয়, কি রকম, মা?

মা। বিষয়ের বৈচিত্র্যে আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, এবং মানসিক অবসাদ দূর হয়। তোমরা জান, মুখস্থ-শক্তি জ্ঞান-লাভের অন্য এক অতি আবশ্যকীয় উপায়। আমাদের

মস্তিষ্কের মধ্যে অনেকগুলো কোষ আছে, তোমরা সে দিন দেখেছ। এ কোষ গুলো জ্ঞানের ভঁাড়ার। এক সময়ে সকল বিষয়ে, অবশ্য সমান ভাবে মনোযোগ যে'তে পারে না। কিন্তু মনের পথে যে সব বিষয় আসে, তাদের একটী আবছায়া, মস্তিষ্ক স্বীয় কোষের মধ্যে রেখে দেয়। সেটা সাময়িক ভাবে লুক্কায়িত থাকে বটে, কিন্তু সুযোগ পেলেই প্রকাশ হয়ে পড়ে। এজন্য আমরা দেখ্‌তে পাই, হঠাৎ কোন কোন সময়, অতি প্রয়োজনীয় বিষয় আমাদের মনে এসে, আমাদের বিলক্ষণ সাহায্য করে। এ কারণে জ্ঞান-লাভের উদ্দেশ্যে, স্বভাবের বৈচিত্র্যময় স্থান — সাগরমহাসাগর, পাহাড়পর্ব্বত, নদ নদী প্রভৃতি মনোরম স্থানে যাওয়া হয়। নানা স্থানে বেড়িয়ে, সুন্দর সুন্দর জিনিষ দেখে, সঙ্গে যদি তাদের না আন্‌তে পারি, চোখ বুজ্‌লেই, চোখ-দেখা জিনিষ, যদি অদৃশ্য হয়ে যায়, স্থান পরিত্যাগে, যদি স্থানীয় সৌন্দর্য্য পরিত্যাগ করে আস্‌তে হয়, তবে আর আমাদের জ্ঞানলাভ কর্‌তে হয় না। কিন্তু আমাদের মনটা বিচক্ষণ ভঁাড়ারীর মত, সব কিছু সঙ্গে নিয়ে আসে। তবে মনোযোগের কেন্দ্রীভূত বিষয়টী স্মৃতি-কোষে রক্ষিত হয় এবং অপর জিনিষগুলো সঞ্চয়-কোষের মধ্যে থাকে। চিত্রকর, কবি, বৈজ্ঞানিকেরা, এ সঞ্চয়-কোষ হতে উপকরণ সংগ্রহ করে, চিত্র রচনা করে থাকেন। অভিনেতা কি ওঝারা স্মৃতি-কোষের সাহায্যে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। আমরা দেখ্‌তে পাই, যে জিনিষটার

আমাদের মনোযোগ বেশী গেছে, আমরা বেশীক্ষণ ধরে জিনিষটা নাড়াচাড়া করেছি, সেটা আমাদের সহজে মনে থাকে। ছেলেদের মুখস্থ-শক্তির সাহায্য করতে হলে, বিষয়টা তাদের নিকট চিত্তাকর্ষক করে, বারবার উপস্থিত করতে হয়। তাই ছেলেদের এমন কোন বিষয় মুখস্থ করতে দেওয়া উচিত নয়, যাতে ছেলেদের আনন্দ ও আগ্রহ জন্মে না। আমরা অনেক সময় দেখ্‌তে পাই, ছেলেরা জোরে মুখস্থ কর্‌তে চায়। স্কুলে পাঠ মুখস্থ করে যেতে হবে, কিছু বুঝে না, মন সে দিকে যেতেই চায় না, তবুও মুখস্থ কর্‌তে হবে। ছেলেরা বারবার পড়ে, সেটা মাথাতে ঢুকাতে চায়। এ রকম অস্বাভাবিক মুখস্থ কর্‌বার চেষ্টাতে, শক্তি নষ্ট হয়ে যায় ও মনের অবসাদ জন্মে। মুখস্থ বিষয়টী ও পরক্ষণে ভুলে যায়। ছেলেদের পরীক্ষার সময়, আমরা এ রকম দৃষ্টান্ত প্রায় দেখ্‌তে পাই।

সরোজ। মা, সকল ছেলেমেয়েত পণ্ডিত হয়ে উঠ্‌বে না। যে-সব ছেলেমেয়েরা, জ্ঞানের সে উচ্চ আদর্শের দিকে যেতে চাবে না, তাদেরও তো সংসারে খেটেখুটে খেতে হবে। একটু আধটু সাধারণ জ্ঞান না থাক্‌লে, একালে কেহ মজুর খাটাতেও চায় না। পণ্ডিত যারা হতে চায়, তাদের পক্ষে প্রকৃতি-পরিচয়, অনুসন্ধিৎসা, অনুবীক্ষণ ও একাগ্রতার নিতান্ত দরকার বটে। কিন্তু যারা সে পথে যেতে চায় না, তাদের শিক্ষাটা কি রকমের হওয়া উচিত?

মা। সরোজ, শিক্ষার রকম ভেদ নাই। পণ্ডিত কি

মূর্খকে একই পথ ধরে চল্‌তে হবে। সত্যি, কয়েকটী বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান না থাক্‌লে চলেই না। কার্য্যকরী কোন বিদ্যায় পারদর্শী হতে হলে, ভাষা, গণিত, ইতিহাস ও ভূগোল এই চারটী বিষয়ে অন্ততঃ, বেশ চলন্‌সই সাধারণ জ্ঞান থাকা নিতান্ত দরকার। জ্ঞান-শিক্ষার প্রণালী তোমাদের দেখিয়েছি, এখন উপরোক্ত চারটী বিষয় ধরে, তোমাদের কিছু বল্‌ছি, শোন।

সরোজ। মা, এক একটী করে বল, না।

মা। বল্‌ছি, শোন। সংসারে কি সমাজে থাকতে হলে, ভাষা-শিক্ষা সর্ব্বপ্রথমে দরকার। এ-টী না হলে কিছুতেই চলে না। এ সভ্যতার যুগে, আমাদের যখন অনুক্ষণ নানা দেশের লোকের সঙ্গে মিশ্‌তে হচ্ছে, নানা দেশের গ্রন্থ হতে জ্ঞান সংগ্রহ কর্‌তে হচ্ছে, জ্ঞান কি বিদ্যার উন্নতির পক্ষে, বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা নিতান্ত প্রয়োজন। বিধাতা আমাদের ভাষা-শিক্ষার পথটা এমন সহজ করে দিয়েছেন যে, সে পথে গেলে, আমাদের কোন আয়াসই স্বীকার কর্‌তে হয় না।

লীলা। কি বল্‌ছ মা? ভাষা শিক্ষা কি এতই সহজ? আমরা যে স্কুলে, শুধু ভাষাটা নিয়ে একদম হয়রাণ্‌ হয়ে উঠেছি। সাত আট বছর ক্রমান্বয়ে পড়ে, ব্যাকরণের সূত্র মুখস্থ করেও, দু'কথা ইংরেজীতে বল্‌তে একদম হাঁফিয়ে পড়ি। একি তুমি নিজে দেখ্‌ছ না?

মা। তা বেশ টের পাচ্ছি। কিন্তু লীলা, আমরা

বিধাতার নিয়মে চলি কই? আমরা চাই, চোখ দিয়ে ভাষা শিখ্‌তে, তাতে হাঁফিয়ে না ওঠাই অসম্ভব। ইংরেজী ভাষা শিক্ষা সম্পর্কে আমি পূর্ব্বেও তোমাদের বলেছি।*

তোমরা অবশ্য দেখ্‌তে পেয়েছ যে, ভাষা শিক্ষার প্রণালীটা, আমরা আমাদের শিশুদের নিকট হতে ও শিখে নিতে পারি, যদি নিজেরা সে বিষয়ে চিন্তা কর্‌তে না চাই। ছেলেরা শিশুকালে, কেমন একটু একটু করে, বিনাক্লেশে মাতৃভাষাটা শিখে নেয়। তারা কি তোমাদের মত স্কুলে পাঠ পড়ে, না ব্যাকরণের সূত্র আওড়ায়? চোখ থাক্‌তেই যে, আমরা অন্ধ। প্রকৃতির দিকে একদম মুখ ফিরিয়ে বসে আছি। আমরা আমাদের নিয়ম, প্রকৃতির উপর খাটাতে চাই। প্রকৃতির নিয়মে প্রকৃতিকে ধর্‌তে চাইনে, তাতেই আমাদের এত উদ্বেগ, এত খাটুনী। এ অতি সত্যকথা, এখন স্কুলে যে ভাবে ইংরেজী ও অন্য বিদেশী ভাষা শেখান হয়, সময়ের হিসাবে ছেলেরা যা শেখে, তা কিছুই নয়। ভাষা শিক্ষার সরল সোজা পথ, গৃহে তোমাদের ধর্‌তে হবে। এবং আমার মনে হয় ভাষা, শিক্ষার পক্ষে, গৃহই প্রশস্ত ক্ষেত্র। একজন ভাষাবিদ পণ্ডিত বলেছেন 'যদি ছেলেকে ইংরেজী শেখাতে চাও, তাকে বিলেতে পাঠিয়ে দাও, নচেৎ বিলেত তার বাড়ীতে নিয়ে এস।' বইয়ের ভিতর দিয়ে, ব্যাকরণের সূত্র ধরে, ভাষা শিক্ষা নিতান্ত অস্বাভাবিক এবং ছেলেদের

* গ্রন্থকারের The Child in Nature দ্রষ্টব্য

পক্ষে সে পথ অত্যন্ত ক্লেশজনক ও দুরূহ। ফরাসী দার্শনিক পণ্ডিত মসিয়ো গুঁয়্যা, জার্ম্মেণ ভাষা, এভাবে শিখ্‌তে গিয়ে, কি রকম বিব্রত হয়ে উঠেছিলেন, তিনি তার যা কাহিনী * লিখেছেন, তা পড়ে দুঃখও হয়, যথেষ্ট শিক্ষাও হয়।

তিনি দেখিয়েছেন যে শিশুদের প্রণালী অনুসরণ করলে, ছয় মাসের মধ্যে, যে কোন কথিত-ভাষা, বিনা আয়াসে সুন্দররূপে শেখা যায়।

ভাষা মুখের জিনিষ। মাতৃ-ভাষার মত, মুখে মুখে শিখিয়ে নাও। ছেলেদের সঙ্গে কথাবর্ত্তায়, সর্ব্বদা নূতন ভাষা ব্যবহার ক'র। গৃহের প্রত্যেক জিনিষ দেখিয়ে, নূতন ভাষা প্রয়োগ ক'র। পরিবারের দৈনিক কাজগুলো, ছোট ছোট কথায় নূতন ভাষায় প্রকাশ ক'র। সকালে, দুপুরে, রাত্রে পরিবারের মধ্যে, সাধারণতঃ যা যা ছেলেরা নিত্য দেখ্‌তে পায়, সহজ ছোট কথায়, নূতন ভাষায় তাদের প্রশ্ন ক'র। এবং তাদের হতে সরল সোজা কথায় উত্তর নাও। এভাবে নিত্যনৈমিত্তিক পারিবারিক ঘটনা বা নিত্য ব্যবহারের জিনিষগুলো, নূতন ভাষায় প্রকাশ করতে ছেলেরা বিলক্ষণ আমোদ পাবে। ছেলেদের সঙ্গে কথাবর্ত্তায়, নূতন ভাষার সরল শব্দ বেশী রকমে ব্যবহার, এবং প্রত্যেক শব্দ, বিশেষতঃ ক্রিয়াপদটা পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ ক'র। এভাবে যদি সহিষ্ণুতার সহিত, কয়েক মাস চল্‌তে পার, তবে তোমরা দেখ্‌তে পাবে যে, ছেলেরা

* The Art of Teaching and Studying Languages : Gouin.

বিনাক্লেশে, নূতন ভাষায় বেশ চলনসই কথাবার্ত্তা বল্‌ছে। অনেক ছেলেরা নূতন ভাষা ব্যবহার কর্‌তে লজ্জা বোধ করে, কেননা, শুদ্ধরূপে বল্‌তে পারে না, অথবা ভাব প্রকাশ কর্‌তে জানে না। এ লজ্জা ভেঙ্গে দিতে হবে, ভুল ত হবেই। হাট্‌তে গেলে কত আছাড় খায় না? বল্‌তে চেষ্টা কর্‌লে, ভুল হবে দোষ কি?

মুখের ভাষাতে ভাবটা চিত্তাকর্ষক হয়। লিখিত-ভাষা শুধু ভাবের অভিব্যঞ্জক মাত্র। ভাষা মর্ম্মস্পর্শী কর্‌তে হলে, উচ্চারণটা স্পষ্ট হওয়া দরকার। প্রত্যেক ভাষার শব্দোচ্চারণের পার্থক্য আছে। তাই উচ্চারণটা দেশীয় লোকদের নিকট শিখে নিতে পার্‌লে, বিশেষ ভাল হয়। একজন ইংরেজ, ইংরেজী ভাষাটা যেমন উচ্চারণ কর্‌বেন, একজন শিক্ষিত বাঙ্গালী, ইংলণ্ডে না গেলে, তাঁর উচ্চারণটা ঠিক তেমনটা হতে পারে না। তাই যদি সম্ভব হয়, ছেলেদের উচ্চারণটা তৎদেশীয় লোকের দ্বারা শিখিয়ে নিতে চেষ্টা ক'র। ছেলে বয়সে, উচ্চারণ খারাপ হলে পর, শেষে তা শোধরান্ বড় শক্ত হয়ে ওঠে। কথিত-ভাষায় ছেলেদের চলনসই জ্ঞান হলে পর, বর্ণ-পরিচয়ের চেষ্টা কর্‌তে হয়। বর্ণ-পরিচয়ে লিখিত-ভাষার আরম্ভ হয়। পূর্ব্বে শুধু মুখস্থের সাহায্যে বর্ণমালা শিক্ষা দেওয়া হ'ত। কিন্তু এ প্রণালীতে ছোট ছেলেরা আমোদ পায় না বলে, শিখ্‌তে দেরি হয়। তাই গৃহে, সহজ স্বাভাবিক উপায়ে বর্ণমালা শেখাবার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। কোন এক বর্ণ. ছেলেদের কাছে

উপস্থিত করে. তাদের মুখস্থ কর্‌তে না বলে, অতি সাধারণ অথচ সুপরিচিত, কোন বস্তুর সঙ্গে বর্ণটা তাদের কাছে উপস্থিত ক'র। শুধু 'ক' বর্ণটা ছেলেদের পড়্‌তে বল্লে, ছেলেরা কিছুই রস পাবে না। ছেলেদের মনে কোন ভাব আস্‌বে না। এবং বর্ণটা শীঘ্র শীঘ্র মন হতে ছুটে পালাতে চাবে। কিন্তু 'ক' বর্ণটা, পরিচিত কোন বস্তুর সঙ্গে উপস্থিত ক'র — বল 'কলা', কলা শব্দ মনে রাখা যত সহজ, শুধু 'ক' বর্ণ মনে রাখা ছেলেদের পক্ষে তত সহজ নহে। 'কলা' বল্‌তে, একটী ভাব, একটী বাস্তব জিনিষ, তাদের মনে পড়্‌বে। 'কলা'র সঙ্গে 'ক' বর্ণটা বড় অক্ষরে, যদি তাদের দেখাও, তারা চোখে বর্ণের চিত্র দেখে, কাণে বর্ণের উচ্চারণ শুনে, বর্ণজ্ঞান লাভ কর্‌বে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের সঙ্গে প্রয়োগ হওয়াতে, 'কলার' নাম কর্‌তেই 'ক' বর্ণের আকার ও উচ্চারণ, আনুসঙ্গিকতার নিয়মানুসারে মনে আস্‌বে, ক্লেশকর মুখস্থের দরকার হবে না। এরকম ভাবে স্বাভাবিক উপায়ে, বর্ণমালা শিখ্‌বার পক্ষে, জলধর সেন মহাশয়ের 'সচিত্র বাঙ্গালা পাঠ', রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'সচিত্র বর্ণপরিচয়', যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের 'হাসিখুসি' প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বই বিশেষ সাহায্য কর্‌তে পারে। স্বর ও ব্যঞ্জনের তফাৎ, ছেলেবেলায় বোঝাবার চেষ্টা ক'র না। তোমাদের উচ্চারণ যদি স্পষ্ট ও পরিষ্কার হয়, বর্ণ-যোজনা কালে, এ তফাৎ, তারা নিজেরা ধর্‌তে পার্‌বে

বর্ণপরিচয়ের পর বর্ণ-যোজনা। প্রথমাবস্থায় জানা-শব্দ নিয়ে বর্ণযোজনার চেষ্টা করিও। অজানা-শব্দ গঠন কর্‌তে হলে, ছেলেরা ভারি গোলে পড়ে যায়। জানা-শব্দ বানান কর্‌তে বল, ছেলেরা উৎসাহের সঙ্গে, বর্ণমালা হতে বর্ণ বেছে নিয়ে, শব্দ যোজনা কর্‌বে। বস্তুজ্ঞানে ছেলেরা নূতন নিয়ে থাক্‌তে চায়। কিন্তু ভাব-জ্ঞানে, জানা হতে অজানার দিকে, তাদের চালিয়ে নিতে হয়। শব্দ যোজনার পর, বাক্য-গঠন বা রচনা-শিক্ষার আরম্ভ হয়। ছেলেদের কল্পনা শক্তির এমন বিকাশ হয় না যে, তারা নিজেরা নূতন ভাব প্রকাশের জন্য, কোন বাক্য গঠন কর্‌তে পারে। ভাব-বোধক একটী কথা শুনে, তারা ঠিক সে রকম আর একটী কথা বল্‌তে চেষ্টা করে। 'দাদা পড়্‌ছে' একথা শুনে, তারা দিদিকে পড়্‌তে দেখে, বলে 'দিদি পড়ছে' 'সূর্য্য উঠ্‌ছে' সকালে এই কথা শুনে, রাত্রে তারা আকাশের গায়ে চন্দ্র দেখে বলে, 'চাঁদ উঠ্‌ছে।' উপরোক্ত বই হতে, পরিচিত এক একটী ছবি দেখিয়ে, জিজ্ঞাস ক'র, তারা তাদের ভাষায় এক একটী ছোট কথা বলে যাবে। যখন ছেলেরা মুখে কথা বল্‌তে পারে, হাতে বর্ণমালা লিখ্‌তে শিখেছে, এবং চলনসই ভাব, লিখিত-ভাষায় প্রকাশে সমর্থ হয়, তখন ব্যাকরণ আন্‌তে পার এবং ব্যাকরণের নিয়মানুসারে ভাষাটা বিশুদ্ধ ও মার্জ্জিত কর্‌বার জন্য, তাদের সাহায্য ক'র। ছেলেদের ভাল করে পড়্‌তে শেখাবে।

সরোজ। মা, পড়্‌তে আবার শেখাতে হয় কি? অক্ষর চিন্‌লে, বানান শিখলেই ত পড়্‌তে পারে।

মা। না, সরোজ, পঠনকাজ ও একটা শিল্প। পঠনের একটা ধারা আছে। তা শিখে নিতে হয়। পঠনের গুণেই অনেক সময় লোক আকৃষ্ট হয়। পঠনের ধরনেই শ্রোতার মধ্যে ভাবের উৎস আসে। শুধু বই খুলে, পড়ে গেলে চল্‌বে না। পঠনের ধারা ধরে চল্‌তে হবে। প্রতি শব্দে আবশ্যক জোর ও আবশ্যক স্বরভঙ্গীর দরকার। প্রত্যেক শব্দ পরিষ্কার অথচ স্পষ্ট উচ্চারণ কর্‌তে হবে। প্রতি চিহ্নে, স্বরের যথোচিত পরিবর্ত্তন কর্‌তে হবে। তা হলে একদিকে যেমন ভাষাটা শ্রুতিমধুর হয়, অন্যদিকে বেশ চিত্তাকর্ষক হয়। এ পঠন কাজ শেখাবার জন্য, বিলেতে বিশেষ প্রণালী ও স্কুল আছে। বই খুলে পড়বার আগে, পাঠে কি আছে একটী বার, সংক্ষেপে বেশ করে বলে দাও। এবং একটী বার আস্তে আস্তে, যথানিয়মে পাঠটা নিজে পড়ে শোনাও। ছেলেরা গল্প শুনেই, তোমার পঠন-ক্রিয়ার দিকে মনোযোগী হবে। তারা পরে, তোমার স্বরভঙ্গীর অনুকরণ করে পড়্‌তে চেষ্টা কর্‌বে। প্রত্যেক শব্দ একসঙ্গে উচ্চারণ করবে এবং প্রত্যেক বাক্যাংশ একসঙ্গে উচ্চারণ করে যাবে। পঠন কালে, প্রথমে কোন বাধা দিওনা, একটী বাক্য শেষ হলে পর, ভুল শুধরিয়ে দিও। এভাবে দুই

তিন বার, আস্তে আস্তে উচ্চৈঃস্বরে পড়লে, পঠন কাজ সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠ্‌বে। পঠন কালে, কঠিন, বড় বড় শব্দ গুলো শ্লেটে বা বোর্ডে বড় অক্ষরে লিখিয়ে দিলে, শব্দ গুলোর উচ্চারণ ও বানান ছেলেরা ভুল করে না।

সরোজ। মা ছেলেদের লিখ্‌তেও শেখাতে হয়?

মা। অবশ্যি, আমাদের ছেলেদের চাক্‌রীর যেমন লিপ্‌সা, হাতের অক্ষরটা সুন্দর না হলে 'কেরাণী গিরি' কি জুট্‌বে? হাতের অক্ষর সুন্দর হওয়া, একটী বিশেষ গুণ। ছেলেরা পড়্‌বার আগে, বই হাতে নেওয়ার আগে, লিখ্‌তে চায়। কাগজ পাক্, বই পাক, পিন্‌সিল দিয়ে, কলম দিয়ে ছেলেরা আঁচড় কাটে, হিজিবিজি চিত্র করে। ছেলেদের এ-খেয়ালে বাধা দিওনা। পরন্তু লিখ্‌বার উপকরণ দিয়ে তাদের হাত চালাবার সাহায্য ক'র। আগে এদেশে মোটা কলমে, মোটা অক্ষরে, কলাপাতে লিখন অভ্যাস করা হতো। পাঠশালায়, গুরুমহাশয় কলাপাতায় মোটা করে অক্ষর দেগে দিতেন, ছেলেরা তার উপরে কলম চালিয়ে, লিখা অভ্যাস করতো। কিন্তু এখন মোটা কলমের জায়গায়, সরু নিব, কলাপাতার জায়গায় কাগজ এসেছে। এখন ছেলেরা এ উপকরণ নিয়ে, হস্তলিপি দেখে, অক্ষর লিখে। এ পরিবর্ত্তনে, বড় ভাল হয়েছে, মনে হয় না। ইহাতে ছেলেদের মানসিক পরিশ্রম বেশী হয় এবং অক্ষর গুলো সরু আঁকা বাকা হয়ে যায়। অধিকন্তু কাগজের অতিরিক্ত ব্যয় ত আছেই।

লিখন শেখাতে হলে, প্রথম প্রথম লাইন টানা শেখাও। ছেলেরা প্রথম বাকা রেখা টানে। একটু হাত পাকা হলে, সোজা রেখা টান্‌তে শেখে। তখন নানারকমের খাড়া, হেলান ও শোয়া, সোজা রেখা টান্‌তে শেখাও। এভাবে দুএক দিনের মধ্যে, রেখা টানাতে যখন হাত আস্‌বে, তখন ক্রমে রেখা গুলো, একটা দুটা করে একত্র কর্‌তে দেখাও। তারপর বর্ণগুলো, আকারের জটিলতা হিসাবে শ্রেণী ভাগ করে, তাদের লিখ্‌তে দাও। বর্ণমালার মধ্যে 'ব' খুব সোজা। 'ব' শ্রেণীর বর্ণ হতে লিখা অভ্যাস কর্‌তে পারে—

'ব' শ্রেণীর বর্ণমালা — ব, র, ক, ধ, ঝ, ঋ।

'য' শ্রেণীর বর্ণমালা — য, য়, ষ, ফ, খ, ঘ।

'ন' শ্রেণীর বর্ণমালা — ন, গ, ল, শ, এ, ঐ, স, ঞ, ঢ, ঢ়, ট, ঠ, প, চ, ছ, দ।

'ত' শ্রেণীর বর্ণমালা — ত, অ, আ, উ, ঊ, ভ, ঙ, ড, ড়, ৎ, ত্ত, ঔ, ঌ, ই, জ।

লিখ্‌বার কালে, ছেলেদের বসার ও কলম-ধরার অভ্যাসের উপর, অক্ষরের সৌন্দর্য্য নির্ভর করে। টেবিল কি ডেস্কের সঙ্গে লম্ব ভাবে বসে, কাগজের সঙ্গে সমকোণে হাতটা ক্রমে ডান দিকে সরিয়ে লিখ্‌তে অক্ষর গুলো বেশ খাড়া ও মোটা হয়। আর কাগজটা যদি কোণাকুণি ভাবে রাখ অথবা কলমটি কোণাকুণি করে ধর অক্ষর গুলো

হেলান ভাবে বসে এবং আকৃতির তারতম্য হয়। লিখন-কাজে, চিত্রের দিকটায়, সৌন্দর্য্যের দিকটায় তাদের মনোযোগী করে তুল্‌তে হবে। প্রত্যেক বর্ণের ও শব্দের মধ্যে দূরত্ব বেশ সমান থাকা চাই।

লীলা। পঠন বা লিখন কালে একাগ্রতা না থাক্‌লে, এবং মনটা নানাদিকে ছুটাছুটি কর্‌লে পর, কোনটা ঠিক মতে হতে পারে না, বোধ হয়।

মা। সেজন্য লেখাপড়ার সময়, নির্জ্জনতার নিতান্ত দরকার। ছেলেদের বিক্ষিপ্ত মনকে, কোন এক বিষয়ে কেন্দ্রীভূত কর্‌তে হলে, মনটা এমন ভাবে আবদ্ধ রাখবে, যেন, অন্য কোন বিষয় বা ঘটনা. তাদের মন সংযোগের বাধা না জন্মাতে পারে। পাঠগৃহ বলে আমাদের গৃহে কোন বিশেষ বন্দোবস্ত নেই। প্রত্যেক পরিবারে, ছেলেদের পড়্‌বার স্থানটা আলাদা করে রাখা উচিত, যেন সেস্থানে অন্য লোক আসা-যাওয়া কি গল্প-গুজব করতে না পারে। পাঠ-গৃহটী বেশ খোলামেলা হওয়া দরকার, যেন বাতাস ও আলো আসা-যাওয়া কর্‌তে পারে। লেখাপড়ার সময় আলোটা যেন বাম দিক থেকে আসে, তার বন্দোবস্ত রেখো। যদি সম্ভব হয়, ঘরটা শিক্ষা বিষয়ক বস্তু, ছবি, মানচিত্র, লতা পাতা প্রভৃতি দিয়ে, সর্ব্বদা এমন ভাবে সাজিয়ে রাখ্‌বে, যেন তার ভিতর ঢুক্‌তেই, একটি পবিত্র ভাব মনে আসে। মন্দির যেমন ভক্তের জপ তপের স্থান, পাঠাগার

ও ছেলেদের অধ্যয়ন ও সাধনার ক্ষেত্র। মন্দিরের মত এটাকেও সুন্দর ও পবিত্র করে তুল্‌তে হবে। এবং সযত্নে ইহার সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতা রক্ষা কর্‌তে হবে। পাঠগৃহে ছোট খাট একটী পুস্তকাগার বা লাইব্রেরী ও শিক্ষনীয় প্রাকৃতিক জিনিষাদির একটী মিউজিয়ম বা যাতুঘর, যদি করে দিতে পার, যথেষ্ট উপকার হতে পারে। প্রকৃতি হতে কৌতূহলোদ্দীপক বস্তু সংগ্রহ করে, তারাই তাদের যাতুঘর পূর্ণ কর্‌বে। তা'তে প্রকৃতির দিকে তাদের নজর পড়্‌বে এবং পুস্তকের প্রতি মমতা জন্মিবে। প্রকৃতি ও পুস্তক যদি ছেলেদের সঙ্গী করে দিতে পার, প্রকৃতি চর্চ্চায় ও পুস্তক পাঠে, যদি ছেলেরা বিমল আনন্দ অনুভোগ করে, তবে আর তাদের শিক্ষা বা চরিত্র গঠনের জন্য ভাব্‌তে হবে না। প্রকৃতিও পুস্তকের মত এমন সাধুসঙ্গ দ্বিতীয়টা নেই।

ছেলেদের পাঠগৃহে পাঠিয়ে, তোমাদের নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাক্‌লে চল্‌বে না। ছেলেরা কি বই পড়্‌ছে এবং কি ভাবে পড়্‌ছে, তা দেখ্‌তে হবে। ছেলেদের উপযোগী বই'ও ঠিক করে দিতে হবে। শুধু পড়বার জন্য ছেলেদের হাতে কোন বই দিও না। উদ্দেশ্যহীন পাঠে, একাগ্রতা বা জ্ঞান জন্মিতে পারে না। কোন ছেলে হয়ত দশ মিনিট সাহিত্য পড়ে, বিষয়টা সম্যক আয়ত্ত না হতেই, ভূগোল নিয়ে বসে। ভূগোলে দুচারটা দেশের কথা পড়ে, গল্প বই নিয়ে বসে, অথবা আঁক কষ্‌তে বসে। এ রকম উড়ো

উড়ো ভাবের পড়াতে, অনিষ্ট বই ইষ্ট হয় না। পড়ারও একটা শৃঙ্খলা থাকা চাই। যখন যেটা ধর্‌বে, আঁখের টুকরার মত চিবিয়ে, তা হতে সার বে'র করে নিতে হবে। অধ্যাপক ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, যে বই ছেলেরা দু'এক দিনের মধ্যে অক্লেশে শেষ করে ফেল্‌তে পারে, সে-বই পড়্‌তে তাঁর দু'এক, মাস সময় লাগে। এ সম্পর্কে চিন্তাশীল লেখক মিষ্টার লকও লিখেছেন যে, 'আমরা অনেকটা রোমন্থনকারী জন্তুর মত। পাঠ আমাদের জ্ঞানের উপকরণ জোগায় মাত্র। খাদ্য শুধু গলায় জমিয়ে রাখ্‌লে, যেমন দেহ পুষ্ট হয় না, রোমনন্থনকারী জন্তুর মত, অধিত বিষয় চিন্তার দ্বারা সম্পূর্ণ আয়ত্ত কর্‌তে না পার্‌লে, কখনও জ্ঞান লাভ হতে পারে না।'

সরোজ। মা, ছেলেদের আঁক শেখাই কি করে। আমার বুলুটার মনতো কিছুতেই আঁকের দিকে যেতে চায় না। অঙ্কের বই হাতে দিলেই, ছেলেটির গায়ে যেন জ্বর আসে।

মা। সংখ্যা-জ্ঞান, হাটবাজার ও আয়ব্যয় হিসাব রাখার পক্ষে যে নিতান্ত দরকার শুধু তা নয়। গণিত চর্চ্চায় ছেলেদের বুদ্ধির বিকাশ হয়, মনের একাগ্রতা ও যুক্তি-শক্তির প্রখরতা জন্মে এবং সত্যানুসন্ধানে অনুরাগ বৃদ্ধি পায়। আঁকের প্রতি অনেক ছেলের বীতরাগ দেখতে পাওয়া যায়, কেননা শুধু সংখ্যা নিয়ে নাড়াচাড়া কর্‌তে ছেলেরা কোন রস পায় না। ছেলেমানুষ, শুধু মুখস্থ করে, নামতা আর সংখ্যা

কত মনে রাখ্‌তে পারে! কাজেই অঙ্কের বইতে তাদের উৎসাহ আসে না, আঁক নিয়ে বস্‌লে, তাদের মাথা ঘুরে যায়। এ জিনিষটা ছেলেদের নিকট আমোদজনক ও সরস করার উদ্দেশ্যে, বিলেতে, সংখ্যা ও আয়তন সূচক নানা রকমের কাঠের খেল্‌না তৈরী হয়েছে। ছেলেরা এসব খেল্‌না দিয়ে সংখ্যা গণনা ও গঠন প্রণালী সহজে শিখে নেয়। ১ হতে ১০ পর্য্যন্ত সংখ্যা গণন, কড়ি কি তেঁতুল বিচি দিয়ে, কি ভাবে শেখান যায়, তা পূর্ব্বে বলেছি। এ সংখ্যাগুলোর পরস্পর সম্পর্ক বোঝাতে অথবা তাহাদের মিলন-ফলে, ছেলেদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে হলে, ১ হতে ১০ পর্য্যন্ত সংখ্যা সূচক ১০টা কাঠের বা বাঁখারির টুক্‌রা সংগ্রহ ক'র। এক ইঞ্চি সমান আয়তনের, ১ চিহ্নিত ১০ টা এবং পর পর আপেক্ষিক আয়তনের ১ হতে ১০টা লম্বা কাঠি এক স্থানে জড় কর। আপেক্ষিক আয়তনের ১০টা কাঠ বা ব্লক এক সঙ্গে একত্র করে ছেলেকে বল, পর পর বসিয়ে যাক। কাঠগুলো পর পর বসিয়ে গেলে, সুন্দর একটা সিঁড়ি হয়ে যাবে।
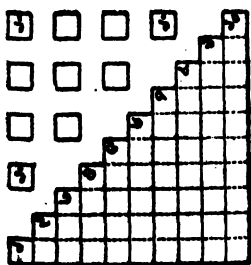
৫। সংখ্যাজ্ঞাপক কাঠের সিঁড়ি।

এ সিঁড়ির মধ্যে তারা সংখ্যাগুলো যেমন দেখ্‌তে পাবে,

The Tillich Bricks 2s 6d. : Philip & Tacey.

তাদের আপেক্ষিক বৈষম্যও টের পাবে। তারা চোখে দেখ্‌বে, ২ নম্বরের ধাপটা ১ নম্বরের চেয়ে উচ্চতায় দ্বিগুণ। ২ নম্বরের ধাপে, ১ নম্বরের সমান, আর একটী কাঠ বসালে, ৩ নম্বর ধাপের সমান হয়। ঐ কাঠটা সরিয়ে দিলে, আবার দুয়ে তিনের মধ্যে সে-দূরত্ব থেকে যায়। এ ভাবে চোখে দেখে, তারা মূল গণিতের প্রথম অংশ, যোগ, বিয়োগ, পূরণ, ভাগ মুখস্থ না করেও শিখ্‌তে পারে। তারা দেখ্‌তে পেল, ১ নম্বর ধাপের উপর, ১ নম্বরের সমানআর একটী কাঠ বসালে, ২ নম্বর ধাপের সমান হয়। অর্থাৎ দুটা একে, একটা দুই হয়। ২ নম্বর ধাপে ১ নম্বরের একটী কাঠ বসালে, ৩ নরম্ব ধাপের সমান হয়, অর্থাৎ একটা ২ আর একটা ১ যোগ হলে ৩ হয়। এভাবে ক্রমান্বয়ে ১ হতে ১০ এর তফাৎ, তারা চোখে দেখে, মুখে চট্‌ চট্‌ বল্‌তে পারবে। কয়েক ঘণ্টার প্রত্যক্ষ অনুশীলনের ফলে, এই সংখ্যা যোগও বিয়োগ ক্রিয়া তাদের মানসিক ক্রিয়ার অন্তর্গত হয়ে উঠ্‌বে। এ রকম ভাবে সংখ্যা ব্যবহারে একটু ক্ষিপ্রকারিতা জন্মিলে পর, তাদের শ্লেটে সংখ্যা লিখ্‌তে দাও, তারা চট্‌ করে লিখে দেখাবে।

১+১=২

২+১=৩

৮ নম্বরের একটী ধাপ ভেঙ্গে ফেলে ১ নম্বরের কাঠ দিয়ে পুনরায় সিঁড়িটা বাঁধ্‌তে বল, তারা ১ নম্বরের ৮ খানা কাঠ পর পর বসাবে। এতে তারা দেখ্‌তে পেল, আটটা ১ কে

একটা ৮ হয়। এর পর যদি মৌখিক প্রশ্ন কর, ৮ নম্বরের ধাপটা যদি ১০ নম্বরের সমান হতে চায়, কয়টী ১ নম্বরের ব্লক মাথায় নিতে হবে? তারা মনে মনে যোগ করে, শ্লেটে লিখ্‌বে।

৮+(১+১)=১০

এভাবে ১ হতে ১০ এর সংখ্যাগুলো উলট্‌ পালট্‌ করে বসিয়ে প্রশ্ন করে, যোগ কার্য্যে তাদের মানসিক ক্ষিপ্রকারিতা জন্মাতে পার। যোগফলে এভাবে একটু ক্ষিপ্রকারিতা জন্মিলে, সিঁড়ির এক একটা ধাপ ভাঙতে বল। ১ নম্বরের ধাপ সরিয়ে দিয়ে, গুন্‌লে দেখতে পাবে, ৯টী মাত্র ধাপ আছে। অর্থাৎ ১০ হতে ১টা নিয়ে গেলে, থাকে ৯ অর্থাৎ ৯ ও ১০ এর মধ্যে মাত্র ১ এর তফাৎ। ২ নম্বরেরটা সরিয়ে দাও দেখ্‌তে পাবে, বাকী মাত্র ৮টা ধাপ আছে। ১০ হতে প্রথম ১ নম্বর তারপর ২ নম্বর সরালে থাকে মাত্র ৮। ১০ ও ৮ এর তফাৎ তারা শ্লেটে বসাবে। ১০−২=৮ এ ভাবে সিঁড়ি ভাঙ্‌তে গেলে ১ হতে ১০ এর সংখ্যা পার্থক্য তারা বেশ বুঝ্‌তে পার্‌বে। তখন তাদের মৌখিক প্রশ্ন কর, ১০ নম্বরের ধাপটা যদি ২ নম্বরের ধাপের মত ছোট হতে চায় তবে ধাপটার কত অংশ কাট্‌তে হবে। তারা চট্‌ করে শ্লেটে লিখে দেখাবে।

১০−২=৮

যদি ৬ নম্বরের ধাপটা ভেঙে, এ ধাপটা পুনরায় অন্য কাঠ দিয়ে তৈরী কর্‌তে বল, তারা কাঠের উপর কাঠ বসাবে।

৫+১=৬
৪+২=৬
৩+(১+১+১)=৬
১+১+১+১+১+১=৬

এতে তারা দেখ্‌তে পেল, দুটা ৩এ একটা ৬ হয় আবার ছয়টা ১এও একটা ৬ হয়।

৬×১=৬
৩×২=৬

৬ কে ৬ সমান ভাগ কর্‌লে, ৬টা এক হয়।

৬÷৬=১

৬ কে ২ সমান ভাগ কর্‌লে, দুটা ৩ হয়।

৬÷২=৩

৬ কে ৩ সমান অংশে ভাগ কর্‌লে, তিনটা ২ হয়।

৬÷৩=২

৬ কে আর কোন সমান অংশে ভাগ করা যায় না। এ রকম ভাবে অমিশ্র যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ বেশ আয়ত্ত হয়ে গেলে,১০০ সংখ্যাতক এভাবে শেখাতে পার্‌বে। তারপর সিঁড়িটার প্রত্যেক ধাপ ১০ নম্বর ধাপের সমান ক'র। ১০ নম্বর ধাপের সমান কর্‌লে, সিঁড়িটা একটী সুন্দর চৌকোণা দেওয়ালের মত হবে।
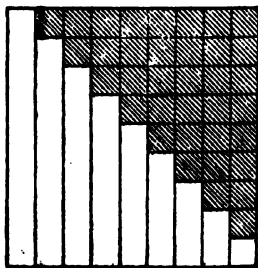
৬। আয়তনজ্ঞাপক দেওয়াল।

তখন ফিতা, মাপকাঠী বা ইঞ্চি হাতে দিয়ে তাদের বল, দিক্ পাশ মেপে নিক্। দীর্ঘে ১০ ইঞ্চি প্রস্থে ১০ ইঞ্চি যদি হয়, দেওয়ালটার ক্ষেত্র ফল কত? ১০×১০=১০০ বর্গ ইঞ্চি।

সমান এক ইঞ্চির কাঠের ইট দিয়ে যদি ১০ ইঞ্চি পরিসর ১০ ইঞ্চি উচু, একটী দেওয়াল গড়্‌তে হয়, ১ ইঞ্চির কত ইটের দরকার হবে? এ ভাবে গণিতে চলনসই সাধারণ জ্ঞান জন্মিলে, বাজর-ওজন — কাচ্চা, ছটাক, পোয়া, সের, মণ প্রভৃতি, ভাঁড়ারের জিনিষ — দাল, চাল প্রভৃতি দিয়ে, তরল-ওজন বা ভেঁড়ো-মাপ, জল কি তেলের বোতল দিয়ে, কাপড় কি কাগজের মাপ, হাত, গজ, ইঞ্চি-কাঠ দিয়ে, জমির মাপ, ফিতা রশি কি বাঁশ দিয়ে, টাকার সূক্ষ্মভাগ, আধপয়সা, পয়সা, ডবল পয়সা, একআনি, দু'আনি, সিকি, অধুলি প্রভৃতি দিয়ে শেখাতে পার। এরূপ ভাবে সংখ্যা ও দরকারী ওজনাদি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলে, একটু সাধারণ জ্ঞান হলে, মুখে মুখে ছোট ছোট বুদ্ধির প্রশ্ন ক'র। টাকার পয়সা হাতে দিয়ে জিজ্ঞাসা ক'র — দিন দু'পয়সা যদি জল পানি দেই, তবে মাসের শেষে তোমার কত টাকা বা আনা জম্‌বে? এক সের চাল যদি /১০ দরে কিন্‌তে হয়, একমণ চাল কিন্‌তে তোমাকে কত টাকা বাজারে নিতে হবে? এক পাউণ্ডে যদি ১৫ টাকা হয়, ১০০ টাকায় কত পাউণ্ড কত শিলিং পাবে? এ ভাবে মূল গণিতে সাধারণ জ্ঞান হলে, ক্রমে মিশ্রগণিত ত্রৈরাশিক, বহুরাশিক প্রভৃতি শেখান যেতে পারে।

লীলা। মা, ভূগোল শিক্ষার দরকার কি?

মা। ভূগোলের মত এমন আমোদজনক বিস্ময়কর বিষয় আর নাই। ক্ষুদ্র সংকীর্ণ বাড়ীর পাঁচীলের মধ্যে বদ্ধ থেকে, পৃথিবীটা যে কত বড়, এ ধারণা ছেলেরা কর্‌তে পারে না। দেশ কালের দূরত্ব মুছে ফেলে, পৃথিবীটা তাদের কাছে উন্মুক্ত করে ধর, ছেলেরা অবাক্ হয়ে দেখ্‌বে, কত সাগর মহাসাগর পাহাড় পর্ব্বত, সমভূমি, মরুভূমি, কত অসংখ্য জনপ্রাণী। এ দেখে তারা পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিত হতে চাবে, তাদের হৃদয়ের সংকীর্ণতা চলে যাবে, প্রাণ উদার মহৎ হয়ে উঠ্‌বে। ভূগোলটা অনেকটা দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মত, ছেলেদের চোখের সাম্‌নে দূর দূরান্তের ধনদৌলত, বাণিজ্য-সম্ভার উন্মুক্ত করে রাখে, তাতে ছেলেদের কল্পনা শক্তি জাগ্রত হয়। প্রথম প্রথম কোন বই হাতে দিয়ে দরকার নেই। নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু, পাট, চা, তুলা, কয়লা, অভ্র, লোহা, কাঁচ, দিয়াশলাই প্রভৃতি বিষয়ে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ ক'র, তারা তাদের উৎপত্তি স্থান জান্‌বার জন্য আগ্রহ প্রকাশ কর্‌বে।

সরোজ। মা, এ-সব ত ছেলেরা নিত্যি দেখে, আবার তাদের নূতন কোরে কি করে দেখায়?

মা। মা, সরোজ শুধু চোখের দেখায় শিক্ষা হয় না, মনের — দেখা দেখ্‌তে হবে — সূক্ষ্মদর্শন চাই। পৃথিবীর নদ নদী, পাহাড়পর্ব্বত, গাছপালা, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহমণ্ডলী প্রভৃতির দিকে শুধু চোখ ফিরালে চল্‌বে না। সবগুলো

তলিয়ে দেখ্‌তে হবে, তবে তাদের আগ্রহ বাড়্‌বে। প্রাকৃতিক ভূগোলে রস পাবে। ঠিক সে ভাবে, নিত্য ব্যবহারের জিনিষ — কাঁচ, লৌহ, তুলা, কয়লা, টিন প্রভৃতি তলিয়ে দেখতে শেখাও, তবে তারা নানা রকমের প্রশ্ন কর্‌বে। কোন্‌টা কোথায় জন্মে, কোন্‌টা, কোন পথে আসে ইত্যাদি তন্ন তন্ন করে জান্‌তে চাবে। প্রথম বাড়ীটার সঙ্গে পরিচয় করে দাও,— তার একটা ভৌগলিক বিবরণ, তাদের বল্‌তে বল। তাদের দ্বারা তার সীমা, আয়তন, ঘর, গাছ, পুকুর, ঘাট রাস্তা প্রভৃতির দিক্ ও দূরত্ব নির্ণয় করিয়ে নাও। যদি তারা বাড়ীটা ছোট আকারে, একটী কাগজে আঁকতে পারে, দিক্ ও দূরত্বের হিসাবে প্রত্যেক জিনিষ গুলো যথাস্থানে বসাতে পারে, তারা ম্যাপ বুঝবে, এবং ম্যাপ আঁকতে পারবে। ক্রমে বাড়ীর সীমা বড় করে, স্কুল-বাড়ী ভুক্ত কর, পর পর তাদের ভূগোল আরও বড় করে বাঙলা বিভাগটা, ক্রমে ভারতবর্ষ দেশটা আন। এভাবে দেশের ভৌগলিক আকৃতি ও বিবরণে তারা বেশ আমোদ পাবে এবং ভিন্ন দেশের ভৌগলিক বৃত্তান্ত জানবার তাদের প্রবল ইচ্ছা হবে। এভাবে ক্রমে তারা পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিত হবে এবং এ-জ্ঞানের সাহায্যে জীবনে উন্নতি লাভ কর্‌তে পার্‌বে।

সরোজ। ভূগোল হতে, ছেলেরা না হয় জান্‌তে পারে যে, কোন দেশ কোথায়, কোন দেশে ব্যবহারের কি জিনিষ মিলে এবং কি ভাবে আমদানি রপ্তানি চলে। ইতিহাস

শিক্ষার কি প্রয়োজন মা? ইতিহাসটা অনেকটা ছেলেবেলা দিদিমায়ের মুখে গল্প শুনার মত নয় কি? ইতিহাসটা জীবনের কোন্ কাজে আসে?

মা। মানবপ্রীতি, উচ্চাভিলাষ সহৃদয়তা ও স্বদেশপ্রীতি প্রভৃতি গুণ আমরা ইতিহাস পাঠে পাই। জাতি কি দেশ বিশেষের আনুপূর্ব্বিক ঘটনা পাঠে, আমাদের মধ্যে যুক্তি ও বিচার-শক্তির তীক্ষ্ণতা জন্মে। ইতিহাসটা অনেকটা দেশের নাড়ীর মত, হাতের নাড়ী টিপে যেমন চিকিৎসকগণ রোগীর সুস্থতা বিচার করেন, ইতিহাস ও জাতীয় শক্তিও শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয় দেয়। মানুষ সমাজের অংশ, সমাজের মধ্যে, জাতীর মধ্যে, তাকে বেচে থাক্‌তে হবে। যদি মানুষ হিসাবে বেচে থাক্‌তে হয়, তাকে দেশের ধাত্ বুঝতে হবে, এবং সে-ভাবে নিজকে গড়ে তুল্‌তে হবে। পূর্ব্ব পুরুষের গৌরব, এ পুরুষের অতি মূল্যবান সম্বল। ভারতের অতীত গৌরবের কথা তুলে, এ যুগের লোকেরা ভিন্ন দেশীয় লোকদের নিকট মাথা তুলে গর্ব্ব কর্‌বার অধিকার লাভ করেছে। সরোজ, ইতিহাস পাঠ গল্প শোনা নয়। তার ভিতর জীবন্ত ভাব আছে. তাড়িৎশক্তির মত জ্বলন্ত শক্তি-প্রবাহ আছে। ইতিহাস উপেক্ষার জিনিষ নয়। পৃথিবীর মধ্যে, যুগযুগান্ত ব্যাপী, ঘটনাপরম্পরা ক্রমে, দূরদূরান্তের মধ্য দিয়ে, বিশ্বসভ্যতার যে একটী ধারা বয়ে যাচ্ছে, তার গতি নির্ণয় ও নির্দ্ধারণ করা, ইতিহাস পাঠের চরম লক্ষ্য।

শৈশবাবস্থায় ঐতিহাসিক ঘটনা গুলো বিচিত্র রকমে শিশুদের শোনাতে হবে, কেননা শিশুরা অত্যদ্ভুত ব্যাপারে আমোদ পায়। তিন চার বছরের ছেলেমেয়েদের নিকট রবার্টব্রুস, নেপোলিয়ান বোনাপার্টি, জোয়ান অব আর্ক, কলম্বাস, নেলসন, চান্দবিবি, প্রতাপসিংহ, বুদ্ধ, প্রভৃতি ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণের ঘটনা মনোরম করে বল, তারা পরীর-গল্পের মত একমনে শুন্‌বে। ছেলেরা যখন ক্রমে বড় হয়ে পড়্‌তে শিখবে, তখন অল্প কয়েক পাতায় লিখিত কয়েকটী প্রধান প্রধান আধুনিক ঘটনার সচিত্র ইতিহাস, তাদের হাতে দিও। বইতে চোখ দেবার আগে, তুমি একটী বার গল্পটী এমন সরস মনোজ্ঞ কর বল, যেন গল্প শুনে, ছেলের মনোবৃত্তি উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তারপর বইখানা পড়্‌তে বল। এ-পড়ার মধ্যে একটী জীবন্ত ভাব তুমি দেখ্‌তে পাবে। ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণের কার্য্য কলাপে, তাদের মধ্যে সুখ দুঃখ, শ্রদ্ধা ও ঘৃণার ভাব প্রকাশ পাবে। ছেলে যখন আরও একটু বয়সে অগ্রসর হবে, তখন তারিখ হিসাবে পর পর সংগৃহীত দেশের ধারাবাহিক বিবরণী তাদের হাতে দাও। তা পড়ে, তারা জান্‌তে পারবে, দেশের বর্ত্তমান অবস্থা, আর ১০০ বৎসরের আগেকার অবস্থার মধ্যে কত তফাৎ। এ একশ বছরের মধ্যে দেশটার কি রকম পরিবর্ত্তন হয়েছে এবং কে কখন কি উপায়ে, এ পরিবর্ত্তন সাধন করেছেন তারা দেখ্‌তে পাবে। এবং এই পরিবর্ত্তনের নিদান তখন

তারা নিজেরা খুঁজ্‌তে আরম্ভ কর্‌বে। তখন ঐতিহাসিক ধারা তারা অনুসরণ কর্‌তে চেষ্টা কর্‌বে এবং দেশের ইতিহাসে স্থান লাভের উচ্চাভিলাষ হৃদয়ে পোষণ কর্‌বে। প্রথম নিজ দেশের ইতিহাসটা নিয়ে কাজ আরম্ভ ক'র। বিদেশের ইতিহাস চর্চ্চায় ছেলেরা স্বাদ পায় না, কেননা সবই অজানা। কিন্তু আমরা ইংলণ্ডের সঙ্গে এমন ভাবে জড়িত হয়েছি যে, আমাদের ছেলেরা ইংলণ্ডের ইতিহাস নিয়ে পাঠ আরম্ভ কর্‌লে কিছু অসুবিধা হয় না। আধুনিক ইতিহাসে চলনসই জ্ঞান না জন্মিলে রোম, গ্রীস, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশের পৌরাণিক ইতিহাসে ছেলেদের মন যাবে না।

লীলা। মা, অতি সত্যকথা, উপরোক্ত চারটী বিষয়ে চলনসই জ্ঞান না থাক্‌লে, মানুষ, মানুষ হতে অথবা কোন বিদ্যা গ্রহণে উপযুক্ত হতে পারে না। সমাজের ছোট বড় সকলেরই এই কয়েকটী বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান থাকা নিতান্ত দরকার। জ্ঞান শিক্ষার অনেক কথাত বল্লে, কিন্তু গৃহে বিদ্যা-শিক্ষার কি ব্যবস্থা করা যেতে পারে? এ না হলে যে দেশের দারিদ্র্য ঘুচে না। চারদিকে যে, শুধু অভাবের হাহাকার শুন্‌তে পাওয়া যাচ্ছে, এ অভাব দূর করা যায় কিসে? দেশের লোক খেতে পায় না, পর্‌তে পায় না, জ্ঞান চর্চ্চা করে কি হবে?

সরোজ। আমাদের দেশ চিরকালই দরিদ্র, লীলা।

মা। না সরোজ, ভারতের অতীত ইতিহাস তোমার কথায়

সায় দেয় না। এককালে, ভারতের ঐশ্বর্য্যে জগত স্তম্ভিত হয়েছিল। ভারতের বাণিজ্য-সম্ভার নেবার জন্যই, ইয়োরোপের সঙ্গে ভারতেব প্রথম পরিচয়।

লীলা, আমাদের দেশের ধনদৌলত গেল কোথায়? সেই ভারতবর্ষ সে-ভাবেই আছে। সাগর উপসাগর, নদনদী কোনটা কোথায় যায়নি বা শুকায়নি, কিন্তু দেশটা যে ফাঁপা হয়ে উঠ্‌ছে! আমার মনে হয় এর মুলে, কতেকটা দেশের পিতামাতারা আছেন।

লীলা। কি রকম মা?

মা। এ দেশে শিক্ষার বিশেষ একটা লক্ষ্য নেই। গড্ডলিকা প্রবাহের মত, ছেলেগুলো স্কুলে গিয়ে পাশ করে ঘরে ফিরে। তার পরে, তারা কি কর্‌বে, না পিতামাতারা ভাবেন, না দেশের নায়কেরা তদ্বিষয় চিন্তা করেন। বৃত্তি নির্ব্বাচন করে শিক্ষা দেওয়া, এ দেশের প্রথা নয়। ছেলেদের ঝোঁক বুঝে, ছেলেকে তদনুরূপ শিক্ষা দেওয়া হয় না। ফল হয়, ছেলেরা পাশ করে শুধু এদিকওদিক্ ঘোরে, আর উপযুক্ততা কি রুচি বিচার না করে, যে কোন এক বিদ্যা নিয়ে বসে। ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ, আইন ব্যবসায়ে, লাখে লাখে টাকা রোজগার কর্‌ছেন। এ দেখে, ছেলের সেদিকে ঝোঁক না থাকা সত্ত্বেও পিতামাতারা আশায় বুক বেঁধে, তাকে আইন ব্যবসায় ঢুকিয়ে দিলেন। ছেলের মাথা তো এ দিকে গেল না, ফলে সারা জীবন তাকে অভাবে কাটাতে হল। অন্য ব্যবসায়ে দিলে হয়ত,

বেশ টাকা রোজগার করতে পারত। ছেলের হয়ত শিল্পের দিকে খেয়াল, তাকে দিলুম চাকরীতে, ফল হলো, উৎসাহের অভাবে, ছেলে উপরিস্থের মন পেল না, অভাবে মারা পরল। দেশের দারিদ্র্য ঘুচাতে হলে, সব ছেলেমেয়েগুলোকে একই পথে চালিয়ে দিও না। এ নিয়ম কোথাও দেখতে পাবে না। তাদের মনের ঝোঁক দেখে, তাদের বৃত্তি নির্ব্বাচন ক'র এবং তদনুরূপ শিক্ষা দাও। উপযুক্ত ক্ষেত্র পেয়ে, প্রবৃত্তির অনুরূপ বৃত্তি গ্রহণ করে, তারা মনের আনন্দে, ধন উপার্জ্জন ও উদরপূর্ত্তি করবে এবং দেশের ইতিহাসে নাম রেখে যাবে। তখন দেখতে পাবে, দেশে প্রতিভা আছে কিনা, এবং দেশীলোকের মাথা আছে কিনা। ভারতে প্রতিভার অভাব নাই। ভগিনী নিবেদিতা একস্থানে বলেছেন 'গত বিংশ বৎসর ব্যাপী, কেরাণী-জীবন যাপন করেও, ভারত, ধর্ম্ম, বিজ্ঞান ও শিল্প ক্ষেত্রে, যে ভাবে মানব জাতীর জ্ঞানবৃদ্ধি করেছে, তাতে মনে হয়, ভারত নিদ্রিত মাত্র। ভারতে, জ্ঞান বিজ্ঞানের এই আকস্মিক পত্রোৎগম, ভারত বৃক্ষের জীবনীশক্তির পরিচায়ক। এবং এতে বুঝা যায় যে, ভারত অতীতে যা করতে পেরেছে ভবিষ্যতেও তা করতে পারবে।' আমেরিকার গ্যারি-পদ্ধতি নামে নূতন এক রকমের শিক্ষা পদ্ধতি আছে। গ্যারি-পদ্ধতির স্কুল, শুধু জ্ঞান মন্দির নয়, উহা বিদ্যা মন্দিরও বটে। স্কুলটা অনেকটা ওয়ার্কসপ্এর মত। সেখানে নানাবিদ্যার যাবতীয় উপকরণ আছে। ছেলেরা পড়ার সঙ্গে খেয়াল মত, কেহ

সূতারের কাজ, কেহ বা ছাপাখানার কাজ, কেহ বা চিত্রকরের কাজ, কেহ বা বাদ্যযন্ত্রের কাজ, কেহ বা যন্ত্র-কৌশল-শিক্ষার কাজ প্রভৃতি শিখ্‌তে চেষ্টা করে। এতে একদিকে যেমন তাদের বৃত্তি নির্ব্বাচন প্রবৃত্তির বিকাশ হয়, তেমনি অন্যদিকে তদুপযোগী শিক্ষা ও হয়।

লীলা। মা, কার সঙ্গে কার তুলনা কর? ছেলেদের খেয়ালের সরঞ্জামে আমেরিকার মত, আমাদের গৃহ পূর্ণ করা কি সহজ?

মা। সার রবীন্দ্রনাথের চেষ্টায়, সম্প্রতি বোলপুর শান্তি-নিকেতনে এ ভাবে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে শুন্‌তে পাই। বাড়ীতে এ রকম শিক্ষার বন্দোবস্ত করা, অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ, সন্দেহ কি। কিন্তু প্রবৃত্তি অনুরূপ সরঞ্জাম যোগাতে পারিনে বলে কি, আমাদের ছেলেদের মধ্যে বৃত্তি নির্ব্বাচন খেয়াল নেই? অথবা আমাদের ছেলেরা সৃষ্টি ছাড়া অদ্ভুত মানুষ? প্রত্যেক ছেলেমেয়েদের মধ্যে, কার্য্য বিশেষের দিকে একটা ঝোঁক আমরা দেখ্‌তে পাই না কি? প্রত্যেক পিতামাতা একটু মনোযোগী হলেই, বেশ বুঝ্‌তে পারেন যে, তাঁর সন্তানের মনের গতি কোন-মুখী, কোন বিদ্যা সে ধর্‌তে পারবে। সব বিদ্যার শিক্ষা এক রকম হতে পারে না। সব বিদ্যায় অনুপযুক্ত এমন ছেলে কম দেখ্‌তে পাবে। যে ছেলে পড়ায় মন দিচ্ছে না, তার খেয়াল গেছে, হয়ত সূতারের কাজে। তাকে সে বিদ্যা শেখাও, অল্প সময়ের মধ্যে সে একজন

চতুর মিস্ত্রী হয়ে উঠ্‌বে। কৃষকের ছেলে, চাষে মন দেয় না, তার ঝোঁক, হয়ত পড়ার দিকে। তাকে বই দাও, সে বিচক্ষণ পণ্ডিত হয়ে উঠ্‌বে। প্রতিভা বল, বুদ্ধি বল, মনের মত ক্ষেত না পেলে, কখনও কোন দেশে ফুটতে পারে না।

লীলা। পাঠে, ছেলে মেয়েদের সাময়িক অমনোযোগীতা দেখে, কি অন্যদিকে তাদের টান দেখে, তাদের ঝোঁক বোঝা বা তাদের বৃত্তি নির্ব্বাচন করা কি সহজ, মা ? প্রলোভন বলেও তো একটা জিনিষ আছে।

মা। লীলা, সাময়িক অমনোযোগীতা ও বৃত্তি-নির্ব্বাচক খেয়াল এক নয়। সে-খেয়াল আর প্রলোভনের আকর্ষণ ও এক নয়। সে হচ্ছে সাচ্চা, প্রকৃতির স্বাভাবিক স্ফুরন। যে-অবস্থায় রাখ না কেন, এ খেয়াল বের হয়ে পড়বেই। যে ভাবুক, তাকে উকিল কর, সে কোর্টে বসে কবিতা লিখ্‌বে। চিত্রকরকে কেরাণী সাজায়ো, সে আফিসের কাগজে চিত্র করে মুনিবের কাছে লাঞ্ছিত হবে। এ খেয়াল উপেক্ষায় জিনিষ নয়।

আমাদের দেশে অর্থ নেই বা অর্থাগমের বিদ্যা নেই তা নয়। অর্থও আছে, বিদ্যাও আছে। কিন্তু আমরা তার কোনটার সুযোগ সুবিধে করে দিতে জানিনে, চেষ্টাও করিনে। শিল্প-বিদ্যা, কৃষি-বিদ্যা, চিত্র-বিদ্যা, সঙ্গীত-বিদ্যা, শেলাই-বিদ্যা, বয়ন-বিদ্যা, কুম্ভকার-বিদ্যা, কামার-বিদ্যা, খনিজ-বিদ্যা, ইত্যাদি আমাদের দেশে কোন বিদ্যায় পয়সা নাই ? তুলা, অভ্র, চা, লোহা,

প্রভৃতি আমাদের মাঠঘাট বন জঙ্গলের কোন জিনিষে পয়সা নেই? গত, বৎসর, শুধু জাপান হতে, আমাদের ছেলেদের জন্য, প্রায় কোটি টাকা মূল্যের, বাঁশ বেত ও কাগজের খেল্না এদেশে আমদানি হয়েছে। এককালে আমাদের দেশে, মেয়েরা বাড়ীতে, কাপড়, মাটীর খেল্না, কাগজের ফুল ও বাক্স, বেতের পাখা ও পাখী প্রভৃতি হাতে তৈ'রী কর্‌ত না কি? সে সব বিষয়ে এখনও প্রবৃত্তি আছে। কিন্তু উৎসাহ দেয় কে? তোমার ছেলে লেখাপড়া করে না, স্কুলে শুধুযায় আসে কিন্তু বাড়ীতে সারাক্ষণ ভাঙ্গা টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি জোড়াই-কাজে আমোদ পায়। তা তুমি তাকে মিস্ত্রির কাজ শিখ্‌তে দেবে না, কেননা ভদ্রলোকের পক্ষে, সমাজে সে কাজ নিন্দনীয়। সে অকর্ম্মা হয়ে, বাড়ীতে আত্মীয়ের গলগ্রহ হয়ে থাক্‌বে, তা বরং ভাল, কিন্তু তার প্রবৃত্তির অনুরূপ বিদ্যা, সে ধর্‌তে পার্‌বে না। বৃত্তি নির্ব্বাচনে এ জাত্যভিমান ও সামাজিক নিগ্রহ, ছেলেমেয়েদের দুর্গতি ও দেশের দারিদ্র্যের অপর কারণ। অন্য দেশে ভিক্ষাবৃত্তি অপরাধের বৃত্তি, কিন্তু আমাদের দেশে, তাহা উৎসাহ পায়। আমরা ইচ্ছা করে দারিদ্র্য পোষণ করি, দোষ দেই কার?

লীলা। মা, শুধু বিদ্যা থাক্‌লে তো হয় না। বিদ্যা গ্রহণের সঙ্গতি আছে ক'ই? মাঠ আছে বলে তো, ধানে আমার গোলা ভরে যাবে না, অথবা দেশে খনি আছে বলে, বাড়ীতে রত্ন মিল্‌বে না। আমাদের জন্য ভাবে কে?

মা। কে কার জন্য ভাবে, লীলা? তোমার ছেলে মেয়েদের জন্য যদি তোমরা না ভাব, যদি নিজেরা কিছু বন্দোবস্ত না কর, তবে কে করবে আশা কর? সকলের অন্নজলের বন্দোবস্ত করে রাখা, কোন দেশের কোন সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। এদেশে সব কিছু গবর্ণমেণ্ট করবে, সে আশা কেন করবে? এদেশে এখনও বাজে কাজে, কত দিকে, কত অর্থ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আমরা কি দেখ্‌ছিনে? সব বিদ্যাতে অর্থ লাগে, সন্দেহ কি। কিন্তু যদি মন থাকে, চরিত্র-বল থাকে, তবে অর্থের অভাব হয় না। পৃথিবীর সর্ব্বত্র, দশেবিশে মিলে-মিশে, অর্থ সংগ্রহ করে, নানা রকমের শিল্প কারখানা স্থাপন করে, হাজার হাজার লোকের ঢুক্‌বার পথ করে রেখেছে। কোন দেশে, শুধু গবর্ণমেণ্ট কি কোন এক ব্যক্তি একা, দেশের সব লোকের সুখ সুবিধা করে দিতে পারেনি। দেশ দরিদ্র সন্দেহ কি, কিন্তু সকলে মিলে এক মনে, এক উদ্দেশ্যে কাজ কর্‌লে, দেশের কোন ভাণ্ডার না খুলে যেতে পারে? উন্নতির পথে বাধা দিয়ে, কে, আমাদের আর কয় দিন চেপে রাখ্‌তে পারবে?

সরোজ। অন্য দেশে ভিক্ষা করলে কি অপরাধ হয়? সে সব দেশে কি দীন দুঃখী নেই, মা?

মা। হাঁ সরোজ, ইয়োরোপ, আমেরিকা কি জাপানে রাস্তায় ভিক্ষা কর্‌বার যো নেই। ভিক্ষুক বেড় হলেই, পুলিশ পাক্‌ড়াও করে। গরীব লোক থাকবে না কেন? ঢের

আছে। কিন্তু গরীব যারা, তারাও তাদের হালে নিজেরা দুপয়সা রোজগার করে, কষ্টে দিন কাটাচ্ছে। পরের বোঝাই হয়ে, যার তার কাছে মেগে খায় না। দেশশুদ্ধ লোক ভিক্ষা বৃত্তি ঘৃণা করে এবং খেটে খেয়ে, স্বাধীন ভাবে থাক্‌তে চায়। সে সব দেশে বৃত্তি নির্ব্বাচনে সংস্কোচ নেই। যে যে-বিদ্যার উপযোগী, সে সে-বিদ্যাই গ্রহণ করে। ফলে, সকল বিদ্যায়, সব ক্ষেত্রে, দেশের লোকের বুদ্ধি ও প্রতিভা ফুটে বে'র হয়। তারা সচ্ছন্দে মাথা খাটিয়ে, পৃথিবীর উন্নত আদর্শ সম্মুখে রেখে, দেশের মাঠ ঘাট পাহাড়পর্ব্বত হতে, উপকরণ সংগ্রহ করে, অন্য দেশের সঙ্গে টেক্কা দেয়। শোন, জাপানের উন্নতি সম্পর্কে, জাপান কি বল্‌ছে * :— 'ইয়োরোপের ইতিহাস পাঠে, একটি প্রত্যক্ষ সত্য আমারা দেখ্‌তে পাচ্ছি যে, যে-জাতি, মানব জাতির উচ্চ আদর্শ লক্ষ্য রেখে, মানব জাতির উন্নত চিন্তা-স্রোত অনু-সরণ করে, চল্‌তে পেরেছে, হোক না কেন তার যে কোন রকমের আভ্যন্তরিক শাসন বিধি, সে-জাতির উন্নতি কেহ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। কিন্তু যে-জাতি এ-উন্নতি স্রোতে বাধা দিতে চায়, অথবা এ স্রোতের প্রতিকুলে সাঁতারে যেতে চায়, সে-জাতির পতন অনিবার্য্য। জগতের ইতিহাসে এ নিয়মের ব্যতিক্রম, কোথাও দেখা যায়নি এবং জাপানের উন্নতির মূল সূত্র এখানেই।'

* Rise of Japan : Count Okuma.

পঞ্চম প্রস্তাব

ধর্ম্ম-শিক্ষা বিষয়ক কথা

মা। সরোজ ও লীলা, এস এখন বিশেষ কাজ কর্ম্ম নেই, ছেলেমেয়েদের ধর্ম্ম-শিক্ষা বিষয়ে কয়েকটী কথা তোমাদের বলি।

লীলা। মা, ছেলেদের কি ধর্ম্মও শেখাতে হয়?

মা। হাঁ, লীলা, হয় বই কি।

সরোজ। আমাদের দেশে সাধারণ লোকের ধারণা, যে ছেলেদের ধর্ম্মের কথা শোনাতে নেই। বুড়া বয়সই ধর্ম্ম চর্চ্চার সময়। ছেলেদের মুখে ধর্ম্মের কথা শুন্‌লে, লোকেরা হেসে ওঠে।

মা। আমরা সব বিষয়ে যেমন উদাসীন, ধর্ম্ম বিষয়েও সেইরূপ হব, তা আর বিচিত্র কি? আমার মনে হয়, ছেলে বেলা হ'তে, ছেলেদের ধর্ম্ম-শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন।

সরোজ। মা, ধর্ম্মের কথা বুড়া বয়সেই, অনেকের কাছে ভাল লাগে না, ছেলে মানুষের ভাল লাগ্‌বে কেন? অনেকেই মা ধর্ম্মের নামে মুখ ফিরান, কেমন নয় কি?

মা। কারণ আছে, সরোজ। ঠিক কথা, অনেকেই এখন ধর্ম্ম বিষয়ে নিতান্ত উদাসীন, কিন্তু—

লীলা। মা, ধর্ম্ম-শিক্ষার আবার কি প্রয়োজন? ওটা বাদ দিলেও যেন চলে।

মা। খুবই প্রয়োজন। বাদ দিলে, চলেই না, লীলা। মানুষ বড় সহজে ধর্ম্মের নাম করে, মনে ক'র না। এ-টাকে যদি সরিয়ে দিয়ে, সংসারে নিরুদ্বেগে, বেশ সুখ-সচ্ছন্দে থাক্তে পারা যেত, তবে যে রকম অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তাতে মনে হয়, মানুষ কখনও জীবনে ধর্ম্মের নাম কর্‌ত না। কিন্তু নাম না করে পারে কৈ? মানুষের ভিতরেই এমন একটা বৃত্তি আছে, যা মানুষকে হঠাৎ হঠাৎ খোঁচা দিয়ে অস্থির করে তুলে। তখন মানুষ, সংসারের সকল মানসম্মান, জ্ঞান-ঐশ্বর্য্য ও ধনসম্পদ পায়ে ঠেলে দিয়ে, পাগলের মত সংসার হতে বের হয়ে পড়ে। এবং এ আকুল অনুসন্ধানের ফলে, মানুষ কি এক অপার্থিব সম্পদের অধিকারী হয়ে বসে যে, বিশ্ববিজেতা সম্রাট, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, মানী কি ধনী, তার পায়ে লুটিয়ে পড়ে, সমস্ত ধন মান ছড়িয়ে দিয়েও তৃপ্তি পায় না। এমন তার তেজ! তাকে জ্বলন্ত আগুনে ফেলে দাও, ক্রুশে বিদ্ধ কর, সমুদ্রে ভাসিয়ে দাও, তলওয়ার তুলে কাট্‌তে চাও, কলসী ছুরে মার্‌তে যাও, সে হাসি মুখে সব উপেক্ষা করে যাবে। কি আশ্চর্য্য তার শক্তি! তাকে তুচ্ছ করে, ঘৃণা করে, যত জোরে তাকে উৎপীড়ন কর্‌তে চেষ্টা ক'র, তার দ্বিগুণ জোরে, ফিরে তার পূজা কর্‌বে। লীলা, মানব জীবনের ইতিহাসে একি সাধারণ ব্যাপার! দুনিয়ার কোন প্রকার দুনিয়াদারি ভাব, এখানে যে টিক্‌ছে না। এখানে যে, সুখ সুবিধার

বিচার নেই। একে ছেড়ে, মানুষ যেন থাকতেই পাচ্ছে না। বাদ দিয়ে পার্‌ল কই? কত রাজা, রাজ্য-সম্পদ ফেলে গেল, কত ভোগী, ভোগবিলাস ছেড়ে গেল, কত দুষ্ট, দুষ্টামি ভুলে গেল। লীলা, সাধে কি রাজপুত্র বুদ্ধদেব রাজৈশ্বর্য্য পায়ে ঠেলে, বে'র হয়ে পড়েছিলেন। কোন সাহসে খ্রীষ্ট ক্রুশে আরোহণ করে ছিলেন? কোন স্ফূর্ত্তিতে ভক্ত বলেছিলেনঃ—

মার্‌লে যদি ভাই কল্‌সীর কানা,
তাই বলে কি প্রেম দেবো না?

সংসারের ধনদৌলতে, ভোগবিলাসে কি জ্ঞান-গরিমায় মানুষের মন যে উঠ্‌ছেনা। তার যে আকাঙ্ক্ষার, তৃপ্তি হচ্ছে না। কি এক আকুল আকাঙ্ক্ষা, ভিতর হতে মানুষটাকে খোঁচা দেয়, আত্মহারা হয়ে, সে যে সংসারের বাহিরের কিছু চায়। ধ্রুবের মত, বনজঙ্গলে, যাকে তাকে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কি সেই?' লীলা, যুগযুগান্তে, দেশদেশান্তে, ধর্ম্মকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা তো হয়ে ছিল, কিন্তু ধর্ম্ম বাদ পড়্‌ল কই?

লীলা। মা, তুমি যে ভাবে বলছ, তাতে যে ভয় হয়। পৃথিবীতে তবে কি ধর্ম্ম মিলে না?

মা। লীলা, ধর্ম্ম ভয়ের জিনিষ নয়। ইহা আরামের জিনিষ, তৃপ্তির জিনিষ। এ-যে আমাদের নিতান্ত স্বাভাবিক সম্পদ। ধর্ম্মপরায়ণতা মানুষের প্রকৃতি। বস্তুতঃ ইহাই মানুষের বিশেষত্ব। ধর্ম্ম-জ্ঞান যদি না থাকৃত, মনুষ্য-সমাজের সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়ে যেতো। ঈশ্বরে যার বিশ্বাস নেই,

নির্ভর নেই, সংসারের সুখে তার তৃপ্তি নেই, দুঃখে সান্তনা নেই। লোকে তার উপর নির্ভর করতে পারে না। তার পরিণাম কি ভয়াবহ হয়ে দাঁড়ায়, তার কতকটা চিত্র রুশীয় পণ্ডিত কাউণ্ট টলষ্টয়, তাঁহার "চল্লিশ বৎসর" নামক উপন্যাস গ্রন্থে দেখিয়েছেন। ধর্ম্মই মানুষের চরম লক্ষ্য। পৃথিবীতেই মানুষকে ধর্ম্ম সাধন কর্‌তে হবে। ধর্ম্ম পৃথিবীর বাইরে নয়।

লীলা। কিন্তু মা, আমার মনে হয়, আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষার ফলেই, আমাদের মধ্যে ধর্ম্মভাব ফুট্‌তে পার্‌ছে না। ধর্ম্মে ঔদাসীন্য এখন আমরা শিক্ষিত সমাজে বেশী দেখ্‌তে পাই। নিরক্ষর যারা, তারাই যেন দেশে ধর্ম্মটাকে ধরে রেখেছে। শিক্ষিত লোকদের নিকট ধর্ম্ম তেমনটা আদর পাচ্ছে না। বস্তুতঃ আমাদের জ্ঞানের আলোকে, আমাদের প্রাচীন ধর্ম্মসংস্কার গুলো, আর আমরা রাখতে পাচ্ছিনে। অনেকেই তাই বলেন 'বর্ত্তমান বিজ্ঞানের যুগে ধর্ম্ম কোথায় টিকে।'

মা। আধুনিক শিক্ষার ফলে, আমাদের পুরাতন ধর্ম্মসংস্কারের ভিত্তি অনেকটা যে, হাল্‌কা হয়ে যাচ্ছে, সে বিষয়ে সন্দেহ কি! কিন্তু তা বলে জ্ঞান ও ধর্ম্মে, বাস্তব কোন বিরোধ আছে মনে ক'র না। বস্তুতঃ জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোকেই, চিরকাল ধর্ম্ম, সোণার মত উজ্জ্বল হয়ে, সর্ব্বত্র প্রতিভাত হয়েছে। কি বল, লীলা, বিজ্ঞানের যুগে ধর্ম্ম টিক্‌বে না। যুগে যুগে বিজ্ঞানই, অজ্ঞানের অন্ধকার হতে, মানুষের ক্ষুদ্র

গণ্ডীর বন্ধন হতে, ধর্ম্মকে উদ্ধার করে বিশ্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠা করেছে। বিজ্ঞানের মীমাংসা হয়েছে সেখানে, যেখানে বিজ্ঞান বিশ্বশক্তির পরিচয় পেয়ে, জড়শক্তির সঙ্গে বিশ্ব শক্তির যোগ ধরতে পেরেছে। জ্ঞানের তৃপ্তি হয়েছে তখন, যখন জ্ঞান সর্ব্বত্র, শুধু বিশ্বশক্তির বিকাশ উপলব্ধি করেছে। জ্ঞানের সমুচ্চ সিঁড়িতে যাঁরা উঠেছেন, যথার্থ বিজ্ঞানের সমাধান যাঁরা করেছেন, তাঁরাই প্রত্যক্ষ বিশ্বস্রষ্টাকে দেখতে পেয়ে. সর্ব্বত্র শুধু তাঁরই বিশ্বশক্তির ঘোষণা করেছেন। ভারতের বিজ্ঞানাচার্য্য সার জগদীশচন্দ্র, জড় ও প্রাণী জগতের দুর্ভেদ্য পাঁচীল ভেঙ্গে দিয়ে, আজ জগতের কাছে, প্রাচীন ভারতের ঋষিদের ন্যায়, বিশ্বস্রষ্টার বিশ্বজোরা শক্তির বিকাশ ঘোষণা করেছেন। প্রাচ্য কবি রবীন্দ্রনাথ, প্রতিচ্য স্বভাব কবিদের মত, বিশ্বময় সে-এক-বিশ্বস্রষ্টার প্রকাশ দেখতে পেয়ে, নানাছন্দে তাঁর চরণ তলে, শুধু ভক্তির "অঞ্জলি" ঢেলে দিচ্ছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র, উচ্চজ্ঞান কি বিজ্ঞান, সেই বিশ্বেশ্বরের বিশ্ব-প্রকাশের সাক্ষ্য দিচ্ছে মাত্র। মানুষ জ্ঞান গরিমায় অন্ধ হয়ে, এ শক্তিকে অগ্রাহ্য করে, যখন এ পৃথিবীর মধ্যে জ্ঞানের নঙ্গর ফলতে গেছে, বিজ্ঞানকে স্বীয় জ্ঞান গণ্ডীর মধ্যে বাঁধতে চেয়েছে, তখনই মানুষ, মাকড়সার মত, শুধু তর্কজালে নিজকে আবৃত করে জড়বাদের বিষম ঘুর্ণিপাকে পড়ে গেছে। কুয়াসার মত অজ্ঞানের ঝাপ্সা আলোকেই মাকড়সার সে জাল দেখায়

ভাল। যথার্থ জ্ঞানের আলোকে, অচিরে তাহা অদৃশ্য হয়ে যাবেই। ধর্ম্ম যদি হৃদয়ের জিনিষ হয়, জ্ঞান চর্চ্চায় ধর্ম্মভাব লোপ পাবার তো কথা নয়। লেখাপড়াতে ক্ষুধাবৃত্তি চলে যায়, এ যুক্তি যেমন অযৌক্তিক, তেমনি জ্ঞান ধর্ম্মের বাধা দেয়, এ তর্কও নিতান্ত অসঙ্গত ও অসার। স্কুলে আমাদের ছেলে মেয়েদের পক্ষে ধর্ম্ম নিষিদ্ধ-ফল। গৃহে আমরা নিজেরা ধর্ম্মের ধার ধারিনে। বল দেখি, এ অবস্থায়, এ দেশের শিক্ষিত সমাজে, ধর্ম্ম-স্পৃহা আস্‌বে কোথা হতে?

লীলা। তবে মা —

সরোজ। লীলা, তুই ধর্ম্ম-বিজ্ঞানের কথা তুলবি দেখ্‌তে পাচ্ছি। অতদূরে যেয়ে দরকার নেইরে ভাই। ঈশ্বর আছেন, এ কথা ত অবিশ্বাস কর্‌বার যো নেই। প্রকৃতি যদি ভুল্‌তে পারি, তবে ধর্ম্মকে বাদ দিতে পারি। কিন্তু এ যে হৃদয়ের সারা, যে অস্বীকার করবে, সেই খোঁচা দিয়ে স্বীকার করাচ্ছে। মা, ছেলেদের ধর্ম্ম শেখাব কি করে?

মা। ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাক্‌লে, অন্য কোন সৎগুণ মানুষ, জীবনে বেশীদিন রাখ্‌তে পারে না। ঈশ্বরকে ধরবার জিনিষ, তিনিই আমাদের মধ্যে দিয়েছেন। আমাদের যে প্রকৃতি, তা স্বতঃই আমাদিগকে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যেতে চায়। শিশুরা পৃথিবীর অত্যাশ্চর্য্য বিস্ময়কর ও অসাধারণ প্রাকৃতিক ঘটনা দেখে অবাক হয়ে যায়। অশিক্ষিত ও অসভ্য

লোকেরা, ঈশ্বরজ্ঞানে, এ অত্যাশ্চর্য্য বিরাট জড়শক্তির উপাসনা কর্‌ছে। সুসভ্য শিক্ষিত লোকেরা, আপাততঃ বিস্ময়কর এ বিশাল জড়-শক্তির বিশ্লেষণ করে, মূল-শক্তির সন্ধান কর্‌ছে। কিন্তু বিজ্ঞান জড়শক্তি ও বিশ্বশক্তির প্রভেদ দেখিয়ে, বিশ্বব্যাপী, এক ও সনাতন ধর্ম্মের ঘোষণা করে দিচ্ছে। প্রকৃতির অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা দেখে, অদৃশ্য শক্তিশালী মহাপুরুষের দিকে, ছেলেমেয়েদেরও মন আকৃষ্ট হয়। তারাও তাদের স্বভাব সুলভ সরলতার সহিত, তাঁকে জান্‌তে চায়। শিশু হৃদয়ের এই স্বাভাবিক বৃত্তি, ধর্ম্মজ্ঞানে ফুটিয়ে তুল্‌তে হবে। তা কি করে করা যায়, তদসম্পর্কে একটী গল্প বলছি শোন ঃ—

একদিন মিষ্টার ওয়াশিংটন, তাঁহার পুত্র আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ জর্জ্জ ওয়াশিংটনকে, ঈশ্বর বিশ্বাস শেখাবার উদ্দেশ্যে, তাঁর ফুলের বাগানে, জর্জের নামের অক্ষর করে, কপি বিচি পুতে রেখেছিলেন। পিতা পুত্র সকালসন্ধ্যায়, রোজ বাগানে বেড়াতেন। একদিন সকাল বেলা, জর্জ্জ দেখতে পেল যে, বাগানের এক কোণে, মাটিতে কপির চারাতে জর্জ্জের নাম লিখা রয়েছে। পুত্র আশ্চর্য্য হয়ে, পিতাকে জিজ্ঞাসা কর্‌ল 'বাবা, মাটিতে আমার নাম লিখা হলো কি করে?' মিষ্টার ওয়াশিংটন শান্তভাবে, বল্‌লেন, 'কেন, কপির চারা এভাবে উঠতে পারে না কি?' পুত্র জোরের সহিত বল্লে, 'না বাবা, কেহ বিচি গুলো আমার নামের অক্ষরে

সাজিয়ে না পুতলে, এভাবে চারা উঠতে পারে না।' পিতা বল্লেন 'তা হবে কেন, কারো পুতবার দরকার কি? ঘটনাক্রমে চারাগুলো এভাবে উঠে গেছে, তাও ত হতে পারে।' পুত্র বল্লে 'না বাবা, এ নিতান্ত অসাধারণ ঘটনা। ঘটনাক্রমে হতে পারেই না। কারো হাত অবশ্য আছে, পিতা বল্লেন, 'হঁা আমার উপদেশ মত, মালিই বিচি পুতেছিল। কেহ পেছনে না থাক্‌লে, এ রকম সামান্য একটী ঘটনা ঘটতে পারে তুমি বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌লে না। পৃথিবীর এমন সুন্দর সুশৃঙ্খলা, কি ঘটনাক্রমে হয়ে রয়েছে, তুমি মনে কর? পত্র পুষ্প সুশোভিত, সুদৃশ্য মনোহর পৃথিবী খানির এ অত্যাশ্চর্য্য শৃঙ্খলার পেছনে কি কেউ নেই?' পুত্র বলিল, 'হঁা বাবা, অবশ্য আছেন।' 'তবে কে আছেন?' পিতা জিজ্ঞেস করিলেন। পুত্র উত্তর করিল 'ঈশ্বর আছেন, বাবা' পিতা বলিলেন 'হাঁ জর্জ, এই বিশ্বসৃষ্টির পেছনে, স্বয়ং ভগবান মালির মতই কাজ করিতেছেন।' তাঁকে চিন্‌তে হলে, তাঁর সৃষ্টির ভিতর তাঁকে দেখ্‌তে হবে। উপনিষদেও ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিপাদক, আত্মিক শিক্ষার অনেক উপাখ্যান আছে। একটী উপাখ্যান বলি শোন :— শ্বেতকেতু নানা বেদ অধ্যয়ন করে বিদ্যাভিমানী হয়ে, গৃহে ফিরিলে, শ্বেতকেতুর পিতা আত্মিক জ্ঞান বিষয়ে, শ্বেতকেতুকে প্রশ্ন করিলেন। শ্বেতকেতুকে একটী বট ফল আন্‌তে বল্লেন। পুত্র বট ফলটী পিতার নিকট উপস্থিত করিলে, পিতা বল্লেন 'ফলটী ভেঙ্গে দেখ কি আছে।' শ্বেতকেতু ফল ভেঙ্গে বল্লে, 'এই যে

বিচি।' পিতা বল্লেন, 'বেশ, বিচিটা ভেঙ্গে দেখ দেখি, তার মধ্যে কি পাও।' শ্বেতকেতু তৎক্ষণাৎ বিচি বেশ করে পিষে বল্লে, 'বাবা এত সূক্ষ্ম হয়ে গেছে যে, আর কিছু দেখ্‌তে পাইনে।' পিতা তখন গম্ভীর ভাবে বল্লেন, 'তা বলে কি বিচিটা লোপ পেয়ে গেল? তাতো নয়, সেই বৃহৎ বট বৃক্ষ পূর্ব্বেও বিচিতে যেমন বর্ত্তমান ছিল, এখন ও অদৃশ্য পরমাণুতে বর্ত্তমান আছে। এতেই বুঝতে পার যে, এ স্থূল জগত সত্য হতে উৎপন্ন হয়েছে। সে সত্য বস্তুই আত্মা। আর সেই আত্মা মূলক তুমি শ্বেতকেতু। চক্ষুর অগোচর বলে যে, পরমাত্ম নেই তা নয়।'

সরোজ। শুধু উপদেশ ও গল্পে কি ধর্ম্মশিক্ষা হয় মা?

লীলা। লেখাপড়া শিখে, ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে, ধর্ম্ম শিক্ষা হতে পারে, কেমন নয় কি মা?

মা। সরোজ ও লীলা, ধর্ম্ম মুখের উপদেশে ও নয়, অথবা গ্রন্থের পাতায় ও নয়। এ-যে হৃদয়ের জিনিষ, হৃদয় দিয়ে ধর্‌তে হবে। তুমি যদি নিজ হৃদয়ে ধর্ম্ম না পাও, শুধু সাধুর মুখে, কি গ্রন্থের পাতায়, ধর্ম্ম খোঁজ, তবে সে ধর্ম্ম নানা আকারে দেখা দেবে এবং আবার ছায়ার মত সে ধর্ম্ম অচিরে পালাতে চাবে। কিন্তু হৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম বৃত্তির উপর, প্রত্যহ জ্ঞান ও ভক্তিরবারি সিঞ্চনে, যদি সতত সে বৃত্তি উর্ব্বরা করে রাখ্‌তে পার, তবে সাধু-সঙ্গ বা ধর্ম্মগ্রন্থের স্নিগ্ধ হাওয়াতে, জীবনে ধর্ম্ম, ফুলের মত ফুট্‌তে থাক্‌বে। অন্যথা

আগাছা উঠে, হৃদয়ের প্রকৃত ধর্ম্মবীজ নষ্ট করে দেবে। তাই রামকৃষ্ণ পরমহংস বল্‌তেন, 'চারা গাছটাকে বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখতে হবে, না হয় ছাগল গরুতে খেয়ে ফেল্‌বে।' হৃদয়ই ধর্ম্মের প্রকৃত ক্ষেত্র। প্রকৃতির মত বিশাল উদার ধর্ম্মগ্রন্থ আর নেই। প্রকৃতির ঘটনার মত এমন ধর্ম্মোপদেষ্টা আর পাবে না। উপনিষদের ঋষিরা বলেছেন তপস্যা অর্থাৎ মননের দ্বারা হৃদয়ে ব্রহ্মকে লাভ কর্‌তে হবে। বর্ত্তমান সময়ের স্বভাব কবি রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন 'বাহির হতে আমাদিগকে ভিক্ষা আহরণ করিতে হইবে না। সমস্ত আবরণ ঠেলিয়া, অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, আমাদিগকে আবিষ্কার করিতে হইবে।' এবং যীশুও তাঁর শিষ্যদের বলেছেন 'আকুল হয়ে খোঁজ, ব্যাকুল হয়ে হৃদয়ে আঘাত কর, তবে তোমার হৃদয়-দুয়ার খুলে যাবে' ধর্ম্মের প্রকাশ দেখতে পাবে।

সরোজ, সুযোগ মত, প্রকৃতির উন্মুক্ত বিশাল গ্রন্থের দিকে, ছেলেবেলা হতে, সর্ব্বদা ছেলেদের মন আকৃষ্ট করে রেখো। প্রকৃতির শান্ত স্নিগ্ধ ভাবের সাহায্যে, শরৎকালের প্রস্ফুটিত পুষ্পের মত, তাদের সুকুমার ধর্ম্মবৃত্তি বিকশিত করে রেখো। প্রাতঃসূর্য্যের স্নিগ্ধ, সুন্দর আরক্তিম আভাতে, পূর্ণচন্দ্রের বিমল রজত বিভাতে, বসন্তের বায়ু হিল্লোলে, ঝটিকার তুমুল কল্লোলে, বন জঙ্গলের শান্ত নীরবতায়, ফেনিল সমুদ্রের গুরু গম্ভীর মুখরতায়, সুযোগ বুঝে, তাদের প্রাণ উন্মুক্ত করে রেখো। তারা অদৃশ্য স্রষ্টার জীবন্ত শক্তি দেখে, হৃদয় দিয়ে সে শক্তিশালী

পুরুষকে ধরতে চাবে। পূর্ব্বোক্ত 'ঈশ্বর' শীর্ষক কবিতা তাদের শেখাও। প্রকৃতির জিনিষ নিয়ে, নিম্নোক্ত রকমের ছোট ছোট কবিতা, শ্রদ্ধার সহিত তাদের কাছে উপস্থিত ক'র। তা'তে তাদের প্রাণ জেগে উঠ্‌বে, ঈশ্বর-বিশ্বাস ক্রমে বদ্ধমূল হয়ে যাবে।

"ছোট পাখি, ছোট পাখি, বলগো আমায়,
এত মিষ্ট গান, তুমি শিখিলে কোথায়?
যাঁহার কৃপাতে ভাই লভিয়াছি প্রাণ,
ক্ষুদ্র এই কণ্ঠে, তিনি দিয়েছেন গান!
রাঙা ফুল, রাঙা ফুল, বল দেখি মোরে,
কে দিয়েছে এত হাসি, কাঁচ মুখে ভরে?
জলস্থল সব ভাই, গড়েছেন যিনি,
আমার এ মুখে হাসি, দিয়েছেন তিনি।"

* * * *

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরকার।

যে অদৃশ্য শক্তি দেখে, বিস্ময়ে ও আহ্লাদে, শিশু মন নেচে ওঠে, তোমরা নিজ জীবনে দেখাও, সেই বিশ্বস্রষ্ঠার প্রতি তোমাদের কি রকম অনুরাগ এবং সাংসারিক কাজ কর্ম্মের মধ্যে, কি রকম শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত, তাঁর প্রিয় কাজ সাধনের জন্য তোমরা প্রত্যহ চেষ্টা করছ। এখানেও তোমাদের নিজের দৃষ্টান্ত চাই। তাই ভক্ত চৈতন্যদেব বল্‌তেন 'আপনি আচরি ধর্ম্ম অপরে শিখায়।' তোমরা যদি বিশ্বস্রষ্ঠার সৃষ্টি নৈপুণ্যের প্রতি চোখ বুজে, তাঁর বানী আগ্রহ করে, অষ্টপ্রহর

ভৌতিক বৃত্তির চরিতার্থতা সাধনে লিপ্ত থাক, তবে তোমাদের দৃষ্টান্ত দেখে, ছেলেদের ধর্ম্মবৃত্তি চাপা পড়ে যাবে, তারা ও ধর্ম্মে উদাসীন হয়ে উঠ্‌বে এবং তোমাদের ন্যায় সাংসারিক সুখে মন প্রাণ ঢেলে দেবে।

লীলা। ঈশ্বরের বাণী শোণা কি রকম মা, শুধু ঈশ্বর-বিশ্বাসে কি ধর্ম্মলাভ হয় না?

মা। লীলা, এ-বিশ্বপ্রকৃতি যদি ঈশ্বরের কর্ম্মক্ষেত্র হয়, তবে তিনি প্রকৃতির ভিতর দিয়ে অর্থাৎ জীবজন্তু প্রভৃতির ভিতর দিয়ে কাজ করছেন এটা, বোধ হয় তুমি স্বীকার করবে। এবং এও তোমাকে স্বীকার করতে হবে যে, তিনি কোন উদ্দেশ্য নিয়ে, একাজ কর্‌ছেন। তার সামান্য একটু পরিচয়, আমরা আমাদের মধ্যে পাই। হঠাৎ যখন কোন অন্যায় কাজে আমরা হাত দেই, আমরা কি একটা বাধা পাইনে? হঠাৎ একটা বাধা কোথা হতে আসে, কে যেন ভিতর হতে বারণ করেন।

সরোজ। হঁা, অনেক সময় আমরা তা বেশ বুঝতে পারি। অন্যায় কাজে প্রথম হাত দিতে, কেমন বাধ বাধ লাগে।

মা। সরোজ, একজন সাধুর জীবনের একটী সত্যঘটনা বলি, শোন। থিওডার পার্কার একজন পরম ঈশ্বর বিশ্বাসী সাধু পুরুষ ছিলেন। ছেলেবেলা, একদিন একটা কচ্ছপের গায়ে ঘা দেবার জন্য, পার্কার লাটি উঠালেন। কিন্তু লাটি আর ফেল্‌তে পারলেন না। কে যেন ভিতর হতে বলে উঠল,

'মেরোনা'। পার্কার তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে, মাকে জিজ্ঞাস্ করলেন, 'মা আমি একটী কচ্ছপের গায়ে লাটি তুলেছিলুম, কিন্তু কে হঠাৎ আমাকে ভিতর হতে বল্লে, মেরোনা, মা সে কে?

সরোজ। মা, পার্কার জননী কি উত্তর করেছিলেন?

মা। শোন, বলছি! তিনি বলেছিলেন 'অন্যায় কাজে, ঈশ্বর তোমায় বারণ কর্লেন। তুমি যা শুনেছ, লোকে তাকে বিবেক বলে, আমি বলি, উহা মানব অন্তরে, স্বয়ং ঈশ্বরের বাণী। এ বাণী যদি শোন, তবে ইহা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে তোমাকে উন্নতির পথে নিয়ে যাবে, অন্যথা এ বাণী ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে যাবে, আর শুন্‌তে পাবে না। তোমার জীবনের উন্নতি এ বাণী শোনার উপরেই নির্ভর করে।' তাই সাধক রামকৃষ্ণ বল্‌তেন 'বিবেকের হলুদ গায়ে না মাখলে, সংসার সমুদ্রে কুমীর প্রভৃতির আক্রমণ হতে প্রাণ বাঁচান দায়।' সত্যি সরোজ, প্রথম প্রথম কোন অন্যায় কাজে হাত দিতে, কেমন বাধা বাধা লাগে। প্রথমবার বাধাটা যেমন বেগে আসে, বাধা অগ্রাহ্য করে, কাজটা করে ফেল্লে, দ্বিতীয়বার আমরা বাধাটা তেমন অনুভব করিনে। ক্রমে এ ভাব চলে যায়।

লীলা। মা তাতে কি, ইচ্ছামত কাজতো করতে পারি। ঈশ্বর আমাদিগকে আটকিয়ে রাখতে পারেন না ত।

মা। আটকিয়ে রাখ্‌তে পারেন বই কি। কিন্তু তা তিনি রাখেন না। ঈশ্বর তোমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন। এ

স্বাধীনতার ভিতর দিয়েই তোমরা মানুষ হয়ে ওঠ এবং তাঁকে দেখ্‌তে পাও, তা তিনি চান। যদি প্রতি কাজ, তোমরা তাঁর সাধ্য হয়ে করে যাও, তোমাদের কোন স্বাধীনতা না থাকে, তবে শাসনের দরকার থাকে না, পাপ পুণ্যের প্রভেদ থাকে না। ঈশ্বরের বাণী, যারা অগ্রাহ্য করে যায়, তারা যে একেবারে অব্যাহতি পায়, মনে ক'র না। তার শাস্তি, তারা নিজেরা ভোগ করে। তোমরা কি জান না, লোক চক্ষের অগোচরে, অন্যায় গর্হিত কাজ করে, মানুষ অনুশোচনার আগুনে পুড়ে, খাক্ হয়ে যায়, এবং অনেক সময় প্রাণান্ত প্রায়শ্চিত্ত করেও শান্তি পায় না আইনের হাত হতে উদ্ধার পেয়েও, অনুশোচনায় বিদ্ধ ? হয়ে, কোন কোন সময়, লোক আত্মহত্যাও করে। সময়ে যদি সৎপরামর্শ না শোন, সোজা ভাবে, হাসি মুখে, সোজা পথে না চল, শেষে ইন্দ্রিয়-শক্তি যখন দুর্ব্বল হয়ে যাবে, আর সৎ কাজে আস্‌বে, অবাধ্য ছেলে যেমন বহু লাঞ্ছনা ভোগ করে বহু দুঃখ সয়ে, ঘুরে ফিরে শেষে বাড়ী আসে, তোমরাও শেষে কেঁদেকেটে, অনুশোচনার আগুনে জ্বলে ছাই হয়ে, মরণকালে ঈশ্বরেরদিকে ফিরবে, আর হায় হায় করবে। নরক ত এখানেই।

মানুষের অখণ্ড জীবন। মানুষ সকল সময়ে তার সর্ব্বোচ্চ অধিকার লাভ করতে চেষ্টা করে, এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠকে প্রকাশ করতে চায়, ইহাই তার প্রকৃতি। এবং তার সাফল্যই মানুষের তৃপ্তি। উৎসাহের সহিত যথাসাধ্য সৎ কাজ করে বাহবা নেওয়ার প্রবৃত্তির মধ্যে, এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশের

লোভ, আমরা ক্ষুদ্র আকারে, ছেলেদের মধ্যে দেখ্‌তে পাই। মানুষ যদি এ প্রকৃতিকে খাটো করে চলতে চায়, দশ জনের দেখাদেখি, যদি তুমি মানুষটাকে নেহাৎ ছোট মনে করে তার জন্য একটী ছোটখাট সংসার সৃষ্টি করে রাখ, সাংসারিক সুখ সুবিধার হিসাব করে, তাকে ছোট হয়ে থাক্‌তে শেখাও, তার পতন অনিবার্য্য। সে তার ক্ষুদ্র খণ্ড জীবন নিয়ে, প্রতি পদক্ষেপে, পড়ে যেতে চাবেই এবং খণ্ডজীবনের পরিতৃপ্তির জন্য কুকাজে, কুৎসিত কাজে হাত দিয়ে নিজের সর্ব্বনাশ কর্‌বেই। দীন দুঃখীর মুখের গ্রাস, সে কেড়ে নেবে, ঘুমন্ত মানুষের মাথায় লাঠি ঠুক্‌বে। পাপ বল, প্রায়শ্চিত্ত বল, সব এখানেই। মানুষের খণ্ড জীবনেই পাপের অধিকার। যে স্রোত প্রবল বেগে বিশাল সমুদ্রের দিকে ছুটে যায়, পঙ্কিলতা তাকে ধরে থাক্‌তে পারে না। কিন্তু যে স্রোত বাধা পেয়ে, লক্ষ্য ছেড়ে, ছোটখাটো হয়ে, গাতখাত কি খালে চড়ায় থেকে যায়, পঙ্কিলতা সেখানেই স্থান লাভ করে। উচ্চ উদ্দেশ্য যার, মহোচ্চ লক্ষ্য যার, সাংসারিক ক্ষুদ্রতায় কি স্বার্থপরতায় তার মন যাবে কেন, তাতে তার মনের তৃপ্তি হবে কেন?

লীলা। ধর্ম্মজীবন লাভের জন্য আর কি করতে হয়, মা?

মা। শুধু ঈশ্বর-বিশ্বাস কি ঈশ্বরের-বাণী শোনাতে ধর্ম্মজীবন হয় না। ঈশ্বর-বাণীর নির্দ্দেশানুযায়ী জীবন যাপন করতে হবে। ধর্ম্ম সাধনের জিনিষ। ইহা নিষ্ক্রিয় শক্তি

কি শুধু অনুভূতি নয়। হৃদয়েই ধর্ম্মের উৎপত্তি, এবং জীবনেই ইহার বিস্তৃতি। জীবনে ইহাকে ফলাতে হবে। জীবনকে পিছে রেখে, যে ধর্ম্ম চলে, তাহা জীবনের ধর্ম্ম নয়। তাহা পুঁথির ধর্ম্ম, অনুষ্ঠানের ধর্ম্ম।

সৎভাব সকলের মনে জাগে, কিন্তু সে ভাব জীবনে পোষন করে, সৎকাজ অতি কম লোক কর্‌তে পারে। ছেলেদের মনে সতত পরোপকার, পরার্থপরতার ভাব জাগ্রত করে দিও। নিঃস্বার্থ ভাবে পরের উপকার করে, পরের হিতার্থে আত্মসুখ বলি দিয়ে, যে সুখ, যে তৃপ্তি পাওয়া যায়, তার তুলনা কোথায়? পূণ্যের পুরস্কার তো আমরা এ সংসারে, হাতে হাতে পাই। মানুষ মানুষ থাকে ততক্ষণ যতক্ষণ সে শুধু, স্বার্থ নিয়ে, ভোগ বিলাসে ডুবে থাকে। যে মুহূর্ত্তে মানুষ স্বার্থ পায়ে ঠেলে, পরের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করে, পরম-পুরুষের সঙ্গ লাভের জন্য উধাও হয়ে যায়, মানুষ তখন দেবতা হয়। এবং তখন মানুষ, মানুষের পূজার অধিকারী হয়। স্বর্গ আর কোথায়? এ দেবত্বের নিকট মানবত্ব সচ্ছন্দে আত্মসমর্পণ করে। এবং দেবত্বের নিশান কাঁধে করে, মানুষ মানবত্বের স্বার্থকতা লাভ করে। এ রকম কাজ যে ঈশ্বরের প্রিয় কাজ, তিনি যে বাধা বিঘ্ন অগ্রাহ্য করে, আমাদের দিয়ে, এ সব কাজ করিয়ে নেন, সাধু জীবনের দৃষ্টান্তের দ্বারা, তাহা শেখাতে পার। এ ভাবে যদি ছেলেবেলা হতে সন্তানদিগের অন্তরে ঈশ্বর-বিশ্বাস সুদৃঢ় করে তুলতে

পার, তারা উর্দ্ধদিকে ঈশ্বরের পানে চেয়ে ঈশ্বরের বাণীর জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাক্‌বে এবং সেই বাণী শুনেই জীবনের সকল কর্ত্তব্য সম্পন্ন করবে। তাদের অন্তরে এই ভাব যদি জাগ্রত করে তুল্‌তে পার, তবে পুণ্যের পরিপূর্ণ প্রবাহে, তাদের হৃদয়, সরস ও উর্ব্বরা হয়ে উঠ্‌বে। ভগবানের অজস্র করুণার প্রভাবে, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার উৎস, স্বতঃই তাদের হৃদয়ে ছুটবে। তারা তখন ভগবানের উপাসনা, আরাধনা, পূজা অর্চ্চনায় দেহ মন সঁপে দেবে। তখন তোমরা প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পাবে যে, তোমাদের অফুরন্ত ভাবনা ও অক্লান্ত শ্রমের পুরস্কার, জীবনব্যাপী সাধনার সুফল, তোমাদের পুণ্যগৃহে, স্বয়ং ভগবান, তীর্থক্ষেত্রে যাত্রীদের মত, তোমাদের হাতে হাতে তুলে দিচ্ছেন। রূপেগুণে, শৌর্য্যেবীর্য্যে, ধনেমানে ও জ্ঞান গৌরবে বিভূষিত হয়ে, সন্তান যখন, সন্তানোচিত শ্রদ্ধা ভক্তিতে পরিপ্লুত হয়ে, স্মিতমুখে তোমার পাশে দাঁড়াবে, তোমার জীবনের অকৃত্রিম সুহৃদ হয়ে, বার্দ্ধক্যের নির্ভর হয়ে, তোমার পায়ের কাছে আসন পাত্‌বে, আনন্দের-গৌরবে তখন তোমার প্রাণ নেচে উঠ্‌বে, সুখের উচ্ছ্বাসে মুখ দীপ্ত হবে, শান্তির স্নিগ্ধ হাওয়ায় প্রাণ জুড়িয়ে যাবে। জীবন তোমার ধন্য হবে, সকল পরিশ্রম সার্থক হবে। এবং বঙ্গজননী ও অলক্ষিতে সন্তানের গৌরব-মণ্ডিত মাথায় দুহাত তুলে আশীর্ব্বাদ করে তখন বল্‌বেন

"কুলম্ পবিত্রম্, জননী কৃতার্থা।"

সরোজ। লীলা, মার কথাগুলো তোর কি কিছু মনে আছে?

লীলা। আছে বই কি! কেন দিদি মনে থাক্‌বে না?

সরোজ। প্রথম কোনদিকে দৃষ্টি রাখ্‌তে হয়, বল্ দেখি।

লীলা। স্বাস্থ্যের দিকে। তুমি যে পরীক্ষা আরম্ভ করলে।

সরোজ তার পর?

লীলা। নীতি-শিক্ষা।

সরোজ। তার পর?

লীলা। জ্ঞান-শিক্ষা।

সরোজ। তার পর?

লীলা। ধর্ম্ম-শিক্ষা।

সরোজ। কি! একটার পর একটা?

লীলা। না, দিদি, তা নয়, সবগুলোর প্রতি এক সঙ্গে দৃষ্টি রাখ্‌তে হবে। মা বলেছেন মনে নেই? যখন ছেলেরা একটু একটু করে বড় হতে থাকে, যখন ছেলেরা বুঝ্‌তে পারে, কোন্ কাজ করতে মা বলছেন, কোন্ কাজ করতে বারণ করছেন, তখন হ'তে তাদের শিক্ষা দিতে হবে। স্বাস্থ্যের দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখ্‌বে। গৃহ-শিক্ষার বিশেষত্ব কি তাও ত মা বলেছেন, মনে নাই কি?

সরোজ। কি, বল্‌ত শুনি।

লীলা। গৃহ-শিক্ষা উপদেশের শিক্ষা নয়। নিজে করে সন্তানের দ্বারা করিয়ে, গৃহে ছেলেকে শিখিয়ে নিতে হবে।

সরোজ। বটে! একি শুধু মার কাজ?

লীলা। শুধু মার কাজ হবে কেন? বাড়ীর সকলের সহযোগিতার বিশেষ দরকার। মা ছেলেকে এক পথে চালাবেন, বাড়ীর অন্য লোকেরা অন্য পথ দেখাবে, ছেলে মানুষ যাবে কোন পথে? ছেলে তৈরী কর্‌তে হলে, সকলের সমবেত চেষ্টার দরকার।

সরোজ। মানুষের কোন গুণটা সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর?

লীলা। ধর্ম্মপরায়ণতা।

সরোজ। বেশ, সংসারে উন্নতির পক্ষে, ছেলেদের কোন গুণটা সব চাইতে বেশী দরকার?

লীলা। আত্মনির্ভরতা।

সরোজ। ছেলে মানুষ কর্‌তে হলে, শিক্ষকের কোন গুণটা থাকা একান্ত প্রয়োজন?

লীলা। চিত্তের প্রফুল্লতা ও ধৈর্য্য।

সরোজ। তুই মার কথাগুলো বেশত মনে রেখেছিস্ লীলা।

লীলা। পরীক্ষায় পাশ হয়েছি তো, দিদি?

সরোজ। হাঁ, পাশ করেছিস বটে। কিন্তু এ পাশ ত বাস্তব পাশ নয়। যদি ছেলেকে কার্য্যত মানুষ করে তুল্‌তে পারিস, তবে বুঝ্‌লুম যথার্থ পাশ হয়েছিস্।

লীলা। তাও কর্‌তে পার্‌বো, দিদি। অসাধ্য অসম্ভব তো কিছুই নয়। তবে একটু খাটতে হবে। তাও যদি না পারি, তবে আর মানুষ হয়ে জন্মালুম কেন?

সমাপ্ত